শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

কাশীপুরের উদ্যান-বাটি।

(স্বামী সারদানন্দ)

কলিকাতার উত্তরাংশে যে প্রশস্ত রাস্তাটি প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত বরাহনগরকে বাগবাজার পল্লীর সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে তাহার উপরেই কাশীপুরের উদ্যান-বাটি বিদ্যমান।

বাগবাজার পোলের উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত উদ্যানের কিছুদূর দক্ষিণে অবস্থিত কাশীপুরের চৌরাস্তা পর্য্যন্ত ঐ রাস্তার প্রায় উভয় পার্শ্বেই দরিদ্র মুটেমজুর-শ্রেণীর লোকসমূহের থাকিবার কুটীর এবং তাহাদিগেরই দৈনন্দিন জীবননির্ব্বাহের উপযোগী দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপণিসকল দেখিতে পাওয়া যায়; উহার মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকখানি ইষ্টকালয়—যথা, কয়েকটি পাটের গাঁট বাঁধিবার কুঠি, দাস কোম্পানির লৌহের কারখানা, রেলির কুঠি, দুই একখানি উদ্যান বা বাসভবন ও কাশীপুরের চৌরাস্তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত পুলিসের ও অগ্নিভয়নিবারক ইঞ্জিনাদি রক্ষার কুঠি এবং উহারই পশ্চিমে অনতিদূরে ৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর সুপ্রসিদ্ধ মন্দির—যেন মানবদিগের মধ্যে বিষম অবস্থা-ভেদের সাক্ষ্যপ্রদান করিবার জন্যই দণ্ডায়মান। শিয়ালদহ রেলওয়ের উন্নতি ও বিস্তৃতি হওয়ায় অধুনা আবার, উক্ত রাস্তার ধারে অনেক-গুলি টিনের ছাদসংযুক্ত গুদাম ইত্যাদি নির্ম্মিত হইয়া কয়েক

বৎসর পূর্ব্বে উহার যাহা কিছু সৌন্দর্য্য ছিল তাহারও অধিকাংশের বিলোপ সাধন করিয়াছে। ঐরূপে ঐ প্রাচীন রাস্তাটি নয়ন-প্রীতিকর না হইলেও ঐতিহাসিকের চক্ষে উহার কিছু মূল্য আছে। কারণ, শুনা যায়, এই পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াই নবাব সিরাজ গোবিন্দপুরের বৃটিশ দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন এবং বাগবাজার হইতে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ মাইল উত্তরে উহারই একাংশে মসীমুখ নবাব মীর্জাফরের এক প্রাসাদ এককালে অবস্থিত ছিল। ঐরূপে বাগবাজার হইতে কাশীপুরের চৌমাথা পর্য্যন্ত পথটি মনোজ্ঞ-দর্শন না হইলেও উহার পর হইতে বরাহনগরের বাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত উহার অংশটি দেখিতে মন্দ ছিল না। উক্ত চৌমাথা হইতে উত্তরে স্বল্পদূর অগ্রসর হইলেই মতিঝিলের দক্ষিণাংশ এবং উহার বিপরীতে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে আমাদিগের পরিচিত ৺মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তীর সুন্দর বাসভবন তৎকালে দেখা যাইত। রেল কোম্পানী অধুনা উক্ত বাটির চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্যানের অধিকাংশ ক্রয় করিয়া উহার ভিতর দিয়া রেলের এক শাখা গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া উহাকে এককালে শ্রীহীন করিয়াছে। ঐস্থান হইতে আরও কিছু দূর উত্তরে অগ্রসর হইলে বামে মতিঝিলের উত্তরাংশ এবং তদ্বিপরীতে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে কাশীপুর উদ্যানের উচ্চ প্রাচীর ও লৌহময় ফটক নয়নগোচর হয়। মতিঝিলের পশ্চিমাংশের পশ্চিমে অবস্থিত রাস্তার ধারে কয়েকখানি সুন্দর উদ্যান-বাটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, তন্মধ্যে ৺মতিলাল শীলের উদ্যানই—যাহা এখন কলিকাতার ইলেকট্রিক্ কোম্পানীর হস্তগত হইয়া ইতিপূর্ব্বের বিরাম ও সৌন্দর্য্যের ভাব হারাইয়া কর্ম্ম ও ব্যবসায়ের ব্যস্ততা ও উচ্চ ধ্বনিতে সর্ব্বদা মুখরিত রহিয়াছে—প্রশস্ত ও বিশেষ মনোজ্ঞ ছিল। মতিশীলের উদ্যানের উত্তরে তখন বসাকদিগের একখানি ভগ্ন বাসভবন গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। রাস্তা হইতে উক্ত জীর্ণ ভবনে যাইবার যে পথ ছিল তাহার উভয় পার্শ্বে বৃহৎ ঝাউগাছের শ্রেণী বিদ্যমান থাকায় তখন এক অপূর্ব্ব শোভা ও দিব্যধ্বনি সর্ব্বদা নয়ন ও শ্রবণের সুখ সম্পাদন করিত।

কাশীপুরের উদ্যান-বাটিতে ঠাকুরের নিকটে থাকিবার কালে আমরা উক্ত শীলমহাশয়দিগের উদ্যানে অনেক সময়ে গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিতাম এবং ঠাকুর ভালবাসিতেন বলিয়া ঘাটের ধারে অবস্থিত বৃহৎ গুলচি পুষ্পের গাছ হইতে কুসুম চয়ন করিয়া আনিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিতাম। অনেক সময়ে আবার অপূর্ব্ব ঝাউবৃক্ষ-রাজিশোভিত পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া বসাকদিগের জনমানবশূন্য উদ্যানভবনে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া থাকিতাম। ঐ উদ্যানের কিঞ্চিৎ উত্তরে ৺প্রাণনাথ চৌধুরীর প্রশস্ত স্নানের ঘাট এবং তদুত্তরে সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর পত্নী রাণী কাত্যায়নীর বিচিত্র গোপাল-মন্দির। ঐ স্থানেও আমরা কখন কখন স্নান এবং ৺গোপালজীর দর্শন জন্য গমন করিতাম। রাণী কাত্যায়নীর জামাতা ৺গোপালচন্দ্র ঘোষ কাশীপুর উদ্যান-বাটির সত্বাধিকারী ছিলেন। ভক্তগণ তাঁহারই নিকট হইতে উহা ঠাকুরের বাসের জন্য মাসিক ৮০৲ টাকা হার নিরূপণ করিয়া প্রথমে ছয় মাসের এবং পরে আরও তিন মাসের অঙ্গীকার পত্র প্রদানে ভাড়া লইয়াছিল। ঠাকুরের পরম ভক্ত শিমলাপল্লী-নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ মিত্রই উক্ত অঙ্গীকার পত্রে সহি করিয়া ঐ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃহৎ না হইলেও কাশীপুরের উদ্যান-বাটিটি বেশ রমণীয়। পরিমাণে উহা চৌদ্দ বিঘা আন্দাজ হইবে। উত্তর-দক্ষিণে অপেক্ষা ঐ চতুষ্কোণ ভূমির প্রসার পূর্ব্ব পশ্চিমে কিছু অধিক ছিল এবং উহার চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। উদ্যানের উত্তর সীমার প্রায় মধ্যভাগে প্রাচীরসংলগ্ন পাশাপাশি তিন চারিখানি ছোট ছোট কুটারি রন্ধন ও ভাঁড়ারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ ঘরগুলির সম্মুখে উদ্যানপথের অপর পার্শ্বে একখানি দ্বিতল বাসবাটি; উহার নীচে চারিখানি এবং উপরে দুইখানি ঘর ছিল। নিম্নের ঘরগুলির ভিতর মধ্যভাগের ঘরখানিই প্রশস্ত হলের ন্যায় ছিল। উহার উত্তরে পাশাপাশি দুইখানি ছোট ঘর, তন্মধ্যে পশ্চিমের ঘরখানি হইতে কাষ্ঠনির্ম্মিত সোপানপরম্পরায় দ্বিতলে উঠা যাইত এবং পূর্ব্বের

ঘরখানি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পূর্ব্বোক্ত প্রশস্ত হলঘর ও তাহার দক্ষিণের ঘরখানি—যাহার পূর্ব্বদিকে একটি ক্ষুদ্র বারাণ্ডা ছিল—সেবক ও ভক্তগণের শয়ন-উপবেশনাদির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। নিম্নের হলঘরখানির উপরে দ্বিতলে সমপরিসর একখানি ঘর, উহাতেই ঠাকুর থাকিতেন। উহার দক্ষিণে, প্রাচীরবেষ্টিত স্বল্পপরিসর ছাদ, উহাতে ঠাকুর কখন কখন পাদচারণ ও উপবেশন করিতেন এবং উত্তরে সিঁড়ির ঘরের উপরের ছাদ এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ঘরখানির উপরে অবস্থিত সমপরিসর একখানি ক্ষুদ্র ঘর, উহা ঠাকুরের স্নানাদির এবং দুই একজন সেবকের রাত্রিবাসের জন্য ব্যবহৃত হইত।

বসতবাটির পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কয়েকটি সোপান বাহিয়া নিম্নের হলঘরে প্রবেশ করা যাইত এবং উহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত সুন্দর উদ্যানপথ প্রায় গোলাকারে প্রসারিত ছিল। উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উহার পশ্চিম দিকের প্রাচীর সংলগ্ন দ্বারবানের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র ঘর এবং তদুত্তরে লৌহময় ফটক। ঐ ফটক হইতে আরম্ভ হইয়া গাড়ি যাইবার প্রশস্ত উদ্যানপথ পূর্ব্বোত্তরে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অগ্রসর হইয়া বসতবাটির চতুর্দ্দিকের গোলাকার পথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। বসতবাটির পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র ডোবা ছিল। হলঘরে প্রবেশ করিবার পশ্চিমের সোপানশ্রেণীর বিপরীতে উদ্যানপথের অপর পারে উক্ত-ডোবাতে নামিবার সোপানাবলী বিদ্যমান ছিল। উদ্যানের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে উক্ত ডোবা অপেক্ষা একটি চারি পাঁচগুণ বড় ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও তাহার উত্তর-পশ্চিম কোণে দুই তিনখানি একতলা ঘর ছিল। তদ্ভিন্ন উদ্যানের উত্তর-পশ্চিম কোণে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র ডোবার পশ্চিমে আস্তাবল ঘর এবং উদ্যানের দক্ষিণ সীমার প্রাচীরের মধ্যভাগের সম্মুখেই মালীদিগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট দুইখানি পাশাপাশি অবস্থিত জীর্ণ ইষ্টকনির্ম্মিত ঘর ছিল। উদ্যানের অন্য সর্ব্বত্র আম্র, পনস, লীচু প্রভৃতি ফলবৃক্ষসমূহ ও উদ্যানপথসকলের উভয় পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ-

রাজীতে শোভিত ছিল এবং ডোবা ও পুষ্করিণীর পার্শ্বের ভূমির অনেক স্থল নিত্য আবশ্যকীয় শাকসবজী উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। আবার, বৃহৎ বৃক্ষসকলের অন্তরালে মধ্যে মধ্যে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড বিদ্যমান থাকিয়া উদ্যানের রমণীয়ত্ব অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

এই উদ্যানেই ঠাকুর অগ্রহায়ণের শেষে আগমনপূর্ব্বক সন ১২৯১ সালের শীত ও বসন্তকাল এবং সন ১২৯২ সালের গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঐ আট মাস কাল ব্যাধি যেমন প্রতিনিয়ত প্রবৃদ্ধ হইয়া তাঁহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরকে জীর্ণ ভগ্ন করিয়া শুষ্ক কঙ্কালে পরিণত করিয়াছিল, তাঁহার সংযমসিদ্ধ মনও তেমনি উহার প্রকোপ ও যন্ত্রণা এককালে অগ্রাহ্য করিয়া, তিনি ব্যক্তিগত এবং মণ্ডলীগতভাবে ভক্তসংঘের মধ্যে যে কার্য্য ইতিপূর্ব্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিসমাপ্তির জন্য নিরন্তর নিযুক্ত থাকিয়া প্রয়োজনমত তাহাদিগকে শিক্ষাদীক্ষাদি প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে নিজ সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যৎ কথা ভক্তগণকে অনেক সময়ে বলিয়াছিলেন, যথা—"যাইবার (সংসার পরিত্যাগ করিবার) আগে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিব (অর্থাৎ নিজ দেব-মানবত্ব সকলের সমক্ষে প্রকাশিত করিব)" ; "যখন অধিক লোকে (তাঁহার দিব্য মহিমার বিষয়) জানিতে পারিবে, কাণাকাণি করিবে তখন (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটা আর থাকিবে না, মা'র (জগন্মাতার) ইচ্ছায় ভাঙ্গিয়া যাইবে" ; "(ভক্তগণের মধ্যে) কাহারা অন্তরঙ্গ ও কাহারা বহিরঙ্গ তাহা এই সময়ে (তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার সময়ে) নিরূপিত হইবে" ইত্যাদি—সেই সকল কথার সাফল্য আমরা এখানে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তগণ-সম্বন্ধী তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সকলের সফলতাও আমরা এই স্থানেই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যথা—"মা তোকে (নরেন্দ্রকে) তাঁর কাজ করিবার জন্য সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন"—"আমার পশ্চাতে

তোকে ফিরিতেই হইবে, তুই যাইবি কোথায়"—"এরা সব (বালক ভক্তগণ) যেন হোমা পাখির শাবকের ন্যায় ; হোমা পাখি আকাশে বহু উচ্চে উঠিয়া অণ্ড প্রসব করে,সুতরাং প্রসবের পরে উহার অণ্ড সকল প্রবলবেগে পৃথিবীর দিকে নামিতে থাকে—ভয় হয় মাটিতে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে ; কিন্তু তাহা হয় না. ভূমি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই অণ্ড বিদীর্ণ করিয়া শাবক নির্গত হয় এবং পক্ষ প্রসারিত করিয়া পুনরায় ঊর্দ্ধে আকাশে উড়িয়া যায় ; ইহারাও সেইরূপ সংসারে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবে।" তদ্ভিন্ন, নরেন্দ্র-নাথের জীবনগঠনপূর্ব্বক তাহার উপরে নিজ ভক্তমণ্ডলীর, বিশেষতঃ বালক ভক্তসকলের, ভারার্পণ করা ও তাহাদিগকে কিরূপে পরিচালনা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ঠাকুর এই স্থানেই করিয়াছিলেন। সুতরাং কাশীপুরের উদ্যানে সংসাধিত ঠাকুরের কার্য্য-সকলের যে বিশেষ গুরুত্ব ছিল তাহা বলিতে হইবে না।

ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল গুরু গম্ভীর কার্য্য যেখানে সংসাধিত হইয়াছিল, সেই স্থানটি যাহাতে তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি বক্ষে ধারণ-পূর্ব্বক চিরকাল মানবকে ঐ সকল কথা স্মরণ করাইয়া বিমল আনন্দের অধিকারী করে তদ্বিষয়ে সকলের মনেই প্রবল ইচ্ছা স্বতঃ জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু হায় ঐ বিষয়ে বিশেষ বিঘ্ন অধুনা উদিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, উক্ত উদ্যান-বাটি রেল কোম্পানী হস্তগত করিতে অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব লীলাস্থল যে শীঘ্রই রূপান্তরিত হইয়া পাটের গুদাম বা অন্য কোনরূপ শ্রীহীন পদার্থে পরিণত হইবে তাহা বলিতে হইবে না। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা যদি ঐরূপ হয় তাহা হইলে দুর্ব্বল মানব আমরা আর কি করিতে পারি ? অতএব "যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্" বলিয়া ঐ কথার এখানে উপসংহার করি।

জাতীয় জীবনে প্রকৃতিপূজার স্থান।

(শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার)

প্রকৃতির সহিত ঘাত প্রতিঘাতে জীবনের অভিব্যক্তি। প্রাথমিক জীবনে প্রকৃতির শাসন অপ্রতিহত। প্রকৃতির অন্ধ অনুসরণই প্রাথমিক জীবনের একমাত্র গতি অভিব্যক্তির পথে জীবন যতই অগ্রসর হয়, প্রকৃতির শাসন ততই কমিতে থাকে। মানব-শিশু প্রকৃতির অন্ধ উপাসক। কর্ম্মী মানব প্রকৃতির নিয়মনে ব্যস্ত। বৈজ্ঞানিক তাহার তত্ত্ব-বিশেষণে বদ্ধপরিকর, কবি তাহার সৌন্দর্য্য-ধ্যানে মগ্ন। পূর্ণ অভিব্যক্ত জীবন প্রকৃতির অনুশাসনের বহির্ভূত—স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। প্রকৃতি-বিযুক্ত আত্মার স্বরূপ ধ্যানে তাঁহার তৃপ্তি। প্রকৃতি সেই স্বেচ্ছাবিলাস পুরুষের পরিচারিকা। অভিব্যক্তির ক্রমানুসারে জীবন কখনও প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, কখনও বা প্রকৃতির অতীত আত্মার দিকে প্রধাবিত হইতেছে। প্রথম অবস্থায় প্রাকৃত-জ্ঞানের উন্নতি—শিল্প ও জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কার। দ্বিতীয় অবস্থায় অপ্রাকৃত বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশ—দর্শন ও অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের প্রচার। একপ্রান্তে অপরাবিদ্যা বা প্রকৃতিপূজা, অপরপ্রান্তে পরাবিদ্যা বা আত্মপূজা। জীবনের অভিব্যক্তি এই দুই প্রান্তের মধ্যে আন্দোলিত হইতেছে। ভারতের জাতীয় জীবনে এই আন্দোলন কিরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছে এবং যুগে যুগে প্রকৃতি-পূজার দিক্ কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

মানুষ যে দিন তাহার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, সুদূর অতীতের সেই দিনকার ইতিহাস এখন আমাদের জানিবার কোনও উপায় নাই। সাহিত্যের ক্ষীণরশ্মি

সেই দূরতম অতীতকে আমাদের মানস-দৃষ্টির সম্মুখীন করিতে সম্পূর্ণরূপেই অসমর্থ। কিন্তু সভ্যতার প্রথম যুগে প্রকৃতিদর্শনে মানবমনে যে ভাবের স্ফুরণ হইয়াছিল, বৈদিক সাহিত্যে তাহার স্মৃতির ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের আর্য্যজাতির নিকট অনন্তবৈচিত্র্যময় প্রকৃতি গতিময়, প্রাণময় ও চৈতন্যময়রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। মহাশূন্যে অবস্থিত জ্যোতিষ্কগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বিশ্বে এক অতীন্দ্রিয় দৈবীশক্তির লীলা চলিতেছে। বিস্ময় ও ভক্তিতে নম্র হইয়া আর্য্যগণ প্রকৃতিপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্রমাগত দর্শন, মনন ও অনুভূতির ফলে তাঁহারা বিবিধ জড়-বিজ্ঞান ও শিল্পের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সাধনলব্ধ প্রাকৃতজ্ঞান লইয়া তাঁহারা ভারতে সমাজস্থাপনপূর্ব্বক এক অপূর্ব্ব সভ্যতার প্রচার করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানে ও ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীর জাতি সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বৈদিক ভারত প্রকৃতির প্রিয় শিষ্য—প্রতিপদক্ষেপে বিস্মিত ও নিত্য নূতন আবিষ্কারে আনন্দিত। প্রকৃতির সঙ্গে তখন জীবনের সম্বন্ধ জীবন্ত। প্রকৃতির নবীনত্ব তখন চিত্তাকর্ষক, নব নব জ্ঞানের প্রেরক।

অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ আর্য্যগণ শুধু ব্যবহারিক জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। প্রকৃতির রহস্য-লোকে প্রবেশ লাভ করিয়া তাঁহারা প্রকৃতির জ্ঞানভাণ্ডার যথাশক্তি লুণ্ঠন করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্তর্জীবনের শূন্যভাণ্ডার এইরূপে প্রাকৃতজ্ঞানে পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু প্রাকৃতজ্ঞান লাভ করিয়াই আর্য্যজীবনের জ্ঞানতৃষ্ণা নিঃশেষিত হয় নাই। কালক্রমে তাঁহারা ক্রমশঃ একটী বিশ্বাতীত সত্তার সাক্ষাৎলাভ করিলেন, একমাত্র যাঁহাকে জানিলে সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান লাভ হয়। এই পরাৎপর সত্তার এক প্রান্তে জীবাত্মা অপর প্রান্তে পরমাত্মা,—আদ্যন্তহীন, সনাতন। আত্মা ও পরমাত্মার, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-

যোগ দর্শন করিয়া আর্য্যগণ সিদ্ধকাম হইলেন এবং তাঁহাদের এই শ্রেষ্ঠ সাধনাকে কর্ম্মজগতে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিবার মানসে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের সমন্বয় সাধনপূর্ব্বক ভারতবর্ষে দেব-আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রকৃতি এই দেব-জীবনের সাহায্যকারিণী সঙ্গিনী। প্রকৃতির সঙ্গে তখন জীবনের নির্ব্বৈর জ্ঞানযোগের সম্বন্ধ।

প্রাথমিক যুগে আর্য্যহৃদয়ে যে জ্ঞানতৃষ্ণার উন্মেষ হইয়াছিল, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে তাহা তৃপ্ত হইল। জ্ঞানের গতি শেষ হওয়ায় প্রকৃতির জ্ঞেয়ত্বও শেষ হইল। ব্রহ্মজ্ঞানের নূতন দৃষ্টি লইয়া যখন আর্য্যগণ প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার তখন শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শোভা ও সৌন্দর্য্য, চিরনবীনত্ব ও আকর্ষণীশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার সকল রহস্যদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। জ্ঞানকে উদ্বোধিত করিতে, জীবনে বিস্ময় আনয়ন করিতে নূতন কোনও রহস্য নাই। প্রকৃতি তখন হৃতসর্ব্বস্ব পথিকের ন্যায় রিক্ত ও পরিত্যক্ত, কেবল দুঃখ ও দৈন্যের আধার। প্রকৃতির রাজ্য নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য ও অধ্রুব—অজ্ঞানের জন্মভূমি, দুঃখ শোক জরা মরণের চিরাধিকৃত লীলাক্ষেত্র। পক্ষান্তরে, আত্মা ও পরমাত্মার ধ্রুব আলোকে উদ্ভাসিত জ্ঞান এমন এক রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছে, যেখানে জরামরণাদি পরিবর্ত্তন-প্রবাহ চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। সেখানে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার অভেদ-যোগ, আত্মার সঙ্গে আত্মার দৈবসম্বন্ধ—জীবন-তৃষ্ণার পরমা তৃপ্তি। এই উন্নত দৃষ্টিলাভ করিয়া অধ্যাত্মজ্ঞান প্রকৃতিকে গ্রহণ করিল না। আত্মার প্রখরালোকে প্রবুদ্ধ হইয়া দর্শন-গুরু মহর্ষি কপিল দেখিলেন, প্রকৃতি-বিমুক্ত আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মানবের পরমপুরুষার্থ। তখন হইতে জ্ঞানের রাজ্যে প্রকৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। প্রকৃতি-পূজার মন্দির-দ্বারও রুদ্ধ হইল। জীবনের দৃষ্টি পড়িল তখন প্রকৃতিকে ছাড়িয়া পুরুষের উপর—জ্ঞানজগতের অধিপতি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত আত্মার

উপর। জীবন তাহার স্বরূপধ্যানে নূতন আনন্দের অনুভূতি পাইল। লক্ষ্য হইল তখন আত্মার আত্মত্ব, মুক্তত্ব ও কেবলত্ব। ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষের সমন্বয় স্থির রহিল না। একমাত্র মোক্ষই জ্ঞানের লক্ষ্য হইয়া পড়িল এবং তাহারই অনুশীলনে জ্ঞান ব্যস্ত রহিল। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে প্রকৃতিপূজায় যে দেব-আদর্শের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে জ্ঞান-যোগে যে আদর্শ কালক্রমে পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছিল, মহাভারতের যুগে সেই দেব-আদর্শ প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলে ভারতসাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। বিশাল ভারত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পরস্পর সম্বন্ধশূন্য, স্বাধীন ও স্ব স্ব প্রধান হইয়া পড়ে। রাজশক্তির অভাবে ব্রাহ্মণ্যশক্তিও অন্তর্ধান করে। শিক্ষাকেন্দ্র সকলের কোনও প্রভাব থাকে না। জ্ঞান ও কর্ম্ম কেন্দ্রচ্যুত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। একটা প্রকাণ্ড সৌধ যেন প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে নিষ্পেষিত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। ভারত ইতিহাসের এই অন্ধকার-যুগের আধ্যাত্মিক জগৎও একবারেই দীপ্তিহীন। কতকাল এইরূপে চলিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে সমাজে একটা গতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাসিগণ ভ্রমণ করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, শিষ্য করিতেছেন। আত্মা, পরমাত্মা ও পরলোক সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে বিচার বিতর্ক চলিতেছে। বৈদিক শিক্ষাদীক্ষা বিজ্ঞানবিরহিত হইয়া কেবল ক্রিয়া-কাণ্ড লইয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছে। আচার্য্যগণের মধ্যে কঠোর সংযম ও তপস্যার আভাস পাওয়া যায়। পূর্ব্বযুগের জ্ঞানের প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায়, অতীতের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কারের সঙ্গে বর্ত্তমানের সমন্বয় হইতেছে না। পূর্ব্ব সংস্কার ও স্বাধীন চিন্তা পাশাপাশি চলিয়াছে। আত্মা ও পরমাত্মার উন্নত আলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে। স্বাধীন চিন্তা অসীমের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া নিজকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সর্ব্বত্রই সন্দেহ, অবিশ্বাস।

সকলই যেন অবোধ্য ও অনিশ্চিত। গভীর অন্ধকার যেন চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে।

ভারতের জ্ঞান যখন এইরূপ অতৃপ্তির হাহাকার লইয়া তীব্র বেদনায় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেছিল, তখন ভগবান্ তথাগত বুদ্ধের জন্ম হয়। সহসা যেন অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া এক প্রচণ্ড সূর্য্যের উদয় হইল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার জ্যোতিঃরাশি পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল। ঐতিহাসিক ভারতের জন্ম হইল। গৌতম বুদ্ধ তাঁহার অর্থপূর্ণ-নীরবতা দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধীয় সহস্র বিতর্কের পরিসমাপ্তি আনিয়া দিলেন। জ্ঞান ও প্রেম নীতি ও কর্ম্মে স্থির হইয়া রহিল। বুদ্ধি নির্ব্বাণের আঘাতে ফিরিয়া আসিয়া কর্ম্ম গ্রহণ করিল। বুদ্ধদেব যে জীবন্ত বিশ্বপ্রেম ও নীতির তরঙ্গ আনিয়া জাতীয় জীবনে গতিশক্তি সঞ্চার করিলেন, পৃথিবীর প্রতি কোণে সে শক্তির আঘাত লাগিল। সার্থক হইল তাহা ভারতের রাষ্ট্রজীবনে—সম্রাট্ অশোকের রাজত্বে। শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও নীতির দ্রুতপ্রবাহে ভারতবর্ষ পুনরায় তাহার চিরগৌরবের স্থান অধিকার করিল। প্রকৃতির সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপিত হইল। প্রেম ও নীতি প্রকৃতিকে নূতন কর্ম্মে আহ্বান করিয়াছে।

সম্রাট্ অশোকের পরেই ভারতের গৌরবরবি পুনরায় অস্তমিত হইল। পরমাত্মার প্রতি বুদ্ধদেবের নির্ব্বাক্ ঔদাসীন্যে সমাজ-মন বেশী দিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। ভগবান্ বুদ্ধের লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের এবং আদর্শ মানবত্বের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ভারতের জাগ্রত চৈতন্য কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বপ্রেম ও নীতির উজ্জ্বল আদর্শ কিছুদিনের জন্য পরমাত্মার চিন্তাকে সমাজ-মন হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। বুদ্ধির দৃষ্টিপথ হইতে যখন তাহা অন্তর্হিত হইল, বৌদ্ধ আদর্শের অসম্পূর্ণতা তখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের অন্তরাত্মা প্রেম ও কর্ম্মে স্থির থাকিতে পারে না—চির উপাস্য পরমাত্মার জন্য ব্যাকুল

হইয়া উঠিয়াছে। অপর দিকে নির্ব্বাণতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বৌদ্ধগণ বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণিকবাদ, অস্তিনাস্তিবাদ প্রভৃতি অসংখ্য দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। দার্শনিক মহা কোলাহলে ভারত যেমন মুখরিত হইয়া উঠিল, প্রকৃতিদেবীও তেমনই সুযোগ বুঝিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

বৌদ্ধযুগের শেষভাগে ভারতীয় জীবনের সনাতন আদর্শ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মানবত্বের আদর্শের সহিত বৈদিক ভাবের সমন্বয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ-দর্শনের কূটতর্ক ভেদ করিয়া তখনও তাহা সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সময় ভগবান্ শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। আচার্য্যদেব তাৎকালিক বৌদ্ধদর্শনের কূটতর্কের দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া বৈদিকজ্ঞানের বিজয়স্তম্ভ পুনঃস্থাপিত করেন। আত্মা ও পরমাত্মার সনাতন ভিত্তিভূমি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত আত্মা পুনরায় ফিরিয়া আসিল। পরমাত্মার সঙ্গে তাহার নিত্যযোগ পুনরায় বিঘোষিত হইল। জ্ঞানের উচ্চাধিকার স্বীকৃত হইল। বেদের আত্মা, পরমাত্মা, জ্ঞান সকলেই পুনর্জীবন লাভ করিল। সমাজ তখনও দর্শনের কূটতর্কে নিমগ্ন। বেদের প্রকৃতিপূজা ফিরিতে পারিল না। ভারতীয় সাধনার আর একটী অঙ্গ অপূর্ণ থাকিয়া গেল।

আত্মা ও পরমাত্মার নিত্যযোগ স্থাপনের পর দার্শনিক চিন্তার আর বেশী অবসর রহিল না। দার্শনিক কোলাহল কালক্রমে থামিয়া গেল। ভারাক্রান্ত সমাজ-মনও বিচার বিতর্কের লীলা শেষ করিয়া পরমাত্মার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শান্তিলাভ করিল। মানব ও ঈশ্বরের সেই জীবন্ত যোগ ভারতীয় হৃদয়ের চিরসঞ্চিত প্রেমরাশি আকর্ষণ করিয়া রস ও মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিল। বুদ্ধদেবের বিশ্বপ্রেম চৈতন্যদেবের জীবে দয়া ও ঈশ্বরপ্রেমে পরিণত হইল। এই ভাববন্ধনে যে ভক্তি ও মাধুর্য্যের উৎপত্তি হইল, তাহাতে ভারতীয় জীবনের এক অব্যক্ত-ধারা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। এদেশ জ্ঞানভক্তির ভিখারী। এদেশের

কাজকর্ম্ম আত্মার সঙ্গে আত্মার দৈবসম্বন্ধ লইয়া, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার নিত্য জীবনযোগ লইয়া। জ্ঞান তাহার দূরস্থ দর্শক ও সাক্ষীমাত্র। অন্তর্জগৎ এখানে আত্মতৃপ্ত, পূর্ণতালাভে বিরামপ্রাপ্ত। প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া যে জ্ঞানগতির আরম্ভ হইয়াছিল এইখানে তাহার পরিণতি, পরিসমাপ্তি ও স্থিতি। এই পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিরও বন্ধন মুক্ত হইয়াছে। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ হইয়াছে। প্রকৃতি এখন জীবনের লীলাসহচরী। আত্মার লীলা প্রকটিত করিবার জন্য—রসসৃষ্টি করিবার জন্য প্রকৃতির আবশ্যক। তাহার সঙ্গে দ্বন্দ্ব নাই—আছে সখ্য।

এই সময়ে বাহির হইতে এক প্রচণ্ডশক্তি আসিয়া ভারতীয় জীবনে আঘাত করিয়াছিল। সে আঘাত শক্তির আঘাত, জ্ঞানের আঘাত নয়। বাহ্যাবরণ ভেদ করিয়া তাহা সমাজের জ্ঞানজীবন স্পর্শ করিতে পারে নাই এবং তাহার বিকাশের গতিও রোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। মুসলমান আক্রমণ ও অধিকারজনিত পরিবর্ত্তন-প্রবাহ ভারতের জ্ঞানজীবনে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। জ্ঞানের স্বারাজ্যে প্রকৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল এবং প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়াই তাহা পূর্ণতার দিকে ধাবিত হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণ বা শক্তির কোলাহল তাহাকে পথভ্রষ্ট বা লক্ষ্যভ্রষ্ট করে নাই। মুসলমান রাজত্বে আমরা প্রকৃতিকে গ্রহণ করি নাই।

পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে জগৎসৃষ্টি। আমাদের জগতে প্রকৃতির যোগ ছিল না এমন কথা নয়। যোগ না থাকিলে আমরাও থাকিতাম না, আর আমাদের এই বিরাট বিচিত্র বিশিষ্ট জগৎও থাকিত না। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ অবশ্যই ছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর সে সংযোগ হইয়াছিল বিয়োগাত্মক—সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের ন্যায় সততই সমদূরবিশিষ্ট। পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগের উপকরণ। আমরা প্রকৃতিকে ভোগ করি নাই। আমাদের ভোগবাসনা বৈরাগ্যের জ্বলন্ত শিখায় পতিত হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞানের কষ্টিপাথরে তাহার কলঙ্কদাগ চিরতরে লাগিয়া রহিয়াছে।

যাহা জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তির বিরোধী, আমাদের তপস্যালব্ধ জ্ঞানজীবনে তাহার প্রবেশলাভ সম্ভব হয় নাই। প্রকৃতিদেবী আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়াছিলেন ভোগের বেশে, 'রঙ্গদর্শয়িত্রী নটীর' ন্যায় আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে, ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে, আমাদের আত্মার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য হরণ করিতে, আমাদের জ্ঞানযোগ ভঙ্গ করিয়া আমাদের মোক্ষ, নির্ব্বাণ ও মুক্তি কাড়িয়া লইতে। মহাদেবের ধ্যান ত ভোগের আকর্ষণে ভঙ্গ হইবার নয়। কামদেবের সন্ধান সেখানে ব্যর্থ হইবারই কথা। শক্রবেশিনী প্রকৃতিকে আমরা গ্রহণ করি নাই, দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। আমাদের গ্রহণযোগ্য হইতে হইলে প্রকৃতিকে সাধনাময় জীবনগঠন করিতে হইবে, ভোগের বেশ ছাড়িয়া জ্ঞানের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে, এবং আমাদের দেব-আদর্শের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে।

বৈদিক যুগের পর আমরা যে কোনও প্রাকৃতজ্ঞানলাভ করি নাই, জড়বিজ্ঞানের কোনও উন্নতিসাধন করি নাই, এমন কথা নয়। বৌদ্ধযুগে কর্ম্ম ও নীতির আহ্বানে প্রকৃতিদেবী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পার্থিব উন্নতির দ্রুতপ্রবাহ চলিয়াছিল। জড়বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তান্ত্রিক যুগেও প্রাকৃতজ্ঞানের আবিষ্কার কম হয় নাই। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশের প্রাকৃতজ্ঞান পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। কিন্তু কথা এই যে আমাদের সাধনার গতি প্রকৃতিপূজার দিকে ছিল না। প্রাকৃতজ্ঞান-লাভ তাহার লক্ষ্য ছিল না। জড়বিজ্ঞানের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা জীবনের আনুসঙ্গিক ফল। উদ্দেশ্যপূর্ব্বক জ্ঞানকৃত চেষ্টার ফল নয়। আমাদের জাগ্রত চৈতন্যের সম্মুখে আত্মা ও পরমাত্মার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সর্ব্বদা উপস্থিত থাকায়, জড়বিজ্ঞানের উন্নতি তাহার লক্ষ্যীভূত হইতে পারে নাই। দার্শনিক যুগের শেষে ভক্তির যুগে আমরা প্রকৃতিকে লীলার সহচরীরূপে গ্রহণ করিয়াছি। সে গ্রহণ করুণার গ্রহণ। শিশুর ক্রীড়াপুত্তলিকার মত জননীর

স্নেহের গ্রহণ। গুণের আকর্ষণে আবশ্যকবোধে জ্ঞানের গ্রহণ নয়।

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে প্রকৃতিপূজা চলিতেছিল। আমরা সেই বিরাট্ সাধনার কিছু দেখি নাই ও জানি নাই। পাশ্চাত্যদেশের সাধকগণ এই পূজায় সিদ্ধি লাভ করিয়া মানবচিত্তে বিজ্ঞানরূপ এক অভিনব জ্ঞানতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন বিজ্ঞানের আলোকে প্রকৃতি বিশ্ববিধাতার রহস্য-লোকের বার্ত্তাবাহিনী দেবী। তাঁহার এক হস্তে জ্ঞান এবং অপর হস্তে জীবন। প্রকৃতির উপাসনায় জ্ঞানলাভ করিয়া বিজ্ঞান আজ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের উপর স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনের স্পর্দ্ধা করিতেছে। পাশ্চাত্যদেশে তপস্যাময় জীবন সমাপ্ত করিয়া প্রকৃতিদেবী এই বিজ্ঞানরূপ সাধনাময় জীবন লইয়া সাধনার দেশ ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। এই শুভাগমন প্রকৃতির প্রতিশোধ নয়, ইহা দেবতার অযাচিত দান!

ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নূতন পরিচয় সংস্থাপনের ফলে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনের একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এই সংঘর্ষে কোন্ জাতির সংসার ও জীবনের প্রতি দৃষ্টি কি পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, মানবের চিন্তারাজ্যে কোন্ অভিনব তরঙ্গ উত্থিত হইয়া বর্ত্তমান পৃথিবীর চিন্তার গতি নিয়মিত করিতেছে, কোন্ জাতির কোন্ বিষয়ে কতটা জয়পরাজয় হইয়াছে পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজ এখনও তাহার কোন সূক্ষ্ম সমালোচনা করিতে সমর্থ হন নাই। বর্ত্তমান ভারতের কর্ম্মজীবনে যে পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহা সুস্পষ্টরূপেই দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের জ্ঞানজীবনেও যে অনেক দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিবার নয়। এই পরিবর্ত্তন প্রবাহের মধ্যে একটী মাত্র পরিবর্ত্তন বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। তাহা এই, ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রবেশলাভ এবং প্রকৃতিপূজার পুনঃপ্রবর্ত্তন।

আমাদের সাধনার গতি ভক্তি ও মাধুর্য্যের বিকাশের সহিত বিরামপ্রাপ্ত হইয়াছে। মাধুর্য্যেমগ্ন জ্ঞানের যোগভঙ্গ করিয়া আমাদের

সাধনালব্ধশক্তিকে কর্ম্মজগতে সার্থক করিয়া তুলিতে নূতন দৃষ্টি ও নূতন জ্ঞানের আঘাত আবশ্যক। বিজ্ঞান এইরূপ একটী নূতন দৃষ্টি ও নূতন জ্ঞানতরঙ্গ আমাদের জাগ্রত চৈতন্যের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। প্রকৃতির অবগুণ্ঠন কথঞ্চিৎ উন্মোচন করিয়া বিজ্ঞান আমাদের চক্ষে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও নবীনত্ব ফিরাইয়া আনিয়াছে এবং জ্ঞানের পরিচ্ছদ দিয়া তাহাকে আমাদের গ্রহণযোগ্য বেশে উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু আমাদের গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতিকে তাহার বিশুদ্ধির ও কল্যাণকারিণী বৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞানের জ্ঞান যতই সত্যময় হউক ভারতের বিবেক বৈরাগ্যের কষ্টিপাথরে তাহার মূল্যের যাচাই করিতে হইবে। মানবসাধনায় তাহার যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ভারতবর্ষকে কিছু গ্রহণ করিতে হইলে তাহাকে পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানরাশির সহিত সমন্বয় করিয়া স্বীয় জ্ঞানজীবনের অঙ্গীভূত করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। নচেৎ তাহার দীর্ঘজীবনের সাম্য বিনষ্ট হইতে পারে। প্রকৃতির পুনরাবির্ভাব এতদিন এইরূপ পরীক্ষাধীন ছিল। সে পরীক্ষার এখন শেষ হইয়াছে এবং প্রকৃতিদেবী তাহাতে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। আমাদের সাময়িক সাহিত্য তারস্বরে প্রকৃতির শুভাগমন ঘোষণা করিতেছে। বিজ্ঞানাচার্য্য প্রাকৃত-বেদের নূতন মন্ত্র দর্শন করিয়া প্রকৃতিপূজার নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৈদিকযুগের প্রকৃতি নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সংসারে অবিমিশ্র ভাল কিছুই নাই। বিজ্ঞানের জ্ঞানের সঙ্গে অনেকটা অজ্ঞান বা কুজ্ঞানও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। প্রত্যক্ষবাদ ও ভোগবাদ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বাল্যসহচর। এই সহচরটী তাহার জন্মের দেশে যে বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিজ্ঞানের সঙ্গে তাহার বাল্য সহচরটীও ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছে এবং তাহার স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তাহার প্রথম দর্শনেই অনেকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শের রোমন্থন করিতেছেন।

কিন্তু বাদবহুল এই দর্শনের দেশে নূতন বাদের প্রবেশদ্বার বড় সঙ্কীর্ণ। প্রত্যক্ষবাদ ও ভোগবাদের আবির্ভাব ভারতে এই প্রথম নয়। চার্ব্বাকের ক্ষীণকণ্ঠ আধ্যাত্মিকতার কোলাহলে চিরতরে মগ্ন হইলেও, তাঁহার শ্লেষাত্মক বাক্যাবলী এখনও আমাদের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। প্রত্যক্ষবাদ ভোগমূলক, জ্ঞানমূলক নয়। সান্ত ও সসীমের বন্ধনের মধ্যে তাহার দৃষ্টি চিরনিবদ্ধ। বেদ বেদান্তের দেশ—কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও শঙ্করের দেশ কখনই সান্তের বন্ধনে অনন্তকে বিসর্জ্জন করিবে না। দার্শনিক ভারতের তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষদুর্গ ভেদ করিয়া অপ্রত্যক্ষকে আবিষ্কার করিয়া লইবে। প্রত্যক্ষবাদকে তাহার জন্মের দেশেই থাকিতে হইবে। ভারতে জ্ঞান ও ধর্ম্মে প্রতিদ্বন্দিতা নাই। আচার্য্য তাঁহার বিজ্ঞান-মন্দির ভারতের গৌরবার্থে দেবচরণে উৎসর্গ করিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের অন্তর্জীবন অবসন্ন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যক্ষবাদের স্বাস্থ্যপ্রদ প্রভাব তাহাকে ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিবে। প্রত্যক্ষবাদের ছায়াদৃশ্য সম্মুখে দেখিয়া ভীত হইবার আবশ্যক নাই—ভারতে তাহার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী।

প্রকৃতির এই নূতন পূজা বা বিজ্ঞানসাধনা বর্ত্তমান ভারতের নূতনব্রত। জ্ঞানের সাধনায় সন্ন্যাসের ব্যবস্থা ভারতে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞানের জন্য সংসার ত্যাগ ভারতের এক অদ্ভুত বিশেষত্ব। বৈরাগ্যই অনুরাগের মাত্রা। সাধনা চিরকালই বৈরাগ্যপ্রবণ। জ্ঞানের সাধনায় যে ঐকান্তিকী শ্রদ্ধার প্রয়োজন, বৈরাগ্য ভিন্ন তাহার উৎপত্তি হয় না। অতীতের সাধনালব্ধ স্বভাব ভারতবাসী এখনও পরিত্যাগ করে নাই। বিজ্ঞান সাধনায়ও যে সে চিরাভ্যস্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ভারতের সাধনা এক্ষেত্রে কোন্ বিচিত্র সিদ্ধি লাভ করিবে, কোন্ অপার্থিব জগতের রহস্যদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া নবযুগপ্রবর্ত্তনের সাহায্য করিবে, বিজ্ঞানের অস্ফুট আলোকে ভবিষ্যতের সেই ছায়ামূর্ত্তিগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এই নূতন ব্রতের ফলশ্রুতি এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে

লুক্কায়িত। সাধনার প্রারম্ভে আচার্য্যের নূতন মন্ত্রদর্শনে ভারতীয় চিন্তার যে অভ্রান্ত বিশেষত্ব দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে একমাত্র ইহাই মনে হয় যে বিজ্ঞান ভারতের চিরআশা ও আকাঙ্ক্ষার অনুকূল। বিজ্ঞা-নের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভারতের জ্ঞানময় ও প্রেমময় জীবনকে আরও সুদৃঢ় করিবে।*

মানবের সুখান্বেষণের মূল ও তাহার পরিণতি।

(শ্রীহরিপ্রসাদ বসু, এম, এ, বি, এল)

এই বৈচিত্র্যময় জীবজগতের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই আপন আপন স্বভাব অনুসারে সুখের অনুধাবন করিতেছে। কি জরায়ুজ, কি অণ্ডজ, কি স্বেদজ, কি উদ্ভিজ্জ যাহা কিছু প্রাণবান্, যাহা কিছু 'জীব' শব্দবাচ্য সকলেরই লক্ষ্য সুখ। জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক জীব এমন কোন কর্ম্ম করে না যাহার ফলে সে সুখের আকাঙ্ক্ষা করে না। ক্ষুদ্র কীটাণু কীট হইতে আরম্ভ করিয়া জীব-সৃষ্টির শীর্ষস্থানীয় চরমোৎকর্ষ-প্রাপ্ত মানব পর্য্যন্ত এই একই নিয়মে গাঁথা। বর্ত্তমানসময়ে ইহা পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য যে, সুখদুঃখাদি সম্বন্ধে উদ্ভিদ্‌ও মানবের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট। উদ্ভিদের নিকট এমন কোন পদার্থ লইয়া যান যাহা তাহার জীবনীশক্তির হ্রাসকর, যাহা তাহার পক্ষে কষ্টদায়ক সে সঙ্কুচিত হইবে—দুঃখের শোকের চিহ্ন প্রকাশ করিবে; পক্ষান্তরে

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীতে পঠিত।

এমন কোন পদার্থ লইয়া যান যাহা তাহার জীবনীশক্তির পরিপোষক সে প্রসারিত হইবে—সুখের আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ করিবে। এই যে দুঃখের নিকট হইতে পলায়ন ও সুখের নিকট অগ্রগমন—ইহা উদ্ভিদের সুখাকাঙ্ক্ষার নিদর্শন। কীট পতঙ্গ ইতর প্রাণী সম্বন্ধেও ইহা সর্ব্বত্রই অনুক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানব সম্বন্ধে ত কথাই নাই। মাতৃগর্ভ হইতে ভুমিষ্ঠ হইবামাত্র যেন দুঃখালয় সংসারের সহিত সম্পর্কজনিত দুঃখভোগের ভাবী আশঙ্কা সূচনা করিয়া শিশু কাঁদিয়া উঠে—তাহার দুঃখ প্রকাশ করে ও তৎকালোচিত শুশ্রূষা দ্বারা তাহার ক্রন্দনের নিবৃত্তি হয়। সে সুখানুভব করিয়া সুস্থ হয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত এই নিয়ম অক্ষুণ্ণভাবে কার্য্য করিতে থাকে। মাতৃ-অঙ্ক শিশুর স্বর্গভূমি, তাই শিশু কষ্টের ইঙ্গিতমাত্রেই মাতৃ-অঙ্কে ধাবিত হয় ও তাহা লাভ করিয়া সুধার হাসি হাসিতে থাকে; ক্ষুৎপীড়িত হইলে মাতৃস্তন্য অন্বেষণ করে ও স্নেহমাখা স্তন্য পান করিয়া দুঃখের নিবৃত্তি করে—তাহার কোমলতা পবিত্রতা পূর্ণ মুখে সুখের আনন্দের বিকাশ হয়। বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমোন্মেষের সহিত এই সুখের আদর্শের তারতম্য ঘটে বটে—কিন্তু প্রতিপক্ষেই মানব তাহার তৎকালীন আদর্শ অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। জীবনে যখন সে যাহা সুখ বলিয়া জ্ঞান করে তাহা পাইবার জন্য ধাবিত হয় ও তাহার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত তাহাই করিয়া থাকে এবং তৎপ্রতিকূল অবস্থাকে দুঃখজনক জ্ঞান করিয়া তাহা ত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর হয়। বাল্যে ধূলাখেলা করিয়া, কৈশোরে বিদ্যার্জ্জনে কৃতিত্ব দেখাইয়া, যৌবনে গার্হস্থ্য জীবন লাভ করিয়া ও অর্থাগমসহ বিবিধ ভোগবাসনার চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া, প্রৌঢ়ে ও বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া মানব সুখের অনুগমন করিয়া থাকে। জগতের নশ্বরতাও যেমন ধ্রুবসত্য জীবের সুখান্বেষণও সেইরূপ ধ্রুবসত্য। এই সুখের জন্যই মানবের দেবারাধনা—

"কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহদেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥"

ইহলোকে কর্ম্মজন্য ফল শীঘ্র পাওয়া যায় বলিয়া সকাম ব্যক্তিগণ দেবতাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন। আবার তাহাতেও যখন মানব তৃপ্তিলাভ না করে, যখন মানুষের অভিজ্ঞতা হয় যে, কর্ম্মসিদ্ধি-রূপ সুখ চিরস্থায়ী নহে, তাহা অন্যান্য সুখের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, ও কর্ম্মফলকামনামূলক দেবারাধনা প্রকৃষ্ট আরাধনা নহে, তাহা নিম্ন শ্রেণীর আরাধনা—তখন মানব আরও উচ্চ সোপানে উঠিবার জন্য ব্যগ্র হয় – তখন সে স্থায়ীসুখের জন্য. নিত্য সুখের জন্য, "ঐকান্তিক" সুখের জন্য ব্যগ্র হয় ও যে লোকে যাইলে সেই পরম সুখ পাওয়া যায়– সেই লোকে যাইবার জন্য চেষ্টা করে ; যে আরাধনা করিলে, যে সাধনা করিলে সেই "আত্যন্তিক" সুখের অধিকারী হওয়া যায় সেই আরাধনা সেই সাধনা করে।

মোটের উপর দেখিতে পাওয়া গেল. আনন্দই জীবের তথা মানবের অনুসন্ধানের বিষয়। তাহার কারণ কি? কেন এমন হয়? জীব, মানব আনন্দের অনুসন্ধান করে কেন? কারণ আর কিছুই নয়—জীব বা মানব আনন্দস্বরূপ সে স্বরূপের অনুসন্ধান করে। এই যে স্বরূপের অনুসন্ধান ইহাও নিত্যপ্রত্যক্ষ বিষয়। মনে করুন কোন সমৃদ্ধিশালী জনপদে বা কোন তীর্থস্থানে এক মহামেলার অধিবেশন হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে এই অধিবেশনের সংবাদ বিশিষ্টরূপে প্রচারিত হওয়ায় ও সর্ব্বশ্রেণীর মানবের চিত্তবিনোদন-উপযোগী দ্রব্যসম্ভার ও উৎসবাদির আয়োজন বিজ্ঞাপিত হওয়ায় উক্ত মহামেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছে। ইহা মনে করা যায় না যে এই লক্ষ লক্ষ লোক একই প্রকৃতির হইবে। সকলেই সাধু, সকলেই পণ্ডিত, সকলেই ধনী, সকলেই পরোপকারী এরূপটী ঘটে না। এই লক্ষ লক্ষ লোকপূর্ণ জনতায় সাধু থাকিবেন অসাধুও থাকিবেন, পণ্ডিত থাকিবেন মূর্খও থাকিবেন, ধনী থাকিবেন নির্ধনও থাকিবেন, পরহিতকারী থাকিবেন পরদ্বেষীও থাকিবেন নানা প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক তাহার মধ্যে দেখা যাইবে। এখন একথা সকলেই বিদিত আছেন যে এইরূপ অসংখ্য জনপূর্ণ মহামেলার অধিবেশনে

যিনি ধর্ম্মপ্রাণ সাধু তিনি সেইরূপ সাধুরই অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, যিনি পণ্ডিত তিনি পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইবেন, যিনি তস্কর তিনি তস্করের সহিত, যিনি মদ্যপ তিনি মদ্যপের সহিত, যিনি লম্পট তিনি লম্পটের সহিত, যিনি সঙ্গীতজ্ঞ তিনি সঙ্গীতজ্ঞের সহিত—এই প্রকার প্রত্যেকে সমধর্ম্মা লোকের সহিত মিলিত হইবেন। অর্থাৎ স্ব স্বরূপ লোকের সহিত মিলিত হইয়া মেলাদর্শন ও উৎসবাদি উপভোগ করিবেন। এখন জীবের স্বরূপ হইতেছে আনন্দ, তাই জীব সংসারে আসিয়া আনন্দ খুঁজিয়া বেড়ায়। জীব বা মানব যে আনন্দস্বরূপ একথা কোথা হইতে পাইলাম? হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মস্থলেই একথা লেখা রহিয়াছে। বেদান্ত, গীতা, পুরাণ প্রভৃতির সামান্য আলোচনা করিলেও একথা জানিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তথ্য সংগ্রহ কঠিন ও বহু সময় সাপেক্ষ হইতে পারে কিন্তু যাহা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়া সকল তথ্যের মধ্যস্থলে চিত্তাকর্ষকভাবে অবস্থান করিতেছে তাহার সহিত পরিচয় হইতে অধিক বিলম্ব হয় না।

আমরা শাস্ত্রালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নাই। এই যে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ—যাহার তুলনায় আমাদের সৌরমণ্ডল বালুকণার লক্ষাংশের একাংশও নহে—ইহা ব্রহ্মের একাংশ মাত্র। ভগবান্ তাঁহার বিভূতি বর্ণনা করিতে গিয়া এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

"অথবা হে ধনঞ্জয় এইরূপ পৃথক্‌বিধ বহুজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই সমুদয় জগৎ একাংশে ধরিয়া অবস্থিত আছি (অর্থাৎ আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই)।"

বস্তুতঃ এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। এক ব্রহ্ম হইতেই অনুলোম বিলোম ক্রমে সৃষ্টি প্রলয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মই এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। কুম্ভকার ঘট গড়িতে

যাইলে তাহাকে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া ঘট গড়িতে হইবে। কুম্ভকার এখানে নিমিত্ত কারণ ও মৃত্তিকা উপাদান কারণ। কুম্ভকারের শক্তি নাই যে সে কোনরূপে মৃত্তিকা প্রস্তুত করে। সেই জন্য ঘট-করণ বিষয়ে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ স্বতন্ত্র কিন্তু জগৎসৃষ্টিতে এই স্বাতন্ত্র্য নাই; যিনিই নিমিত্ত কারণ তিনিই উপাদান কারণ,—ব্রহ্মই নিজ শক্তিবলে উপাদানসহ জগতের সৃষ্টি করেন। এই শক্তিই ব্রহ্মের মায়াশক্তি, ইহাকেই প্রকৃতি বলে—"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ"। গ্রীষ্মাধিক্যে বিকট তাপপ্রযুক্ত ক্ষেত্রস্থিত তৃণগুল্মাদি দগ্ধ হইয়া ক্ষেত্র মরুভূমিতে পরিণত হয়, আবার বর্ষাগমে জলধারায় সিক্ত হওয়ায় সেই ক্ষেত্রই তাহার মরুভূমির আকার পরিত্যাগ করে ও নূতন তৃণগুল্মাদিতে পরিশোভিত হয়। কারণ, প্রচণ্ড উত্তাপে ক্ষেত্রস্থিত তৃণাদি শুষ্ক হইলেও বীজ ক্ষেত্রমধ্যে নিহিত ছিল; বৃষ্টিপাতে সরসতা প্রযুক্ত পুনরায় অঙ্কুরোদ্গম হয় ও তাহারা তৃণাদি আকার প্রাপ্ত হয়। প্রলয় সৃষ্টিও সেইরূপ। প্রলয়কালে ক্ষিতি অপে, অপ্ তেজে, তেজ মরুতে, মরুৎ ব্যোমে, ব্যোম অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, ও মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়—পুরাণের ভাষায় তখন কেবল কারণার্ণবে বটপত্রশায়ী ভগবান্ ভিন্ন আর কেহই থাকেন না। আবার সৃষ্টিকালে ব্রহ্মের ঈক্ষণহেতু সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সাম্যাবস্থা দূরীভূত হইয়া প্রকৃতির ক্ষোভ হইলে তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ব্যোম, ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্, অপ্ হইতে ক্ষিতি এইরূপে জগতের পুনর্ব্বিকাশ হয়—

"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥"

দিবসের উপক্রমে (অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে) কারণরূপ অব্যক্ত হইতে সমুদয় ব্যক্ত অর্থাৎ চরাচর প্রাণিগণ প্রাদুর্ভূত হয় এবং

রাত্রির উপক্রমে (অর্থাৎ প্রলয়ের আরম্ভে) সেই অব্যক্ত রূপ কারণে প্রলীন হয়। এই ব্যক্ত চরাচর ভূতসকল এইরূপে বারংবার রাত্রি সমাগমে প্রলীন হয় ও দিবস সমাগমে প্রাদুর্ভূত হয়। এই যে দিবস ও রাত্রি ইহা ব্রহ্মার দিবস ও রাত্রি।

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে প্রকৃতি হইতে সমস্ত ভূতের সৃষ্টি আবার প্রকৃতিতেই লয়। এই প্রকৃতি কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন? না; ইহা তাঁহারই শক্তি একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রমাণস্বরূপ গীতার নবম অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥"

"হে কৌন্তেয় প্রলয়কালে সর্ব্বভূত মদীয় প্রকৃতিতে লীন হয় এবং আবার সৃষ্টিকালে আমি তাহাদিগকে উৎপাদন করি। আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বভাববশে কর্ম্মাদিপরবশ এই সমস্ত ভূতকে পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।"

"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" "মামিকাং প্রকৃতিং," "স্বাং প্রকৃতিং" এই মামিকা ও স্বা শব্দের উপর লক্ষ্য করিলে নিঃসন্দেহ বুঝা যায় যে, এই প্রকৃতি ব্রহ্মের অতিরিক্ত কিছু নহে—তাঁহারই আপনার জিনিষ, নিজের শক্তি। সপ্তমে ভগবান্ আরও পরিষ্কার করিয়া ও বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আমার অষ্টবিধা প্রকৃতি—ইহা অপরা প্রকৃতি। ইহা ছাড়া আমার পরা প্রকৃতি আছে, যাহা জীবস্বরূপ এবং যাহা এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে। ইহা হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান। অর্থাৎ এই যে 'পরা প্রকৃতি' ও 'অপরা প্রকৃতি' যাহা হইতে সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হইতেছে তাহা 'আমার'। আমা হইতে পরতর বা শ্রেষ্ঠতর আর

কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণিগণ গাঁথা থাকে এই জগৎ সেইরূপ আমাতে গাঁথা আছে। তাহার পর বিশেষভাবে বলিতেছেন, "আমি জলে রস, শশিসূর্য্যের প্রভাস্বরূপ, সর্ব্ববেদের প্রণবস্বরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন আমরা নিঃসন্দেহ হইলাম যে এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। ব্রহ্ম হইতে জগৎ ও জীব। চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম মায়া-উপহিত হইয়া জীব নাম ধারণ করেন। ব্রহ্মই যদি মায়া-উপহিত হইয়া জীবরূপে প্রকাশ পান তাহা হইলে ব্রহ্মের লক্ষণ জীবে - যত সামান্য পরিমাণেই হউক না কেন—প্রকাশ পাওয়া বিচিত্র নহে; তাহাই পাইয়া থাকে। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে—"God made man after His own image" অর্থাৎ নিজের মত করিয়া ভগবান্ মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা হইলে ব্রহ্ম কিরূপ, ভগবানে কি আছে দেখিলেই জীবকে—মানবকে বুঝা যাইবে। আমরা জানি উপনিষদ্ ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়াছেন। কয়েকটী শ্রুতিবাক্য এখানে দেওয়া যাইতে পারে, যথা:—

"সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম"॥ নৃসিংহতাপনী (পূর্ব্ব), ১৬।

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"॥ বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম॥ সর্ব্বোপনিষৎসার।

"রসো বৈ সঃ"॥ তৈত্তিরীয়, ২।৭—ইত্যাদি।

গীতায়—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং . সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥"

"আমি ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় বা পর্য্যাপ্তি স্বরূপ।" ভাগবত পুরাণে—

"নাতঃপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।"

ভাঃ পুঃ, ৩.৯ ৩।

"হে পরম তোমার যে মূর্ত্তির প্রকাশ আবৃত হয় না এবং যাহা ভেদশূন্য সুতরাং আনন্দস্বরূপ।" এই সকল হইতে দেখা যাইতেছে, ব্রহ্ম সৎ, ব্রহ্ম চিৎ, ব্রহ্ম আনন্দ। "ব্রহ্মের সত্তাতেই জীবের

সত্তা, ব্রহ্মের চৈতন্যেই জীবের চৈতন্য, ব্রহ্মের আনন্দেই জীবের আনন্দ"। ব্রহ্ম যেন ত্রিবিধ সাগরের ত্রিবেণী সঙ্গম। অনন্ত ব্রহ্ম সমুদ্র হইতে তিন প্রকারের তরঙ্গ উত্থিত হইয়া বিশ্বরূপ বেলাভূমিকে প্লাবিত করিতেছে—সেই প্লাবনে বিশ্বের স্থিতি, বিশ্বের জ্ঞান ও বিশ্বের আনন্দ। এই শক্তিত্রয়কে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী বলা হইয়া থাকে ও হ্লাদিনী শক্তিকে অপর দুই শক্তির সার অংশ বলা হইয়া থাকে। এই হ্লাদিনী শক্তিই বৈষ্ণবশাস্ত্রে মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা—শ্রীভগবানের লীলার মূল।

"সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ ;
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী,
চিদংশে সম্বিদ্ যারে জ্ঞান বলি মানি।

*　　　*　　　*

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব ;
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব।
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী,
সর্ব্বগুণমণি-কৃষ্ণ-কান্তাশিরোমণি॥"

মানবে এই হ্লাদিনী শক্তি সুপ্তভাবে আছে বলিয়াই মানব আনন্দ অনুভব করে ও আনন্দের উৎস খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু মানব ত সসীম, অপরিপূর্ণ, সান্ত ; তাহার সাধ্য হয় না যে অসীম, পূর্ণ, অনন্ত কোন ভাব একেবারে গ্রহণ করে ও ধরিয়া রাখে। তাই মানবহৃদয়ে সুখের ক্ষণিক বিকাশ হইয়া আনন্দের সাময়িক প্রতিষ্ঠা হইয়া আবার তাহা লোপ পায়, তাহা অন্তর্হিত হয়। মানবের সুখানুসন্ধান কি তবে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় অসত্য বস্তু? বিদ্যুতের ক্ষণিক বিকাশের পর ঘোর অন্ধকার যেমন পথিকের পীড়াদায়ক হয় আনন্দের ক্ষণিক বিকাশও কি সেইরূপ দুঃখের, যন্ত্রণা বর্দ্ধনের হেতুভূত মাত্র? তাহার কি অন্য প্রয়োজন নাই—অন্য সফলতা নাই? করুণাময় ভগবানের রাজ্যে তাহা সম্ভব নয় ; উহার সম্পূর্ণ সফলতা আছে। ঐ অস্থায়ী

বিকাশের ভিতর দিয়াই মানব স্থায়ীকে পাইতে পারে, ঐ খণ্ড সুখের ভিতর দিয়াই মানব অখণ্ড সুখের পূর্ণ আনন্দের অনুভব করিতে সমর্থ হয়। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন -

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" যাহারা যে ভাবে আমার উপাসনা করে আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। চাই যথার্থ চেষ্টা, প্রকৃত সাধনা। মানব যদি একান্ত মনে আনন্দের অধিকারী হইব বলিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করে সে আনন্দের অধিকারী হইবেই - কেন না ভগবান্ ত স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে আমাকে যে যে ভাবে ভজনা করিবে আমিও তাহাকে সেই ভাবে ভজনা করিব অর্থাৎ তাহার সংকল্প সাধনা করিব। কি করিয়া মানব এই সফলতা লাভ করিবে, কোন্ পথ দিয়া কোথায় যাইলে মানব সেই আনন্দের উৎসে পৌঁছিবে অতঃপর আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

সচরাচর নিয়ম এই যে, যে যে দ্রব্যের যেখানে সংস্থান তাহাকে সেই স্থান হইতেই আনিতে হইবে অথবা সেইখানে গিয়া লাভ করিতে হইবে। পুষ্প আহরণেচ্ছু ব্যক্তিকে পুষ্পোদ্যানে যাইতে হইবে, আহার্য্য আহরণেচ্ছু ব্যক্তিকে আহার্য্যের বিপণিতে যাইতে হইবে, গ্রন্থ সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিকে গ্রন্থালয়ে যাইতে হইবে, বারিলাভার্থ ব্যক্তিকে জলাশয়ে যাইতে হইবে, আনন্দলাভেচ্ছু ব্যক্তিকে আনন্দধামে যাইতে হইবে। ব্রজগোপীদিগের দুর্দ্দিনে শ্রীবৃন্দাকে কৃষ্ণধন দর্শন ও আনয়ন করিবার জন্য মথুরাধামে যাইতে হইয়াছিল।

"যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

—যাহা লাভ করিলে তাহা অপেক্ষা অধিকতর লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না, যে অবস্থায় থাকিলে গুরুতর দুঃখের দ্বারা বিচলিত হয় না, সেইরূপ অবস্থা লাভ করিতে হইবে—আমাদিগকে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুব দিতে হইবে, তবেই সেই অমূল্য রত্ন মিলিবে। কোথায় সেই সচ্চিদানন্দ সাগর?

জ্ঞানীরা বলেন, উহা তোমার নিকট হইতেও নিকটে, শুধু তাহাই নহে, "তত্ত্বমসি"—তুমিই তাহা ইহা জানিলেই শান্তি। মনরূপ মায়াদ্বারা সেই জ্ঞানসূর্য্য আবৃত রহিয়াছে। মনবুদ্ধির পারে যাইলেই তাঁহার দর্শন মিলিবে।

"বৃহচ্চতদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥

(মুণ্ডকোপনিষদ্)

—আত্মা বৃহৎ, দিব্য, অচিন্ত্যরূপ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতররূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি দূর হইতে সুদূরে আবার এই নিকটেই রহিয়াছেন। এই জীবনেই যাঁহারা আত্মসাক্ষাৎকার করেন তাঁহারা তাঁহাকে বুদ্ধিরূপ গুহায় নিহিত দেখিতে পান।

আবার ভক্তেরা বলেন, সচ্চিদানন্দের বসতি বৈকুণ্ঠধামে; তিনি গোলোকধামে নিত্য বসতি করেন। সেই গোলোকধামে যাইতে পারিলে আর তাঁহার সন্দর্শনের অভাব থাকিবে না। কোথায় সেই স্থান? ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি লোকের বহু উর্দ্ধে। চরিতামৃতে আছে—"'মায়াতীতে' ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে"। অন্যত্র—

"প্রকৃতির পার পরব্যোম নাম ধাম
কৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি গুণবান্
সর্ব্বগ অনন্ত ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদি ধাম
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অবতারের তাঁহাই বিশ্রাম।"

বৈকুণ্ঠ তাহা হইলে প্রকৃতির পার মায়াতীত স্থান। অতএব দেখা যাইতেছে জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েই মায়াতীত রাজ্যের নির্দ্দেশ করিতেছেন। দক্ষিণ হইতে তিব্বত রাজ্য যাইতে হইলে যেমন হিমানী-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় বৈকুণ্ঠ রাজ্যে যাইতে হইলে সেইরূপ মায়ার রাজ্য অতিক্রম করিতে হয়।

কিরূপে সেই দুস্তর মায়াসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে? ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
'মায়য়াপহৃতজ্ঞানা' আসুরংভাবমাশ্রিতাঃ॥"

মায়া দ্বারা অপহৃতজ্ঞান আসুরভাবাপন্ন দুষ্কৃতকারী নরাধম মূর্খগণ আমাকে লাভ করিতে চায়ও না পায়ও না। অতএব সন্দেহ নাই যে মায়া দ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইলে অর্থাৎ মায়ার রাজ্য অতিক্রম না করিলে আনন্দধাম বৈকুণ্ঠধামে যাইতে পারা যাইবে না। আসুরভাবাপন্ন মানবের আনন্দনিকেতনে যাইবার অধিকার নাই।

ইহসংসারে মানবের দুইটী ভাব আছে—দৈব ও আসুর। আসুরভাবাপন্ন মানব দুঃখের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পায় না। দৈবভাবাপন্ন মানব দুঃখের পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিত্য আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে—

"দৈবীসম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরীমতা"

দৈবীসম্পদের সাহায্যে মায়ার রাজ্য অতিক্রম করিতে হইবে। এই দৈবীসম্পদ্ কি?

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥"

নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানে প্রযত্ন, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, খলতার অভাব, দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, লজ্জা, চপলতাহীনতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ, অভিমানশূন্যতা এই সকল সদ্‌গুণ দৈবীভাবাপন্ন মানবকে অলঙ্কৃত করে। মায়ারাজ্য অতিক্রম করিতে হইলে বৈকুণ্ঠযাত্রীকে এই সকল মহামূল্য উপাদান দ্বারা পন্থা নির্ম্মাণ

করিয়া লইতে হয় ও সেই পন্থা সহযোগে আনন্দের দ্বারে—অমৃতের দ্বারে উপনীত হইতে হয়। সহজে কি এই দৈব ভাবকে লাভ করা যায়?

সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে সামান্য বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে মানবকে কত যত্ন কত চেষ্টা করিতে হয়। যিনি যে বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে চাহেন, যে বিষয়ে কৃতিত্বলাভ করিতে চান, অনন্যচিত্ত হইয়া তাঁহাকে সেই বিষয়ের ধ্যান করিতে হয়, সেই বিষয়ের অনুশীলন করিতে হয়। এক প্রণয়ীর দুইজন বা ততোধিক প্রণয়িনীকে সমভাবে আকর্ষণ করা সম্ভবপর নহে। দুইয়ের সেবা দ্বারা দুইয়েরই কিছু কিছু লাভ করা সম্ভবপর হইতে পারে কিন্তু দুইয়ের ষোলআনা অর্জ্জন করা যায় না। একের সমগ্র স্নেহের অধিকারী হইতে হইলে অপরকে ছাড়িতে হয়। হাস্যরসের শ্রেষ্ঠকবি পূজনীয় দীনবন্ধু বাবুর লিখিত সপত্নীদ্বয়ের প্রেমভাজন ভাগ্যবান্ স্বামীর আলেখ্য ঐ বিষয়ক উৎকৃষ্ট Caricature বা নক্‌সা। উপরোক্ত দৈবভাব লাভ করিতে হইলে তাহার অনন্যসেবক হওয়া চাই। দৈবভাব বলিতে অনেকগুলি সদ্‌গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে—কিন্তু যেমন বিজ্ঞান শাস্ত্রে তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি বিবিধ শক্তির উল্লেখ থাকিলেও তাহাদিগকে এক মূল শক্তির অবস্থাবিশেষলব্ধ বিভিন্ন বিকাশমাত্র বলা হইয়া থাকে—সেইরূপ দৈবভাবব্যঞ্জক সদ্‌গুণাবলীকে প্রধানতঃ এক সামান্য শক্তির বিশেষ বিশেষ বিকাশ বলিতে পারা যায়। সেই অমূল্য শক্তির নাম বৈরাগ্য বা Renunciation; ইহারই বিপরীত শক্তির নাম ভোগলিপ্সা। বৈরাগ্য ও ভোগলিপ্সা নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি এই দুই বিবদমান শক্তির কুরুক্ষেত্ররূপ সংগ্রামস্থল মানবের হৃদয়। যে অবোধ এই দুইয়ের সেবা করিয়া এই দুইকেই সন্তুষ্ট করিতে যাইবে সে সম্ভবতঃ দুইকেই হারাইবে। ভোগের দ্বারা মানব সংসারেই বদ্ধ হইয়া থাকিবে। ভোগীর সংসার অতিক্রম করার চেষ্টা আকাশকুসুম লাভের চেষ্টার ন্যায় অলীক। ভোগের দ্বারা আনন্দের অধিকারী হওয়া যায় না—লালসার পরিতৃপ্তি হয় না।

অগ্নিযুক্ত ইন্ধনে ঘৃতাহুতির ন্যায় ভোগের দ্বারা লালসার বৃদ্ধি হয় মাত্র। তাহার শেষ দেখা যায় না, অবশেষে মানবকে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। সুখের পিছনে দৌড়িয়া সুখকে ধরিতে পারা যায় না। যেমন চক্রবাল স্পর্শ করিবার অভিপ্রায়ে কোন মানব দৌড়াইতে আরম্ভ করিলে সে যত অগ্রসর হয় চক্রবালও ততই পিছাইয়া যায় তাহার চক্রবাল লাভ হয় না পরন্তু দৌড়ানই সার হয়, সেইরূপ "সুখ" "সুখ" বলিয়া তাহার পিছনে যত দৌড়াইবে সুখ ততই পিছাইয়া যাইবে সুখকে পাইবে না, দৌড়ানই সার হইবে। অতএব ভোগকে ছাড়িতে হইবে বৈরাগ্যকে সেবা করিতে হইবে—প্রবৃত্তিকে ছাড়িতে হইবে নিবৃত্তিকে লইতে হইবে। পূজনীয় শ্রীযুক্ত সারদানন্দ স্বামী তাঁহার ভক্তিপূর্ণ গবেষণামূলক "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে" লিখিয়াছেন—

"ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে যাইয়াও মানব সংসার ও ঈশ্বর, ভোগ ও ত্যাগ উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া চলিতে চাহে! ভাগ্যবান্ কোন কোন ব্যক্তিই তদুভয়কে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া ধারণা করে এবং ঈশ্বরার্থে সর্ব্বত্যাগরূপ আদর্শকে কাটিয়া ছাঁটিয়া অনেকটা কমাইয়া না আনিলে ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য হওয়া অসম্ভব এ কথা বুঝিয়া ঐরূপ ভ্রমে পতিত হয় না। ঐরূপে উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া যাহারা চলিতে চাহে তাহারা শীঘ্রই ত্যাগাদর্শের দিকে এতটা পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য ভাবিয়া সীমানির্দ্দেশ পূর্ব্বক চির-কালের নিমিত্ত সংসারে নোঙর ফেলিয়া রাখে"। ভগবান্ও এই কথা বলিয়াছেন—

> "অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
> নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥"

সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধি (এখানে সর্ব্বত্র শব্দ লক্ষ্য করিবার বিষয়) নিরহঙ্কার স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাসের দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

> "ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ"

ধ্যানযোগপরায়ণ 'নিত্যবৈরাগ্যবান্' ব্যক্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত অর্থাৎ একমাত্র বৈরাগ্যের সেবা দ্বারা, নিবৃত্তির সেবা দ্বারা—মনরাখা

সেবা হইলে হইবে না—অনন্যযোগদ্বারা যে ঐকান্তিক সেবা করা হয় সেই সেবা দ্বারা পরম বস্তু লাভ করিতে হইবে। ত্যাগের দ্বারা আনন্দকে লাভ করিতে হইবে। আধ্যাত্মিকভাবে ও ভাষায় বলিতে গেলে জীবকে অন্নময়কোষ ফেলিয়া দিতে হইবে, প্রাণময় কোষ ফেলিয়া দিতে হইবে, মনোময় কোষ ফেলিয়া দিতে হইবে, এমন কি, বিজ্ঞানময় কোষ ফেলিয়া দিতে হইবে, তবে জীব আনন্দময় কোষে বিরাজ করিতে পারিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংসারে সামান্য বস্তু লাভের জন্য কত চেষ্টা কত যত্ন কত সাধনার প্রয়োজন। সামান্য বিষয়ে এইরূপ নিয়ম হইলে পরমবস্তু সম্বন্ধে যে তাহার লক্ষগুণ চেষ্টা যত্ন সাধনা চাই তাহাতে সন্দেহ নাই। 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' করিলে শ্যামধন মিলিবে না—কুল ত্যাগ করিতে হইবে তবে শ্যামধন লাভ হইবে।

"নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপই ছার তনু করব বিনাশ" —এই ভাব হওয়া চাই। তাঁহাকে চাই আর কিছু চাই না—স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সংসার দূর হও—আমার পথে দাড়াইও না—আমি শ্যামধন লাভ করিবার জন্য যাইতেছি। মনের এইরূপ অবিচ্ছিন্নাগতি চাই, তৈল ধারার ন্যায় এইরূপ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চাই, তবে গোলক-ধামে আনন্দস্বরূপ শ্যামসাক্ষাৎকার হইবে। তাই ভগবান্ শেষ বলিয়াছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

সকল প্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত করিব। শোক করিও না। সদা সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে হইবে—

"এস নাথ! প্রাণবল্লভ! হৃদয়ের ধন! আমার হৃদয়রাসমন্দিরে এস ও দ্বাপরের প্রকট অভিনয় আবার সেইখানে আমাকে দেখাও,

তবেই আনন্দের অনুসন্ধান শেষ হইবে—আনন্দের পথিক আনন্দধামে উপস্থিত হইবে—এই ভবযন্ত্রণা দূর হইবে।

আমরা দেখিলাম, মানবের সুখান্বেষণের মূল—তাহার প্রকৃতিতে ও উহার পরিণতি তাহার স্বরূপলাভে। *

শ্রীবুদ্ধ ও তাঁহার শাক্যগণ।

(শ্রীগোকুলদাস দে, এম. এ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

কুমারের গৃহত্যাগের পরই কপিলবস্তুতে যে হাহাকার উঠিয়াছিল তাহা ছন্দকের শূন্য অশ্ব লইয়া পুনরাগমনে আরও মর্ম্মবিদারক হইয়া উঠিল। পুরবাসীরা ছন্দেকের নিকট সমস্ত জ্ঞাত হইয়া বলিলেন ;—

'ইদং পুরং তেন বিবর্জ্জিতং বনং বনং চ তত্তেন সমন্বিতং পুরং'

এই নগরী তাঁহার অবর্ত্তমানে অরণ্যের ন্যায় দেখাইতেছে আর সেই অরণ্য তাঁহাকে লাভ করিয়া নগর তুল্য শ্রীধারণ করিয়াছে। মহাপ্রজাবতী গোতমী ও যশোধরা ছন্দককে বহু তিরস্কার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে কন্থককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :— "কন্থক, তুমি বহু সমরে বজ্রসদৃশ অস্ত্র ও দুঃসহ শরাঘাত সহ্য করিয়া স্থির থাকিতে, আজ প্রভুর সামান্য কশাঘাতভয়ে তাঁহাকে রাজপুরী হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিলে? তোমাকে শত ধিক্!" ছন্দক বাষ্পবারিপূর্ণ নেত্রে সেই ক্রিয়া দেবপরিচালিত হইয়া সম্পন্ন হইয়াছে বুঝাইয়া তাঁহাদের কতকটা সান্ত্বনা দিলেন। রাজা তনয়ের অদর্শনে

---

* বোলপুর 'ব্রাহ্মীসংঘে' পঠিত।

দেবমন্দিরে হত্যা দিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ছন্দকের প্রত্যাগমন শুনিয়া প্রাসাদে আসিয়া কুমারকে দেখিতে না পাইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া শোক করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী ও কুলপুরোহিত কুমারকে অবিলম্বে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার সান্ত্বনা দিয়া সেই আশ্রমে যাত্রা করিলেন কিন্তু তপোবনে আসিয়া শুনিলেন কুমার ইতিপূর্ব্বেই তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। মন্ত্রী ও পুরোহিত লোকোপদিষ্ট মার্গে গমন করিতে করিতে কুমারের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এবং কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন পথের এক পার্শ্বে বৃক্ষমূলে রাজপুত্র মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় বসিয়া আছেন। সিদ্ধার্থ উভয়কে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিলে মন্ত্রী ও পুরোহিত প্রব্রজ্যার নিষ্প্রয়োজনত্ব ও গার্হস্থ্যধর্ম্মের আদর্শ সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝাইতে লাগিলেন; অপিচ বহুল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পরিশেষে বলিলেন, এইরূপে স্বজনবর্গকে শোকে দহ্যমান করিয়া তাঁহার কোনরূপে ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না। যদিও কুমার বৈরাগী হইয়াছেন তথাপি পুনরায় গৃহে গিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিলে তাঁহার কিছুমাত্র প্রত্যবায় বা গৌরবহানি হইবে না। তাঁহাদের সহিত তর্কে নিরুত্তর হইয়া কুমার দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন যে, তিনি স্বয়ং সকল তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; তাহা প্রাপ্ত না হইয়া কদাচ গৃহে ফিরিবেন না।

"তদেবমপ্যেব রবির্ম্মহীং পতেদপি স্থিরত্বং হিমবান্ গিরিস্ত্যজেৎ।
অদৃষ্টতত্ত্বো বিষয়োন্মুখেন্দ্রিয়ঃ শ্রয়েয় ন ত্বেব গৃহান্ পৃথগ্ জনঃ॥"

"সূর্য্য খসিয়া ভূতলে পতিত হইতে পারে, এই মহান্ হিমালয়ও বিচলিত হইতে পারে কিন্তু আমি ইতরসাধারণের ন্যায় তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া বিষয়াভিমুখী হইব না।" আরও বলিলেন—

"অহং বিশেয়ং জ্বলিতং হুতাশনং ন চাকৃতার্থঃ প্রবিশেয়মালয়ং।"
ইতি প্রতিজ্ঞাং স চকার গর্ব্বিতো যথেষ্টমুত্থায় চ নির্ম্মমো যযৌ॥

"বরং আমি প্রজ্জলিত হুতাসনে প্রবেশ করিব তথাপি অকৃতার্থ হইয়া গৃহে ফিরিব না।" এই গর্ব্বিত প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই মায়াবিরহিত রাজপুত্র উঠিয়া আপনার মনে প্রস্থান করিলেন। মন্ত্রী ও

পুরোহিতকে ভগ্নমনোরথ হইয়া কপিলবস্তুতে প্রত্যাগমন করিতে হইল।

অনন্তর সেই ভিক্ষুবেশী রাজপুত্র তরঙ্গভঙ্গময়ী গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া আড়ার কালামের নিকট গমন করিবার পথে রাজগৃহ নগরে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিলেন। সেই শিবতুল্য মহাপুরুষের আগমন শুনিয়া রাজগৃহবাসী সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। প্রজাবর্গের বিচলিত ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন এই সমগ্র পৃথিবী শাসনে সমর্থ রাজপুত্রের ভিক্ষুবেশ দর্শনে রাজগৃহের রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন। রাজা বিম্বিসার শাক্যরাজ শুদ্ধোদনপুত্র সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য জনৈক দূত নিযুক্ত করিলেন। দূত অনুসন্ধান করিয়া দেখিল কুমার ভিক্ষাপাত্রহস্তে পাণ্ডব-শৈলে গমন করিয়া ভিক্ষান্ন ভোজন করিতেছেন। সে ফিরিয়া আসিয়া তখনি মহারাজকে ঐ সংবাদ প্রদান করিল। মহারাজ দূতের সহিত সন্ন্যাসী-রাজপুত্রকে দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি আসিয়া আপনার পরিচয় দান করিলে সিদ্ধার্থ তাঁহাকে কুশল প্রশ্ন করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজা বলিলেন, "বৎস, তোমার বংশের সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আছে, তুমি আমার পুত্রস্থানীয়, সেইহেতু আমার স্নেহপূর্ণ বাক্যগুলি শ্রবণ কর। মহা সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি এরূপ ভিক্ষুবেশ গ্রহণ করিয়াছ কেন? যদি তোমার পিতার উপর কোন অভিমান হইয়া থাকে আমি এখনি তোমাকে আমার অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিতেছি, সুখে ভোগ কর। তাহাতে যদি সম্মত না হও যে রাজ্যের জন্য বিবাগী হইয়াছ, চল, আমার সৈন্যসহায়ে সেই রাজ্য উদ্ধার করিয়া লও। তুমি ত্রিলোকের উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ, এজন্য স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া এই কথাগুলি বলিতেছি—আমার নিজের বিস্ময়, ঐশ্বর্য্য বা ভোগের জন্য নহে। তোমার এই ভিক্ষুবেশ দেখিয়া আমার চক্ষু স্বতঃই অশ্রুপূর্ণ হইতেছে। পুণ্যের প্রয়োজন হইলে তুমি গৃহে গিয়া বহু যাগযজ্ঞ করিয়া স্বর্গে

ইন্দ্রতুল্য হইতে পারিবে।" বিম্বিসারের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজপুত্র তাঁহাকে বিষয়ভোগের ভয়াবহ পরিণামগুলি একে একে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন এবং শেষে বলিলেন—

"নাশীবিষেভ্যোঽপি তথা বিভেমি নৈবাশনিভ্যো গগনাচ্যুতেভ্যঃ।
ন পাবকেভ্যোঽনিল সংহিতেভ্যো যথা ভয়ং মে বিষয়েভ্য এভ্যঃ॥"

"অতি বিষধর সর্প, গগনচ্যুত বজ্রপতন বা বায়ুসংযুক্ত বহ্নিশিখাকেও আমি ভয় করি না কিন্তু এই সংসারজনক ভয়ানক বিষয়কে আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভয় হয়।"

তখন রাজা তাঁহার জ্বলন্ত বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া ক্ষান্ত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন যেন মুক্তিতত্ত্ব অবগত হইয়া প্রথমেই তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। ভগবান্‌ও তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন তৎপরে তিনি আড়ার কালামের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট আপনার মোক্ষলাভের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন, তিনিও সাগ্রহে তাঁহার প্রচারিত পন্থা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু আড়ার কালামের উপদেশে সিদ্ধার্থের তত্ত্ব-পিপাসা তৃপ্ত হইল না। এই তাপসপ্রদর্শিত পথ সম্পূর্ণ মুক্তির প্রকৃষ্ট পন্থা কিনা সন্দিহান হইয়া তিনি অন্য এক আচার্য্য রুদ্রকের আশ্রমে গমন করিলেন। সেখানেও উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া অবশেষে স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য গয়ার নিকট নৈরঞ্জনা তীরে কঠোর তপস্যারত হইলেন। এই সময় আরও পাঁচজন আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। ক্রমান্বয়ে ছয় বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যার পর তাহার অনাহারক্লিষ্ট দেহ কঙ্কালসার হইল। মস্তকঘূর্ণিত এবং মন সমাধিভূমি হইতে বারম্বার চ্যুত হইতে আরম্ভ করিল। তখন তিনি সেই কঠোর তপস্যার অসারতা উপলব্ধি করিয়া দেহকে যত্নে পুষ্ট রাখিতে মনস্থ করিলেন। স্নানান্তে আহার করিবেন ভাবিয়া সেই ক্ষীণদেহে ধীরে ধীরে নৈরঞ্জনায় নামিয়া অবগাহন করিয়া যেমন এক বৃক্ষশাখা অবলম্বনপূর্ব্বক তীরে উঠিলেন অমনি অত্যধিক দুর্ব্বলতায় সেই স্থলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময়

নন্দবালা নামে এক গোপকন্যা তাঁহাকে মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া তখনি দুগ্ধ আনিয়া তাঁহাকে পান করাইল। তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। এইরূপে সেই পুণ্যকর্ম্মা গোপবালার নিকট প্রতিদিন দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া তিনি দেহ পুষ্ট করিতে লাগিলেন, অচিরে তাহা পূর্ব্ববৎ লাবণ্যশালী ও বলবান্ হইল। সেই সময় উক্ত পাঁচ জন অনুচর তাঁহাকে ধর্ম্মত্যাগী বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। যখন তিনি মনকে আবার সবল করিয়া ধ্যানারূঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই সময় একদিন বৈশাখী পূর্ণিমায় সুজাতার দত্ত পায়সান্ন ভক্ষণ করিয়া পুনরায় সেই পবিত্র অশ্বত্থবৃক্ষমূলে সমাসীন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতঃ চলিষ্যতে ॥"

"এই আসনেই আমার শরীর শুষ্ক হউক, ত্বক্‌অস্থিমাংস বিলয় প্রাপ্ত হউক, বহুকল্পদুর্লভ বোধি প্রাপ্ত না হইয়া আমি আর এস্থান হইতে উঠিব না।" সিদ্ধার্থ পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। কিন্তু তপস্যার বিঘ্নকর মার আসিয়া তাঁহার মানসপটের উপর বিভীষিকাময় নানাচিত্র প্রতিফলিত করিতে লাগিল। কখন সুবেশা সুকেশা সঙ্গিনীগণের হাবভাবসংযুক্ত বিলাস নৃত্য, কখন ঝঞ্ঝাবাত শিলাপাত বজ্রাঘাতসংযুক্ত প্রলয় যামিনীর ভীষণ অভিনয়। কিন্তু যতিবরের ভ্রূভঙ্গপাতে মারের সমস্ত অত্যাচার মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল। অতঃপর কিছুক্ষণ ধ্যান করিতে করিতে নির্ম্মল বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রজ্যোতি বিমলিন করিয়া সিদ্ধার্থের হৃদয়ে বহুকল্পদুর্লভ পরমতত্ত্ব প্রতিভাত হইল। পুলকে রোমাঞ্চিত কলেবরে যোগীবর গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। তিনি আহারবিহাররহিত হইয়া সপ্তাহ কাল ধরিয়া সেইরূপ অবস্থায় জ্ঞানলাভের প্রথম আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

জীব তাঁহার এই সুগভীর তত্ত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে কিনা সন্দেহ করিয়া তিনি জগতের সমক্ষে তাহা প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময় ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহার সে সন্দেহ নিবাকরণ

করিলেন তখন তিনি দীক্ষাগুরু আড়ার কালাম এবং রুদ্রককে সেই জ্ঞান প্রথম প্রদান করিবেন ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর ধ্যানবলে সেই পূর্ব্ব পঞ্চ অনুচরকে বারাণসীতে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার উপলব্ধ জ্ঞান দান করিবার জন্য ঐ স্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি-মধ্যে পূর্ব্ববন্ধু ও পরিব্রাজক উপকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় উপক তাঁহার মুখে বহুদিনের পর হাস্য দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন—

"সব্বাভিবূ সব্ববিদূ'হং অস্মি সব্বেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো
সব্বঞ্জহো তণ্হক্খয়ে বিমুত্তো সয়ং অভিঞ্ঞায় কং উদ্দিসেয়্যংতি
ন মে আচরিয়ো অত্থি সদিসো মে ন বিজ্জতি
সদেবকস্মিং লোকস্মিং নত্থি মে পটিপুগ্গলো
ধম্মচক্কং পবত্তেতুং গচ্ছামি কাসিনং পুরং
অন্ধভূতস্মি লোকস্মিং আহঞ্ছি অমত দুন্দ্রভিংতি"

"সমস্ত বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া সকল বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক আমি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। সর্ব্বত্যাগে তৃষ্ণার উচ্ছেদ করিয়া আমি স্বয়ং জ্ঞান লাভ করিয়াছি, আর কাহারও নিকট আমার শিক্ষা করিবার কিছুই নাই। আমার আচার্য্যও নাই, আমার সদৃশও নাই, দেব ও মনুষ্য লোকে কেহই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। সম্প্রতি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত আমি বারাণসীধামে গমন করিতেছি। অন্ধকারাবৃত এই লোকে আমি অমৃতের দুন্দুভিনিনাদ আরম্ভ করিব।' উপক পরিহাস করিয়া প্রস্থান করিল। তিনি বারাণসীতে সেই পূর্ব্বপরিচিত পঞ্চতাপস-দিগের নিকট আপনার ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিলেন। ইঁহারাই তাঁহার প্রথম শিষ্য। তৎপরে বারাণসী হইতে মগধে আসিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত রাজা বিম্বিসারকে দীক্ষিত করিলেন। পথিমধ্যে গয়াতে আরও বহু শিষ্য হইল এবং ক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এক্ষণে তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর। এখন হইতে ক্রমান্বয়ে ৪৫ বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত

পরিশ্রমে তিনি বুদ্ধ নাম গ্রহণপূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র 'বহুজন-হিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অথায় হিতায় সুখায় দেব-মনুষ্যাণাং' বিচরণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন ও শিষ্য-বর্গকে সেইরূপ অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন।

বুদ্ধের শিষ্যগণ সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে সকল অবস্থার ব্যক্তি আসিয়া একত্রিত হইতেন। ব্রাহ্মণ হইতে অস্পৃশ্য চণ্ডাল, ঐশ্বর্য্যশালী রাজা হইতে দীন ভিক্ষুক, নিষ্কলঙ্ক বৈরাগ্যবান্ কুমার ব্রহ্মচারী হইতে ক্রূর নরঘাতক দস্যু পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া একমাত্র শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের সকলের পরিচয় দান করা অসম্ভব। তবে আনন্দ, সারিপুত্র, মোগ্‌গলায়ন, মহাকাশ্যপ, অনুরুদ্ধ, উপালি এই কয়জন তাঁহার প্রায় নিকটে থাকিতেন। তাঁহার অসংখ্য গৃহী ভক্তের ভিতর মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, অবন্তীরাজ প্রদ্যোত, কৌশাম্বীরাজ উদয়ন, শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডক, ধাম্মিকা বিশাখা ও রাজ্ঞী মল্লিকার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সকলেই ভগবানের জন্য অর্থে এবং সামর্থ্যে বহু ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন। মহারাজ বিম্বিসারের অতুলনীয় চিকিৎসক ভারতের অদ্বিতীয় ভেষজাচার্য্য জীবক ভগবান্ বুদ্ধের ও সঙ্ঘের চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত চিকিৎসার একটী উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। একবার ভগবান্ অসুস্থ হওয়ায় তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বিরেচক সেবন করাইবার প্রয়োজন হয়, অতি সুকুমারকান্তি তথাগতকে সাধারণ বিরেচক প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইয়া জীবক তিনটী পদ্ম সংগ্রহপূর্ব্বক তন্মধ্যে কোন ভেষজের সূক্ষ্মাংশ প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিলেন। ভগবানের নিকট আসিয়া তিনি একটী পদ্ম তাঁহার হস্তে দিলেন। ভগবান্‌ও সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া ঘ্রাণ লইলেন। তখন জীবক বলিলেন, 'ভগবন্ আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে, ইহার ঘ্রাণই বিরেচকের কার্য্য করিবে। প্রয়োজন হইলে আরও দুইটী পদ্ম রহিল তাহা ব্যবহার

করিবেন।' বিরেচকের কার্য্য সিদ্ধ হইলে ভগবান্ অচিরে সুস্থ হইয়াছিলেন।

প্রথম আমরা সিদ্ধার্থকে স্বজনমণ্ডলীর উপর বড়ই বীতশ্রদ্ধ দেখিয়াছি কিন্তু তাঁহার কপিলবস্তু ও শাক্যদিগের উপর কি প্রগাঢ় স্নেহ ছিল, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার পর তিনি তাঁহাদিগের জন্য কি করিয়াছিলেন অতঃপর তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। ভগবানের অদ্ভুত শক্তিপ্রভাবে মন্ত্রী ও পুরোহিত ফিরিয়া যাইবার পর রাজা শুদ্ধোদন কুমারের অপূর্ব্ব বৈরাগ্য ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। তখন তাঁহাদের ধারণা ছিল—

"বীরো হবে সত্তযুগং পুনেতি
যস্মিং কুলে জায়তি ভূরিপঞ্ঞো"

"যে বংশে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে বংশের চতুর্দ্দশপুরুষ পবিত্র হন।" রাজা যখন এই ধারণায় দৃঢ়চিত্ত হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন এবং কুমার কঠোর তপশ্চরণে নিরত, সেই সময় কোন দেবতা শুদ্ধোদনকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে কতকগুলি অস্থি দেখাইয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনার পুত্র আর জীবিত নাই, এই দেখুন তাঁহার ভস্মাবশিষ্ট অস্থি সকল আনিয়াছি।" দৃঢ়বিশ্বাসী পিতা উত্তর করিলেন, "যতদিন না আমার পুত্রের সিদ্ধিলাভ হয় ততদিন কোন শক্তিই তাহাকে নিহত করিতে পারিবে না। ইহা আপনার পরিহাস মাত্র।" এই কথায় দেবতা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কুমারের কঠোর বৈরাগ্য ও তপস্যার কথা শুনিয়া রাজপুরবাসিগণ অল্পবিস্তর সান্ত্বনা লাভ করিলেন, এমন কি, পতিবিরহবিধুরা সহধর্ম্মিণী যশোধরা স্বামীর তীব্র বৈরাগ্য স্মরণ করিয়া সন্ন্যাসিনীর ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে শুদ্ধোদন যখন সংবাদ পাইলেন তাঁহার পুত্র বুদ্ধ নাম ধারণ করিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কাশীধামে প্রথম ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তখন আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহারই পূর্ব্ব কথানুযায়ী

তাঁহাকে গৃহে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলে সেই ব্যক্তি তথাগতের নিকট আসিবামাত্র রাজাদেশ বিস্মৃত হইয়া ভিক্ষু হইল এবং গৃহে ফিরিবার নামগন্ধও করিল না! রাজা দ্বিতীয় লোক পাঠাইলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিরও ঐরূপ হইল! অতঃপর রাজা চিন্তিত হইয়া প্রধান মন্ত্রী উদায়ীকে পাঠাইলেন। তখন ভগবান্ মহারাজ বিম্বিসার-প্রদত্ত মগধের বেলুবনে অবস্থান করিতেছেন। উদায়ীও আসিয়া ভিক্ষু হইলেন, কিন্তু তিনি আপনার উদ্দেশ্য ভুলিলেন না। উপযুক্ত অবসর লক্ষ্য করিয়া বসন্তের প্রারম্ভেই তিনি তথাগতকে বলিলেন, "ভগবন্, এই মধুর বসন্তে আশান্বিতদিগের আশা পূর্ণ হইবার সময়। আমার আশাও এক্ষণে পূর্ণ হউক। এইবার যেন শাকিয় ও কোলিয়গণ আপনাকে রোহিণী উত্তীর্ণ হইতে দেখিতে পায়। আপনার পিতামাতা ও শাক্যেরা আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উদ্গ্রীব ও উৎসুক হইয়া রহিয়াছেন।" ভগবানের পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল। তিনি কপিলবস্তু ত্যাগ করিবার সময় বলিয়াছিলেন, 'সিদ্ধিলাভ করিয়া আবার আমি তোমায় দেখিতে আসিব।' অবিলম্বে তিনি কপিলবস্তু দর্শনে উদায়ীর সহিত যাত্রা করিলেন। জগতের শ্রেষ্ঠবস্তু অর্জ্জন করিয়া গৃহাগত প্রবাসীর ন্যায় আবার তিনি সকলের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সকলেই আসিলেন, কেবল যশোধরা আসেন নাই। পিতার নিকট যশোধরার কঠোর ব্রতাচরণের কথা শুনিয়া বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মেও যশোধরা ঐরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া 'চন্দকিন্নরী জাতক' বর্ণনা করিলেন। অতঃপর তিনি মাতা গোতমী ও পিতাকে শ্রোতাপত্তি অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রথম সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আবার আনন্দের হাট বসিল। কিন্তু বৈরাগ্যের আনন্দ যে সংসারসুখ হইতে ভিন্ন তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহাকে মাতা, পিতা ও কপিলবস্তুবাসীর সেই উদ্দাম আনন্দে কিঞ্চিৎ বাধা প্রদান করিতে হইল। পরদিন শুদ্ধোদন দেখিলেন কুমার ভিক্ষাপাত্রহস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। তিনি যেন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন; কুমারকে বলিলেন, "পুত্র,একি করিতেছ?

ভিক্ষা করিতে সঙ্কোচ বোধ হইতেছে না? আমি কি সকলের আহার যোগাইতে পারি না?" বুদ্ধ বলিলেন, "মহারাজ ইহাই আমার বংশের ধর্ম্ম, আমি সেই ধর্ম্ম পালন করিতেছি মাত্র।" শুদ্ধোদন কহিলেন, "তোমার পবিত্র ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম হইয়াছে। এই বংশের কেহই কখন ভিক্ষা করেন নাই।" বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "আপনার ইক্ষ্বাকু বংশে জন্ম সন্দেহ নাই কিন্তু আমার ত তাহাতে জন্ম নহে, আমি বুদ্ধবংশে জন্মিয়াছি। আমার পূর্ব্বগামী বুদ্ধেরা সকলেই ভিক্ষা করিয়াছিলেন, আমিও তাহাই করিতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি দুইটী গাথা দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মে পিতার চিত্ত নিবদ্ধ করিলেন—

"উত্তিট্‌ঠে ন প্পমজ্জেয়্য ধম্মং সুচরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ॥
ধম্মং চরে সুচরিতং ন নং দুচ্চরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখংসেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ॥"

"সর্ব্বদাই অপ্রমত্ত ও সংযত থাকিয়া সুচারুরূপে ধর্ম্মাচরণ করিবে এবং ধর্ম্মপালন করিতে হইলে আগ্রহের সহিত করিতে হইবে, অলসভাবে করিলে কোন ফল হইবে না। কারণ ধর্ম্মাচারী ইহলোক ও পরলোকে মহা সুখে অবস্থান করেন।" অতঃপর যশোধরাকে দর্শন করিবার জন্য তিনি স্বয়ং তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘকাল পরে প্রিয়তমমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যশোধরা তাঁহার চরণতলে নিপতিতা হইলেন। ভগবান্ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে তাঁহাকে আশ্বস্তা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিবার কালে যশোধরার ইঙ্গিতে পুত্র রাহুল আসিয়া বলিল, "হে শ্রমণ তোমার ছায়া অতীব সুখকর; আমি তোমার দায়াদ, আমায় তোমার সম্পত্তি প্রদান কর।" বুদ্ধদেব পুত্রকে বিহারে লইয়া গিয়া দীক্ষাদানে পরমসম্পত্তি প্রদান করিলেন। পরদিন তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুমার নন্দের বিবাহ ও অভিষেক উৎসব। কিন্তু ভগবান্ তাহা বন্ধ করিয়া নন্দকেও বিহারে লইয়া গিয়া দীক্ষা দিলেন। বৃদ্ধ পিতা তদ্দর্শনে যারপরনাই দুঃখিত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন যেন অতঃপর সিদ্ধার্থ মাতাপিতার অমতে সন্তানকে

দীক্ষিত না করেন। ভগবান্‌ও তাহা রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহার পর কপিলবস্তু হইতে ফিরিবার পথে অনোমা নদীতীরে 'অনুপিয়' নামক স্থানে বিশ্রামকালে বুদ্ধদেবের খুল্লতাতপুত্র আনন্দ, অনুরুদ্ধ, তাঁহার শ্যালক দেবদত্ত এবং নাপিত উপালি তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করেন।

কালক্রমে সমগ্র শাক্যজাতি শাক্য এবং কোলিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, উভয়ের মধ্যেই পরস্পর বিবাহাদি সম্পন্ন হইত। তথাগতের মাতা ও স্ত্রী এই কোলিয়বংশীয়া ছিলেন। উপরোক্ত ঘটনার চারি বৎসর পরে কপিলবস্তুতে দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় রোহিণীর জল লইয়া শাক্য ও কোলিয়দিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ হইয়া যুদ্ধের উপক্রম হইল। যখন যুদ্ধ হয় হয় তখন ভগবান্‌ শ্রাবস্তী হইতে সহসা আগমন করিয়া সেই বিবাদ শান্ত করিয়া দিলেন। শাক্য ও কোলিয়েরা তাঁহার অপার করুণা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইল এবং তাঁহার সেবার জন্য আপনাদিগের মধ্য হইতে ৫০০ শাক্য ও কোলিয় কুমারকে তাঁহার অনুচর করিয়া দিল। ভগবান্‌ সেই ৫০০ কুমারের শিক্ষার জন্য তাহাদিগকে হিমালয়ের সুগভীর মহান্‌ দৃশ্যসকল দেখাইতে লইয়া গেলেন।

পর বৎসর পিতার অন্তিম সময়ে বুদ্ধদেব পুনরায় কপিলবস্তুতে আসিয়া পিতাকে অর্হত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং মৃত্যুর পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া ও জ্ঞাতিবর্গকে সান্ত্বনা দিয়া বৈশালির মহাবন বিহারে চলিয়া আসিলেন।

এই স্থানে তাঁহার ধর্ম্ম ও সংঘের যুগান্তরকারী একটী বিশেষ ঘটনা ঘটে। এতদিন তিনি স্ত্রীলোককে সংঘে গ্রহণ করেন নাই। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর প্রজাবতী গোতমী ও যশোধরা প্রমুখ পূর্ব্বপ্রব্রাজিত পঞ্চশত শাক্য ও কোলিয় রাজকুমারদিগের পত্নীগণ মস্তকমুণ্ডন ও পীতবস্ত্রধারণ করিয়া তথাগতের নিকট প্রব্রজ্যা ভিক্ষা করিলেন। তিনি দুইবার তাঁহাদের প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু তৃতীয়বার আনন্দের অনুরোধে তাঁহাদিগকে ভিক্ষুণী-ব্রতে

দীক্ষিত করিলেন। এই নারীসংঘের জন্য অতি কঠোর নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হইল। তাঁহারা ঐ সকল কঠোর নিয়মাবলী পালনে স্বীকৃত হইলেন এবং শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডকের সুবৃহৎ জেতবনবিহারে গমন করিয়া স্বতন্ত্র ভিক্ষুণী বিভাগে বাস করিতে লাগিলেন।

স্ত্রীলোককে প্রব্রজ্যা দিয়া তথাগত আনন্দকে বলিয়াছিলেন, "আনন্দ, আমার ধর্ম্ম যদি ১০০০ বৎসর সদ্‌ভাবে থাকিত অদ্য স্ত্রীজাতিকে প্রব্রজ্যা দেওয়ায় তাহা মাত্র ৫০০ বৎসর কাল স্থায়ী হইবে।"

(ক্রমশঃ)

পবিত্রতা।*

(স্বামী পরমানন্দ)

পবিত্রতাই প্রকৃত শক্তি, পবিত্রতাই প্রকৃত আনন্দ ও মানসিক তেজ। এই উপায়ে শক্তিসঞ্চয় কর। এই পবিত্রতার বিষয় বিস্মৃত হইও না। অমর হইতে পারিবে। পবিত্রতাই তোমাকে ভীতিশূন্য ও সদানন্দ করিবে। শক্তি ও সাহস অবলম্বন কর, তোমার নিকট যাহাই আসুক উহাকে গ্রাহ্য করিও না। পবিত্রতা দ্বারা সমস্ত দুর্ব্বলতাকে জয় কর। ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস রাখিয়া সাহসের সহিত অগ্রসর হও। তিনিই তোমায় সমস্ত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন।

এই পবিত্রতার সহিত যাহা কিছু করিবে তাহাই জ্বলন্ত হইয়া উঠিবে। সুতরাং কোন কিছুই ভয় করিবার নাই। ইহা মূল তথ্য। ঈশ্বরের কৃপায় মানব এই রহস্য বুঝিতে পারে। তাঁহার মহান্ শক্তি ও তাঁহার বিকাশ কেবল পবিত্র হৃদয়েই প্রতিভাত হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বদা তোমাদিগকে ঠিক পথেই পরিচালিত করিবেন। কিন্তু বিক্রমের সহিত কার্য্য কর, দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিও না।

* বোষ্টন বেদান্তপ্রচার কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত স্বামী পরমানন্দ লিখিত 'Path of Devotion' নামক পুস্তক হইতে অনূদিত।

এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়। সম্মুখে পথ রহিয়াছে, লক্ষ্যে পৌঁছিতেই হইবে। নিদ্রা বা বিশ্রাম চাহিও না। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"। যদি তোমার পবিত্র হৃদয়াকাশ কোন সময়ে মেঘাচ্ছন্ন হয় হতাশ হইও না। মনে রাখিও ভীষণ ঝড়ের পরই প্রকৃতিদেবী শান্তভাব ধারণ করেন। চঞ্চলতার পরেই শান্তি বিদ্যমান। একটী অপরটীকে অনুসরণ করিবে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। দুঃখকষ্ট ব্যতীত আমরা সুখ কি তাহা ধারণা করিতে পারি না। আমাদের জীবনে যাহাই ঘটুক না কেন তাহা আমাদিগকে কোন এক মহত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য হইয়াছে ইহা মনে রাখিতে হইবে। শারীরিক শক্তির বিশেষ চালনার পরেই যে তাহার ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা বোধ হইবে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। এই মুহূর্ত্তগুলিই ভক্তের পরীক্ষার স্থল। যিনি এই উভয় অবস্থাতেই বিশ্বাস ও পবিত্রতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্থির থাকিতে পারেন তিনিই প্রকৃত চরিত্রবান্। "অপরে বালাঃ"।

যখন সমস্তই সানুকূল তখন সকলেই আনন্দানুভব করিতে পারে। কিন্তু যখন সমস্তই মন্দ ও প্রতিকূল তখন যিনি স্থির অবিচলিত থাকিতে পারেন তিনিই প্রকৃত ভক্ত। পবিত্রতা ও বিশ্বাসের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হও, শক্তি আপনা হইতেই আসিবে, পথ পরিষ্কৃত হইবে। প্রকৃত ভক্ত কখনও নিশ্চিন্ত থাকেন না, সর্ব্বদা একটু নিঃস্বার্থ হইবার জন্য চেষ্টা করেন, একটু পবিত্র হইতে চান, কারণ এই পবিত্রতাই চরিত্রের ভিত্তি। স্বার্থশূন্য হওয়া বাস্তবিক কি মহান্! মুক্তির উপায়স্বরূপ এই পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা লাভ করিবার জন্য একান্তমনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, অপর সবই বন্ধন-মূলক।

নিঃস্বার্থপরতার সহিত পবিত্রতার নিত্য সম্বন্ধ। একটী অপরটীর অনুসরণ করে। স্বার্থশূন্য কর্ম্মের দ্বারাই হৃদয় পবিত্র হয় এবং সেই পবিত্র হৃদয়ে একমাত্র প্রেমই বিদ্যমান থাকে। অন্তশূন্য অনন্ত ভালবাসা বা প্রেম স্রোতের ন্যায় আসিয়া অন্য সমস্ত বৃত্তিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সাংসারিক কোন কিছুই সেই হৃদয়ে স্থান পায় না।

শোক, দুঃখ, কষ্ট, হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা যাহা কিছু জাগতিক তাহা সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া যায়। ইহাকেই আমি "ঐশ্বরিক প্রেম বলি।" ইহাকেই একমাত্র 'ধর্ম্ম' আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে।

এই মহান্ প্রেমে নিমগ্ন হও, অপর সমস্ত ভুলিয়া যাও। অপরের কথা গ্রাহ্য করিও না। ঈশ্বরলাভের জন্য যত্নশীল হও। বহির্জগৎ তোমার নিকট হইতে অন্তর্হিত হউক। সেই প্রেমে পাগল হইয়া যাও। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন--"সকলেই পাগল—কেহ ধনের জন্য, কেহ মানের জন্য, কেহ বা যশের জন্য ইত্যাদি।" তুমি আদর্শের জন্য পাগল হও। দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হও। ভয় কিসের—তোমার হৃদয় ভয়শূন্য হউক। নির্ভীক, আনন্দময় ও পবিত্র হও। জগৎ দেখুক, "তুমি ঈশ্বরের সন্তান।" মনে রাখিও অনন্ত শক্তি তোমার পশ্চাতে রহিয়াছে, সুতরাং সাহস অবলম্বন কর, যেন কোন কিছু তোমায় বিচলিত করিতে না পারে। যাহাই ঘটুক না কেন তুমি সর্ব্বদা অবিচলিত থাক। পবিত্র হৃদয়ে কোন প্রকার দুঃখ বা উদ্বেগ থাকিতে পারে না। মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় তোমার মুখ সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকুক।

হৃদয় যখন একান্ত পবিত্র হয় তখন কেবল অনুরাগ জাগরিত হইয়া থাকে। এই প্রেমানুরাগই মানবকে নিঃস্বার্থ করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ মায়ের পুত্রের প্রতি স্নেহের কথা ধর। তিনি সর্ব্বদা নিজের চিন্তা ভুলিয়া একমাত্র পুত্রের মঙ্গলসাধন করিতে ব্যস্ত। পুত্রের জন্য মা যে কোন বিপদে সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত। এইরূপে আদর্শের জন্য আপনার স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিলে তবে প্রকৃত ভক্ত হইতে পারা যায়। ইহাই ভক্তির প্রকৃত অর্থ।

এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। শরীর যাক্ আর থাক্ সে দিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না। অপরে কি বলিবে তাহা গ্রাহ্য করা উচিত নয়। আমরা আমাদের আদর্শ— ঈশ্বরের— প্রভুর সেবা করিবই।

একান্তমনে তাঁহার সেবা করিতে করিতে শান্তি ও সুখ আসিবে,

অপর কিছুতে শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ নহে। নাম, যশ, অতুল ঐশ্বর্য্য কোন কিছুই শান্তি প্রদান করিতে পারে না। তবে এস, আমরা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া দৃঢ়তার সহিত ভগবানের সেবায় আমাদের প্রাণ মন নিয়োগ করি। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

পবিত্রতা, বীর্য্য, নির্ভীকতা এ সমস্ত ধর্ম্ম হইতেই পাওয়া যায়। ধর্ম্ম অনুভবের জিনিস এবং চরিত্রগঠন করাই ধর্ম্ম। কেবল কোন নির্দ্দিষ্ট সমাজ বা ধর্ম্মসংঘে যোগদান করিলেই সুখী হওয়া যায় না। প্রত্যেক দ্রব্য ঠিক ঠিক ভাবে দেখিতে হইবে। কাকে ভয়? ঈশ্বরই আমাদের স্নেহময়ী জননী। মা কি ছেলের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন? সত্যনিষ্ঠ হও, পবিত্রতা ও ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

পবিত্রতা-ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে ইন্দ্রিয়সংযম করিতে হইবে। তৎপরে ভগবানে মনস্থির রাখিতে হইবে। আত্মসংযম ব্যতীত সত্যের ক্ষণিক আলোক তোমাতে প্রকাশ হইলেও হইতে পারে কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না, শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়। অবিরত ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে করিতেই সত্যের আলোক প্রকাশিত হইবে। যে মন সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়ের অধীন হয় তাহার সমস্ত জ্ঞান নষ্ট হয়। আমাদের মন যতদিন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে রত থাকে ততদিন ইহা চঞ্চল ও অসুখী কিন্তু যখন মন বুঝিতে পারে বাহিরের দ্রব্য হইতেই এই চঞ্চলতার সৃষ্টি, আর ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত হইলেই প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়, তখন উহা বাহিরের দ্রব্য হইতে সরিয়া আসে এবং হৃদয় ক্রমে ক্রমে পবিত্র হইতে থাকে।

হৃদয় একান্ত পবিত্র হইলেই আমরা আমাদের স্বরূপ বা ঈশ্বর দর্শন করিতে পারি। আমাদের হৃদয় দর্পণস্বরূপ। যতদিন এই দর্পণ মলাবৃত থাকে ততদিন সর্ব্বভূতস্থ আত্মার ছায়া ইহাতে পড়িতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে হৃদয় পবিত্র করিতেই হইবে।

হৃদয় পবিত্র করাই সর্ব্বধর্ম্মের সার। বাহ্য পরিচ্ছন্নতা অন্তঃশুদ্ধি করিতে পারে না। সুতরাং বাহ্য আড়ম্বর করিও না। মনে রাখিও

তুমি স্বভাবতঃই পবিত্র ও অপাপবিদ্ধ। ঈশ্বরের নামে সমস্তই পবিত্র হয়। অকপট ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত বারংবার ঈশ্বরের নাম লও। সমস্ত অপবিত্রতা দূরে পলাইবে। মনকে সর্ব্বদা শুদ্ধ চিন্তায় নিয়োজিত কর, সৎসঙ্গ কর, পবিত্রতায় হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে।

সর্ব্বোপরি আত্মাভিমান ত্যাগ কর। ইহা অপেক্ষা ঘৃণিত অপবিত্রতা আর কিছু নাই। হৃদয়কে তমসাচ্ছন্ন ও স্বার্থপর করিতে এমন আর কিছুই নাই। প্রকৃত ভক্ত হইতে হইলে অজ্ঞান ও বন্ধনমূলক 'বজ্জাৎ আমি'কে পরিত্যাগ করিতে হইবে। 'বজ্জাৎ আমি' ত্যাগ হইলেই 'দাস আমি' প্রকাশ পাইবে—সারাজগৎ এই 'দাস আমি' পূর্ণ হইবে। আমিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। নিজের কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই ত্যাগ করা চাই। যদি নিঃস্বার্থ হইতে চাও, কোন কিছু করার জন্য প্রশংসা লাভের ইচ্ছা ত্যাগ কর। সমস্ত স্বার্থপূর্ণ ইচ্ছা ত্যাগ কর, তবেই গন্তব্য স্থানে যাইতে সক্ষম হইবে।

যদি নিঃস্বার্থভাবে ঈশ্বরের সেবা করিতে চাও, স্বচ্ছন্দে সানন্দে কাজ করিয়া যাও। ইহাই প্রকৃত কর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্ম দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। এইরূপ স্বার্থশূন্য হইয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে করিতেই সমস্ত বন্ধন দূর হয়। হৃদয় পবিত্র ও ধন্য হয়।

ভক্তি ও ভক্ত।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার)

ভক্তি কাহাকে বলে? সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণের নাম ভক্তি। কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টার নাম ভক্তি। শরীর দ্বারা সেবা, মন দ্বারা রূপাদি অবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান বা চিন্তা এবং বাক্য দ্বারা নিরন্তর গুণানুকীর্ত্তন করার নামই ভক্তি। যাহা কিছু করিব সকলই ভগবানের প্রীত্যর্থে—নিজের বলিয়া কিছু রাখিলে চলিবে না; ইহাই প্রকৃত ভক্তি। গীতায় শ্রীভগবান্ ভক্তের লক্ষণ বলিয়াছেন—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ (১২অঃ, ২ শ্লোক)

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমাতে মন নিবেশিত করিয়া সর্ব্বদা মৎপরায়ণ হইয়া পরমশ্রদ্ধাসহকারে যাঁহারা আমার আরাধনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম। (যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ আমাতে চিত্ত নিবেশিত করিয়া দিবারাত্র যাপন করেন; সেইহেতু তাঁহাদিগকে যুক্ততম বলাই উচিত)। পুনরায় বলিয়াছেন—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্॥"

(গীতা, ১২অঃ, ৬-৭ শ্লোক)

কিন্তু যাঁহারা আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যভক্তিযোগসহকারে ধ্যাননিরত হইয়া আমার আরাধনা করেন, হে পার্থ, আমাতে সমর্পিতচিত্ত সেই মহাত্মাদিগকে আমি অচিরাৎ মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি। এই শ্লোকে

দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিতে হইলে সমুদয় কর্ম্ম তাঁহাকে সমর্পণপূর্ব্বক অনন্যভক্তিযোগ অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তিসহকারে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। ব্যভিচারী শব্দে একাধিক ভজনশীল বুঝায়। অব্যভিচারিণী অর্থে একের অনুরাগী। সুতরাং অনন্যভক্তি করিতে হইলে ভক্তের আর কোন বিষয়ের অনুরাগ বা চিন্তা মনে স্থান দিবার অধিকার নাই। এতদর্থে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
(গীতা, ১৮ অঃ, ৬২ শ্লোক)

হে ভারত, সর্ব্বতোভাবে সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হও, (তাহা হইলে) তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে। এখানে বলিতেছেন "সর্ব্বভাবেন ভারত" অর্থাৎ মনোগত সমুদায় ভাব তাঁহাতে অর্পণ করিতে হইবে; নচেৎ আমি মুখে ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিব আর মন নানা বৈষয়িকভাবে পূর্ণ থাকিবে, এরূপ হইলে আর "অব্যভিচারিণী" শুদ্ধা ভক্তি করা হইল না। সুতরাং প্রকৃত ভক্তের সংসারাসক্তি থাকিতে পারে না। যেহেতু হৃদয়ের অর্দ্ধেকটুকু ভগবানে ও অর্দ্ধেকটুকু সংসারে রাখিয়া বখ্‌রায় ভক্ত হওয়া যায় না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
(গীতা, ১৮ অঃ, ৬৫-৬৬ শ্লোক)

তুমি মদেকচিত্ত, মদেকভক্ত ও একমাত্র আমারই উপাসক হও; একমাত্র আমাকেই নমস্কার কর, (তাহা হইলে নিশ্চয়ই) আমাকে পাইবে। তুমি আমার প্রিয়, তাই তোমাকে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, সমুদয় ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র

আমাকে আশ্রয় কর; শোক করিও না; আমিই তোমায় সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিব। এই দুইটি শ্লোকের ভাবার্থ এই যে সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র শ্রীভগবান্‌কেই আশ্রয় করিতে হইবে অর্থাৎ ভগবান্‌কে প্রীত করিবার চেষ্টা ব্যতীত ভক্তের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। সর্ব্বদাই তাঁহার ইচ্ছাধীনভাবে চলিতে হইবে, তাহা হইলে নিজের কর্তৃত্বাভিমানটি চলিয়া যাইবে; সুতরাং "আমি" "আমার" ভাবটি আর থাকিবে না। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার পিতা, আমার মাতা ইত্যাদি আর বলিতে পারিবে না। আমার বলিয়া কিছুমাত্র হাতে রাখিলে আর "সর্ব্বধর্ম্ম" পরিত্যাগ করা হইল না এবং সমুদয় ধর্ম্মাধর্ম্ম ভগবানে সমর্পিত না হইলেও প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না।

প্রকৃত ভক্তের কিরূপ আত্মত্যাগ ও নির্ভরতা আবশ্যক তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোন সময়ে এক ব্যক্তি এক মহাপুরুষের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করেন এবং উক্ত মহাপুরুষও ঐ ব্যক্তিকে সজ্জনবোধে দীক্ষা দানে প্রতিশ্রুত হন। একদা ঐ শিষ্য একস্থানে নিদ্রা যাইতেছিলেন এবং গুরুও তৎসন্নিহিত স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক বিষধর সর্প তথায় বেগে উপস্থিত হইয়া সেই ব্যক্তিকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে মহাপুরুষ সর্পকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে সর্প তুমি কি নিমিত্ত এই নিদ্রিত ব্যক্তিকে আঘাত করিতে উদ্যোগ করিতেছ? ও ব্যক্তি আমার আশ্রিত সুতরাং আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।" সর্প সেই সাধুপুরুষের তেজঃপুঞ্জ-মূর্ত্তি ও গম্ভীর আদেশে ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া উদ্যত তুণ্ড ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিল—'হে মহাভাগ, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু ঐ ব্যক্তি গতজন্মে আমার রক্তপান করিয়াছিল, একারণ কর্ম্মবশবর্ত্তী হইয়া প্রাক্তনবশে আমিও উহার প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছি কিন্তু আপনি নিবারণ করিলে আমি অক্ষম হইব সুতরাং কর্ম্মফল ব্যর্থ হইবে। অতএব আপনি বিচারপূর্ব্বক যেরূপ আদেশ করিবেন আমি অবনতমস্তকে তাহাই পালন করিব।'

"সর্পের এতাদৃশ বিনীত বচনে পরিতুষ্ট হইয়া মহাপুরুষ বলিলেন—'হে সর্প তোমার বাক্যে বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম, আমি তোমাকে ইহার রক্তদান করিব, অতএব তুমি বল উহার দেহের কোন্ স্থানের রক্ত তোমার অভীপ্সিত।' সর্প কহিল—'হে মহাত্মন্ আমি ঐ ব্যক্তির কণ্ঠরক্ত পান করিতে বাসনা করিয়াছি, অতএব আমাকে ঐ স্থানের রক্ত দান করুন।" গুরুদেব তখন শিষ্যের বক্ষদেশে আরোহণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা উহার কণ্ঠের স্থানবিশেষ কিঞ্চিৎ ক্ষত করিয়া রক্ত গ্রহণপূর্ব্বক সর্পকে প্রদান করিলেন। সর্প তখন হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল। তিনি যখন ভক্তের বক্ষে আরোহণ করিয়া গলদেশে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, তিনি একবারমাত্র চাহিয়াই পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। অতঃপর গুরুও শিষ্যকে কিছু বলিলেন না এবং শিষ্যও গুরুদেবকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন না—পূর্ব্ববৎ পরম ভক্তিসহকারে সেবাদি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে মহাপুরুষ চিন্তা করিলেন আমি এই ব্যক্তির গলায় ছুরি দিতেছিলাম দেখিয়াও এ আমাকে এ পর্য্যন্ত কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না এবং শ্রদ্ধাভক্তি ও সেবারও ত কোন ত্রুটি দেখিতেছি না। ইহার অর্থ কি? এইরূপ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তিনি এক দিন শিষ্যকে একান্তে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"বৎস, সে দিন যে আমি তোমার গলায় ছুরিকা আঘাত করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি জ্ঞাত আছ?" শিষ্য জোড়হস্তে কহিলেন,—হাঁ প্রভু, আমি তাহা দেখিয়াছি।" গুরু কহিলেন,—"তবে আমাকে সে বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করিলে না কেন?" শিষ্য তখন গলদশ্রুলোচনে ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন,—"হে জগদারাধ্য প্রভু, এই অকিঞ্চিৎকর দেহ, মন ও প্রাণ সকলি ঐ শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়াছি। আমার নিজস্ব বলিবার আর কিছুই নাই। যখন দেখিলাম যে আপনি আমার বুকে বসিয়া গলায় ছুরি দিতেছেন তখন ভাবিলাম এ দেহ ত প্রভুকে দান করিয়াছি তবে উঁহার বস্তু উনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, তাহাতে

আমার ত বলিবার কোনও অধিকার নাই। অতএব আমি আর আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলাম না। আরও আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আপনি পরম মঙ্গলময়, যাহা কিছু করিবেন তাহাতেই আমার মঙ্গল হইবে, সুতরাং হেতু অন্বেষণে আমার আর প্রবৃত্তি হইল না।" এই উক্তি শ্রবণ করিয়া মহাপুরুষ শিষ্যকে বক্ষে ধরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, —"বৎস, তুমি ধন্য, তোমার গুরু হইয়া আজ আমিও ধন্য হইলাম। ধন্য তোমার গুরুভক্তি ও বিশ্বাস। এই ভক্তি ও নির্ভরের বলেই আমি তোমার প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি, নতুবা আমার মাহাত্ম্য কিছুই নাই। ইহা কেবল তোমারই ঐকান্তিক ভক্তির ফল মাত্র।" ইহাকেই পরাভক্তি কহে। এইরূপ নিষ্ঠার প্রভাবেই ভগবান্ প্রহ্লাদকে বারংবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ভক্তি সাধনের ধন। বিনা সাধনায় ভক্ত হওয়া যায় না। সাধনা কর্ম্মসাপেক্ষ। কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধিদ্বারে জ্ঞান এবং জ্ঞানে ভক্তিলাভ হয়। এতদর্থে শ্রীমদ্ভাগবৎ বলিয়াছেন—

"যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতং॥
কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ॥"

(১ম স্কঃ, ৫ অঃ, ৩৫-৩৬ শ্লোক)

ভক্তিমিশ্র জ্ঞানই মোক্ষসাধক এবং সেই জ্ঞানও ভগবৎতুষ্টিজনক কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত হইয়া থাকে। তদীয় লীলা ও লীলাসূচক নাম-সমূহ কীর্ত্তন, শ্রবণ ও মনে অনবরত ধ্যান করাই ভগবানের সন্তোষপ্রদ কর্ম্ম, যাহার বলে ধার্ম্মিকগণ ভক্তিপূর্ব্বক জ্ঞানলাভে সমর্থ হন।

আমরা সাধারণতঃ যাহাকে ভক্তি বলি প্রকৃতপক্ষে তাহা ভক্তি নহে। উহা শ্রদ্ধা মাত্র। ভগবানের লীলাশ্রবণে, তাঁহার রূপ, ঐশ্বর্য্য ও শক্তির আলোচনা করিতে করিতে শ্রদ্ধা জন্মে। শ্রদ্ধা প্রগাঢ় হইলে তরলভক্তি বা পরোক্ষজ্ঞান অর্থাৎ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা হয়। পরোক্ষজ্ঞান

হইতে 'রতি' জন্মে অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিবার বা পাইবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। রতি হইতে অপরোক্ষানুভূতি বা প্রকৃত জ্ঞানাঙ্কুর উপলব্ধি হয়। জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই পরাভক্তির উদয় হয়। পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি একই অবস্থা। শ্রীমদ্ভাগবৎ এই ভক্তিমিশ্র-জ্ঞানকেই মোক্ষ-সাধক বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ গীতাতেও বলিয়াছেন—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানংলব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥" (৪র্থ অঃ, ৪০ শ্লোক)

শ্রদ্ধাবান্, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন; তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অতি শীঘ্র পরমা শান্তি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হন।

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

(১)

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।

১৯।৫।১৬।

স্নেহভাজনেষু—

গত কল্য কৃ— এসেচে, তার মুখে তোমাদের বিষয় শুন্‌লাম। —ভাল ছেলে, তাকে তোমরা রাখ্‌তে পার, মহারাজ মত দিয়াছেন। * * *

—র বিষয় তোমার পত্রে পড়্‌লাম এবং —র মুখে শুন্‌লাম। লোক চালান অতি কঠিন ব্যাপার, বিশেষ শক্তিসম্পন্ন না হলে মুস্কিলে পড়্‌তে হয়, অভিমান অহঙ্কার এসে জোটে। কৌশল হচ্চে আমিত্ব ভুলে তুমিত্ব প্রতিষ্ঠা। "তুমি কর্ত্তা আমি অকর্ত্তা", "ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু"—এই সব প্রাণে প্রাণে ধারণা চাই।

ভিতরটা ভালবাসায় পূর্ণ কর্ত্তে হয়। যা কিছু করব সব ভালবাসায়। আমায় ঠাকুর ভালবাসায় কিনে নিয়েছেন—আমাদের সবাইকেই তাই। অন্তর্ব্বহিঃ ভালবাসা। গালাগাল-মন্দও ঐ ভালবাসার জন্য। নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। প্রভু আপনিই সব, গাল দিব কাকে? সবই যে তিনি—ধূলির একটু কমবেশ মাত্র। মঠে কোন অশান্তি বা অমঙ্গল হলে সাক্ষাৎ শিব স্বামিজী আমায় গালাগাল দিতেন, কত মন্দ বল্‌তেন কিন্তু সে ভালবাসার অন্ত নাই, পার নাই, সীমা নাই; তখন ভাব্‌তুম—কেন আমায় মন্দ বলেন, আমার কি দোষ? এখন দেখ্‌চি স্বামিজী ঠিকই বল্‌তেন, আমিই সকল দোষের মূল। এই দুষ্ট 'আমি'কে দূর করা চাই। নইলে নিস্তার নাই, কল্যাণ নাই। তারপর দেখ্‌চি আমার দোষগুলো অনেকে আপনা আপনি বেশ নকল কর্ত্তে শিখ্‌চে কিন্তু ভিতরটা দেখ্‌তে চেষ্টাই করে না। আর কর্ব্বেই বা কি! একটা দোষের পুঁটুলি বৈ আর কি আছে আমার ভিতর, তাই তোরাও ঐ রকম হচ্চিস্। যারা ঠাকুরের নাম কর্ব্বে তাদের জগৎ-জয়ী হতে হবে—আপনাকে প্রভুর পায়ে সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় কর্ত্তে হবে।

—আশ্রমে যদি কোন গোল বাধে জানিব সে সব তোমার ও আমার দোষ। সব অপরাধ 'আমার' স্বামিজীর এই মত। চাঁদ, তুমি ভাল হও, আরও ভাল হও। আপন আপন দোষগুলি শোধরাতে চেষ্টা কর। ব্যাকুল হয়ে ঠাকুরের কাছে কাঁদ, প্রার্থনা কর—'প্রভো দয়াকরে গাদগুলো ময়লামাটিগুলো উড়িয়ে পুড়িয়ে দাও', অন্য উপায় নাই। ওখানে যদি কোন অশান্তি আনয়ন কর সে দোষ তোমার জানবে। কি জন্য এ সাজ পরেছ মনে মনে সর্ব্বদা বিচার করিও। পাগলামি ছেড়ে দাও কিম্বা ভগবানের নামে পাগল হও। খুলে যাক্ তোমার দিব্যদৃষ্টি প্রভুর দয়ায়, ভালবেসে সকলকে কিনে ফেল। এই হচ্ছে জ্ঞান, এই হচ্ছে ভক্তি এই নবযুগের। তোমরা আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

(২)

রামকৃষ্ণমঠ,
বেলুড় পোঃ, হাওড়া,
১১।৭।১৬।

স্নেহভাজনেষু,

ধী— তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। * * * যতদিন না প্রভুর নামে আশ্রমটী পাকা রকমে বদ্ধমূল হয় ততদিন তোমার ঐ স্থানে থাকা উচিত, নতুবা বুঝিব তুমি অতি অসার, অপদার্থ, নিষ্ঠাহীন। দেখ, স্বার্থ, সুখ, সুবিধা ত্যাগ না কর্‌তে পাল্লে সেকি আবার মানুষ? ঠাকুরের নাম কর্‌বে, আবার স্বার্থপর হবে!—সে ভণ্ড, তার উন্নতি কোথায়? তার দেশ চিরকাল অন্ধকারে ডুবে থাক্‌বে, না, উন্নতির আলোক পাবে? তুমি খুব ধীর স্থির হয়ে, চিন্তা করে চল্‌বার চেষ্টা কর্‌বে। * * * তোমার কথা যে কত লোকের কাছে বলে বেড়াই। তোমায় খুব ভাল—খুব বড় হতেই হবে। আমরা ভাল আছি। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে এবং ওখানকার ভক্তদের সাদর সম্ভাষণাদি কহিবে। ইতি -

শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

(৩)

মঠ, বেলুড়।
২৬।৭।১৬।

পরম স্নেহাস্পদেষু—

তোমার অসুস্থ সংবাদে দুঃখিত হইলাম। * * * আমি মাঝে মাঝে গাই—

"যখন যেরূপে মা গো রাখিবে আমারে
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে,

বিভূতি বিভূষণ রতন মণি কাঞ্চন
তরুতলে বাস কিম্বা রাজসিংহাসন পরে।"

* * *

"আপনাতে আপনি থাক,
যেওনা মন কারো ঘরে,
যা চাবি তা বসে পাবি
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরমধন এই পরশমণি
যা চাবি তা দিতে পারে
(ও মন) কত মণি পড়ে আছে
চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

ঠাকুরকে ধরে পড়ে থাক। কেবল ব্যারাম ব্যাধির চিন্তা কেন? জান্‌বে—সব সময় জান্‌বে—সব অবস্থায় জান্‌বে—আমি প্রভুর, প্রভু আমার নিত্যধন, পরমবস্তু—সর্ব্ব সম্পদের সকল ঐশ্বর্য্যের আস্পদ। 'নাহং নাহং' সর্ব্বদা কর্‌বে। যত পার ভগবানের নাম কল্লে আর ভূতের ভয় থাক্‌বে না। আমরা যে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের বাচ্ছা, একথা স্মরণ রাখ্‌বে সব সময়।

মহারাজ বাঙ্গালোর গেছেন। আর সব ভাল, সকল ভক্তদের আমার অন্তরের স্নেহাশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানাবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

সমালোচনা।

দরিদ্র-নারায়ণ—শ্রীমধুসূদন আচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ বিরচিত। প্রকাশক শ্রীহীরালাল সাহা, বালিয়াটী (ঢাকা)। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১২০ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৶০ আনা।

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দুইটী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন—একটী ত্যাগ, অপরটী Service বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবসেবা। বর্ত্তমান লেখক তাঁহার সেই সেবা-শব্দকে অবলম্বন করিয়া পাঁচটী প্রবন্ধে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। যথা, দরিদ্র নারায়ণ, প্রাচ্যধর্ম্ম ও দরিদ্রনারায়ণসেবা, পাশ্চাত্য সেবাধর্ম্ম, বৈষ্ণবসম্প্রদায় ও দরিদ্রসেবা, দরিদ্র-নারায়ণসেবার প্রণালী।

আমরা পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। লেখক বর্ত্তমান যুগপ্রয়োজন বুঝিয়া যে নাটক নভেল ছাড়িয়া এরূপ সদুদ্দেশ্যে তাঁহার শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন তাহাতে তিনি দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি গীতা, উপনিষদ্, বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রভৃতি নানা হিন্দুশাস্ত্র হইতে সেবাধর্ম্মমূলক বহুতর শ্লোক উদ্ধৃত করতঃ শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতারপুরুষগণের জীবনালোকে তাহাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া পাঠকের মনে সেবার ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচ্য সভ্যতার ঐকান্তিক স্বাধিকারপ্রসার ও ভোগমূলকতা প্রদর্শন করিয়া প্রাচ্য সেবাধর্ম্মের সহিত পাশ্চাত্য সেবাধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের শেষ প্রবন্ধ "দরিদ্র-নারায়ণসেবার প্রণালী" আমরা সকল দেশবাসীকেই পড়িতে অনুরোধ করি। ইহা আমাদের জ্ঞাতব্য বহু তথ্যে পরিপূর্ণ। দরিদ্রের দুঃখ-দারিদ্র্য নিবারণের সাময়িক ব্যবস্থার কথা বলিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"দরিদ্রদিগকে স্বাবলম্বী ও জীবিকানির্ব্বাহক্ষম করিয়া তোলাই

প্রকৃত দরিদ্রসেবা। পাশ্চাত্য জাতি যে সকল দেশব্যাপী অতুলন অনুষ্ঠানগুলি করিয়াছেন, যথা—শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, বয়ন, সীবন, চিত্রকলা, স্বর্ণরৌপ্যাদির কার্য্য, খনিজ শিল্প, সূত্র, বংশ ও বেত্রজ শিল্প, দপ্তরীর কার্য্য, ছাপাখানার কার্য্য, চিকিৎসা, সঙ্গীত, হস্তচালিত যন্ত্রের সাহায্যে বহুপ্রকার কারিকুরি, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দরিদ্র স্ত্রীপুরুষ ও বালক-বালিকাগণকে প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য দেশব্যাপী বিদ্যামন্দির-সমূহের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আমাদিগকেও ঐ প্রকার করিতে হইবে। তবে পার্থক্য এই যে তাঁহারা ঐহিক ভোগ ও প্রতিপত্তির দিক্ দিয়া ঐ সকল অনুষ্ঠান করিয়াছেন আর আমাদিগকে ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের দিক দিয়া 'প্রাণের টানে' উহার অনুষ্ঠান ও পরিচালনা করিতে হইবে।"

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রায় ২০ কোটী লোক কৃষিজীবী। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ঘোর দরিদ্র। ইহারা যাহাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অত্যল্প পরিশ্রমে অধিক শস্যোৎপাদন করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে Model Farm, Agricultural Institution, Loan office, Experimental farm প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য Industrialism বর্জ্জন করিয়া Hand machine সাহায্যে যাহাতে Cottage Industry-র প্রচলন হয় তাহার জন্য যত্নশীল হওয়া উচিত।

এই সকল কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য তিনি দেশের ধনী সদাশয় মহোদয়গণের এবং ত্যাগী স্বদেশসেবকগণের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য গ্রন্থকার পুস্তকের স্থানে স্থানে সম্প্রদায়বিশেষের বড় দোষ দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার জানা উচিত যে, দোষ দেখাইয়া বা গালি দিয়া কাহাকেও ভাল করা যায় না। প্রীতি ও সহানুভূতির সহিত বুঝাইলে তবে লোকে কথা শুনে। পুস্তকের কোন কোন স্থান অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াও মনে হইয়াছে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—অদ্বৈতজ্ঞান-প্রতিপাদক এক অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। শ্রীরামচন্দ্র সংসারত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলে মহর্ষি বশিষ্ঠ শত শত দৃষ্টান্ত, উপমা ও উপাখ্যান দ্বারা সরলভাবে জগতের স্বপ্নবৎ মিথ্যাত্ব ও তাহার ব্রহ্মস্বরূপতা প্রতিপাদন করিয়া তাঁহাকে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুতরাং মানবমনের সংস্কাররাশি ভস্মীভূত করিয়া উহাকে আত্মতত্ত্বাভিমুখী করিতে ইহার ন্যায় গ্রন্থ আর নাই বললেই হয়।

স্বর্গীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু গ্রন্থ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ১০১ খণ্ড প্রকাশ করিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ (নির্ব্বাণ প্রকরণের শেষাংশ) প্রকাশ করিতে এখনও প্রায় ২৫ খণ্ড লাগিবে। স্বর্গীয় বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় পণ্ডিতবর শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সহায়তায় এই মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

এই কার্য্যে অনুমান ২০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। এই অর্থ সংগ্রহের জন্য পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০১ খণ্ড যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ২৫৲ স্থলে মাত্র ১০৲ টাকায় প্রদত্ত হইতেছে। আশা করি, শিক্ষিত জনসাধারণ এই সংবাদে আনন্দিত হইবেন এবং এই স্বল্পমূল্যে উক্ত গ্রন্থ ক্রয় করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচাররূপ মহদনুষ্ঠানে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন। প্রাপ্তিস্থান লোটাস লাইব্রেরী, কলিকাতা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ—মূল, অন্বয়ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, শাঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত টীকা, শাঙ্কর ভাষ্যানুবাদ এবং স্থানে স্থানে তাৎপর্য্য সহ—পণ্ডিত শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। ২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, লোটাস লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুত অনিলচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক খণ্ডাকারে প্রকাশিত। মূল্য গ্রাহকপক্ষে ১৲, সাধারণপক্ষে ১।৵০।

এই উৎকৃষ্ট উপনিষদ্‌মালার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিক বার উদ্বোধনের পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিয়াছি। বৃহদারণ্যকের ১ম ভাগ প্রকাশিত হইবার পর ১৩২২ সালের আষাঢ়ের উদ্বোধনে আমরা উপনিষদের বর্ত্তমান সংস্করণটিকেই "বঙ্গভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে বৃহদারণ্যকের দশম ভাগ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে—ইহাতে চতুর্থ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অনুমান, আরও চারি ভাগে বৃহদারণ্যক সমাপ্ত হইবে।

এই উপনিষদ্‌মালা প্রকাশ করিয়া শ্রীযুত অনিলবাবু দেশের যে কল্যাণসাধন করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। উক্ত মহৎ কার্য্যটি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় তাহাই আমাদের প্রাণের ইচ্ছা। এই জন্য আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থে যে সকল ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছি নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

আমরা এই সুবৃহৎ গ্রন্থের স্থানে স্থানে মাত্র দেখিবার অবসর পাইয়াছি, তাহাতে মনে হইতেছে, সম্পাদনকার্য্য যথোচিত সতর্কতার সহিত করা হইতেছে না। মুদ্রাশুদ্ধি ত আছেই, তদ্ভিন্ন ব্যাখ্যাও স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ২য় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণের অনুবাদের উল্লেখ করিতেছি।

মূলে আছে;—"অথ বংশঃ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাৎ গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ" ইত্যাদি। ইহাতে আচার্য্যপরম্পরার বর্ণনা করা হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্যে লিখিত আছে—"তত্র প্রথমান্তাঃ শিষ্যাঃ পঞ্চম্যন্তা আচার্য্যাঃ।" বংশতালিকার প্রথা এই যে, নামগুলিকে নীচে নীচে সাজান যাইতে পারে অর্থাৎ একই ব্যক্তি নিম্নতনের গুরু এবং ঊর্দ্ধতনের শিষ্য। তদনুসারে উক্ত শ্রুত্যংশের অর্থ হইবে এইরূপ;—পৌতিমাষ্য গৌপবন হইতে (শিক্ষাপ্রাপ্ত), গৌপবন (অপর) পৌতিমাষ্য হইতে, ইত্যাদি। তৎপরিবর্ত্তে গ্রন্থে 'পৌতিমাষ্য' কথাটি ছাড়িয়া দিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে—"গৌপবন......হইতে...... গৌপবন" ইত্যাদি। শেষে আছে—"সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মণে নমঃ"। ইহার ভাষ্য শঙ্কর এইরূপ

লিখিয়াছেন—"পরমেষ্ঠী বিরাট্। ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাৎ। ততঃ পরং আচার্য্যপরম্পরা নাস্তি। যৎপুনর্ব্রহ্ম তন্নিত্যং স্বয়ম্ভু, তস্মৈ ব্রহ্মণে স্বয়ম্ভুবে নমঃ।" ভাষ্যানুবাদে ঠিকই লেখা হইয়াছে—"এখানে পরমেষ্ঠী অর্থ বিরাট্ পুরুষ; 'ব্রহ্মণঃ' অর্থ হিরণ্যগর্ভ হইতে, বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার উপরে আর আচার্য্যক্রম নাই" ইত্যাদি। অথচ মূলানুবাদে লেখা হইয়াছেঃ—সনগ হইতে সনগ, পরমেষ্ঠী হইতে পরমেষ্ঠী (বিরাট্) এবং ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ হইতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন", ইত্যাদি। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এ অংশ সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ের অজ্ঞাতসারে অপর কাহারও কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে। নতুবা এরূপ অর্থহীন, খাপছাড়া অনুবাদ কিরূপে আসিল? চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে ঐরূপ একটি বংশতালিকা আছে। আশা করি উহার অনুবাদ এরূপ অসঙ্গত ভাবে করা হইবে না।

৩য় অধ্যায়ের ৮ম ব্রাহ্মণের "ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং"—এই অংশের ভাষ্যে শঙ্কর বিভিন্ন স্থলে "ব্রহ্মোদ্যং ব্রহ্মবদনং প্রতি জেতা"......'ব্রহ্মোদ্যং প্রতি এতত্তুল্যো ন কশ্চিৎ বিদ্যতে" এইরূপ লিখিয়াছেন। সুতরাং "ব্রহ্মোদ্যং" শব্দের অর্থ "ব্রহ্মকথন" বা ব্রহ্ম বিষয়ে বাদ—'ব্রহ্মবাদী" নহে।

৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণের শাঙ্করভাষ্যের "তেনৈব চ অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্দর্শয়িতুং শক্যঃ, ন ত্বন্যথা—অসতি বিষয়ে কস্মিংশ্চিৎ সুষুপ্ত-কাল ইব।" এই অংশের শেষভাগের অনুবাদ করা হইয়াছে—"নচেৎ স্বপ্নসময়ের ন্যায় কোন [বিষয় প্রকাশ্য] থাকিলে, তাহার স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বভাব প্রদর্শন করিতে পারা যায় না।"—ইহা একবারে উল্টা হইয়াছে। করা উচিত ছিল—"নচেৎ সুষুপ্তিসময়ের ন্যায় কোন বিষয় (=প্রকাশ্য) না থাকিলে, তাহার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব প্রদর্শন করিতে পারা যায় না।"

২য় অধ্যায়ের ১ম ব্রাহ্মণের ৪র্থ কণ্ডিকায় "তেজস্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি"—এই অংশের মূলানুবাদ ভ্রমক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বৃহদারণ্যকের ন্যায় দুরূহভাষ্যসমন্বিত বৃহৎ গ্রন্থে এইরূপ ত্রুটী

থাকা স্বাভাবিক সন্দেহ নাই, কিন্তু একটু চেষ্টা করিলে যদি ইহাকে আরও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা যায়, তাহা না করা হইবে কেন? আশা করি ভবিষ্যতে শ্রদ্ধেয় সত্ত্বাধিকারী ও সহকারী সম্পাদক মহাশয় আরও একটু যত্ন লইবেন। গ্রন্থপ্রকাশে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছে, বাকী কয় খণ্ড একটু শীঘ্র শীঘ্র বাহির হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে শিক্ষিত জনসাধারণের বিশেষ সহানুভূতি প্রয়োজন। উপনিষদের উচ্চ তত্ত্ব-সমূহ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রচারিত হউক, বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা এই মহদনুষ্ঠানের ফলভাগী হউন, পাশ্চাত্য জড়বাদের মোহজাল ছেদ করিয়া আবার বাঙ্গালী আত্মার মহিমা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া ধন্য ও কৃতকৃত্য হউন।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ-কার্য্য।

(বাঙ্গালা ও বিহার)

সংবাদপত্রপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, দেশের কি ভয়ানক দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বাঙ্গালা এবং বিহারে উত্তরোত্তর সাহায্যকেন্দ্র বর্দ্ধিত করিতেছি সত্য, কিন্তু অভাবের তুলনায় উহা যৎসামান্য মাত্র। আমরা বর্ত্তমানে মানভূম জিলার অন্তঃপাতী বাগদা, বাঁকুড়া জিলার অন্তঃপাতী ইঁদপুর, কণিযামারা এবং কোয়ালপাড়া, সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতী কুণ্ডা ও সরমা এবং ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত দত্তখোলা (ব্রাহ্মণবেড়িয়া) নামক স্থানে সাহায্যকেন্দ্র খুলিয়াছি এবং শীঘ্রই ঐ জিলার অন্তঃপাতী বিটঘর-নামক স্থানেও সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইবে। এ সকল স্থান ব্যতীত আমরা ভুবনেশ্বর, কল্মা, লতাবদি এবং ভাককাটিনামক স্থানে দুঃস্থ লোকদিগকে বস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করিতেছি। জলকষ্ট নিবারণকল্পে বাগদায় একটি পুষ্করিণী এবং ইঁদপুর থানার

অন্তর্গত ভালুকা, দেউলভেড়িয়া এবং দামোদরপুর নামক স্থানে তিনটি কূপ খনন করা হইয়াছে। বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় আমরা ঐ কার্য্য বন্ধ করিয়া বাঁকুড়া এবং মানভূম জিলায় আমাদের সীমানার মধ্যে বীজধান্য বিতরণ করিতেছি। আমদানী-খরচ বাদ দিয়া কেনাদরে বিক্রয় জন্য ইঁদপুর এবং বাগ্‌দায় যে চাউলের দোকান খোলা হইয়াছে উহাতে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক এবং কুলিমজুরদের যথেষ্ট সাহায্য করা হইতেছে।

নিম্নে ২৮শে মে হইতে ১৫শে জুন পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক চাউল ও বস্ত্র বিতরণের হিসাব প্রদত্ত হইল।

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ	বীজের পরিমাণ	বস্ত্রের সংখ্যা
		বাগ্‌দা (মানভূম)		
৫৫	১৪৪৭	৭৩॥৯		৮
৫০	১৩৭২	৬৯৸৯	৪০/৭	,,
৪৯	১৩৫২	৬৮৸২	,,	,,
৪৯	১৩৮৫	৭০/	,,	,,
		ইঁদপুর (বাঁকুড়া		
৩১	৫৪০	২৮।৪	,,	১৫০
৩২	৫৬১	২৮৸২	,,	৫
৩২	৫৬২	২৮॥৯	,,	,,
৩২	৫৬৪	২৮৸৫	২৮/৮	১৫
		কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া)		
১৯	১৭৫	৯।৩	,,	,,
১৯	১৪৯	৮।৬	,,	১
১৯	১৩৮	৭॥১	,,	৪
১৯	১৩৯	৭॥	,,	৫
		কণিয়ামারা (বাঁকুড়া)		
৮	৬২	৩।৫	,,	,,

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ	বীজের পরিমাণ	বস্ত্রের সংখ্যা
৮	৬৫	৪।০	২৮/৮	৫
৮	৭০	৪।১	,,	,,
১০	১৩৬	৭।৭	,,	,,
	কুণ্ডা (দেওঘর—সাঁওতাল পরগণা)			
১২	১৩৫	৯।/	,,	১২
১৭	১৭০	৯/০	,,	৮
২৩	২১৬	১১।০	,,	৯
২৭	২৪১	১২॥০	,,	৫
২৬	২৪৫	১২॥৬	,,	১০
	সরমা (মধুপুর—সাঁওতাল পরগণা)			
১৮	১৩৩	১১/	,,	২
২৭	২৩৫	১৪/	,,	১১
৩০	৩২৯	১৯॥০	,,	২১
	ব্রাহ্মণবেড়িয়া (দত্তখোলা—ত্রিপুরা)			
৩১	৬০২	৩০/৫	,,	,,
৩১	৫৪৭	২৭।৪	,,	,,
৩২	৫৮১	২৯/২	,,	,,
৩২	৫৭৮	২৮৸৬	,,	১
৩২	৫৯১	২৯।	,,	৫

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১৬ই এপ্রেল হইতে ৪ঠা জুন, ১৯১৯, পর্য্যন্ত উদ্বোধন-কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত।

নাম	স্থান	টাকা
শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ বসু,	কলিকাতা	২৲
,, প্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	,,	১৲
,, হরেন্দ্র নাথ দে,	,,	১৲
,, হরিপদ মিত্র,	,,	১৲
,, তিনকড়ি দে,	,,	৲
,, পশুপতি বসু,	,,	১৲
,, মুক্তারাম সেন,	,,	১৲
,, নারাণ চন্দ্র দে	,,	॥০
,, জ্যোতিশ্বর সিংহ	,,	॥০
,, শচীন্দ্রনাথ সিংহ	,,	৫৲
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ,	,,	৩৲
,, গৌরিমোহন মিত্র,	,,	২৲
,, মণীন্দ্রনাথ সিংহ,	,,	১৲
,, বিজয়মঙ্গল রায়,	বরিশাল	১৲
ইণ্ডিয়ান এসিষ্টেণ্টস অব মেসার্স জেম্‌স্‌ স্কট এণ্ড সনস লিমিটেড—		১৬৲
শ্রীযুত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়,	পুরি,	১০৲
,, প্রবোধচন্দ্র সরকার,	আন্দুল,	১২৲
,, যদুনাথ মজুমদার,	কুমিল্লা	৩।৵৹
,, উপেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার,	মেদিনীপুর,	৫৲
,, গোপেশ্বর দাস,	,,	৬৲
,, ধীরেন্দ্রনাথ বসু,	,,	১৲
,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ,	,,	২৲
,, কৃষ্ণপ্রসাদ মল্লিক,	,,	১৲
,, শচীন্দ্রলাল মিত্র,	,,	১৲
,, নিরঞ্জন ঘোষ,	,,	১৲
,, জনৈক বন্ধু,	,,	১৲
শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী,	পৈলগাঁ,	৫০৲
,, চিন্তাহরণ ব্যানার্জ্জি,	অভয়াপুরী,	২৫৷৴
হৈদাস্কুলের শিক্ষকবর্গ,	হৈদা	৪৲
,, ছাত্রবর্গ	,,	৫৲
জনৈক মহিলা,	,,	১৲
শ্রীমতি নগেন্দ্রবালা দেবী,	তেজপুর	১০৲
টি, পি, গুপ্ত,	বহরমপুর,	২৲
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,	বাখরগঞ্জ,	২৲
,, অক্ষয় কুমার নন্দী,	কলিকাতা,	১০৲
ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিভার্সিটি কলেজ	,,	২১৸৵০
খুচরা আদায়,	,,	।৵১০
শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দাসী	,,	৫৲
শ্রীযুত চারুচন্দ্র হাজরা	,,	১৫৲
,, কানাই লাল দাস	,,	৫৲
,, সরোজ কুমার রায়,	দিল্লী,	২৲
,, এ, সি, রায়,	,,	২৲
শ্রীদ্বিজেন্দ্র কুমার পরামাণিক,	বালিয়াটি	১৲
,, কালিচরণ মিত্র,	কলিকাতা	৫৲
,, হরবঞ্জন কর্ম্মকার,	জামালপুর	১৲
বিমলা ভাণ্ডার,	ডেমরা	৫৲
,, কুঞ্জবিহারি রায়,	কলিকাতা	৫০।৹
,, অরুণ দাস সরকার,	,,	১৲
,, জনৈক বন্ধু,	,,	১৫৲
৺গোলাপ কুমারী দাসী,	পৈত্তা,	২০৲
মাঃ শ্রীভূষণ চন্দ্র পাল,	কলিকাতা,	৩৫০৲
ডাঃ কে, জি, মুখার্জ্জী,	পোর্টব্লেয়ার	৫৲
ডাঃ বি, চক্রবর্ত্তী,	,,	৫৲
ডাঃ বি, মণ্ডল,	,,	৫৲
শ্রীযুত আর, সি, ঘোষ,	,,	৩৲
,, এন, এল, সান্যাল	,,	২৲
,, এ, সি, রায়,	,,	২৲
,, আবদুল ওয়াহিদ,	,,	২৲
,, এস্ এন্, ডি, রায়,	,,	২৲
,, রাম চরণ সাঁই	,,	৪৲
এস্,	,,	॥০
মাঃ ডি, মণ্ডল,	,,	১২৸১৫
শ্রীযুত সূর্য্যকুমার অগস্তি,	বাঁকুড়া	৬০৲
শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা দেবী,	কলিকাতা	২৲
,, রাজলক্ষ্মী বসু,		১০৲
শ্রীযুত মোহিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী,	গোপালদি	২৲
,, সুরেন্দ্র লাল সেন,	আরারিয়া	২৷০

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী, বালিয়াটী ১৲
„ সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, „ ১৲
„ দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, „ ১৲
„ রমণীমোহন রায় চৌধুরী, „ ১৲
„ সুশীলকুমার রায় চৌধুরী, „ ১৲
„ ব্রজবল্লভ রায় চৌধুরী „ ১৲
„ রেবতীমোহন রায় চৌধুরী, „ ১৲
„ প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, „ ১৲
„ অপূর্ব্বকুমার রায় চৌধুরী, „ ১৲
„ মনীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, „ ১৲
„ কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী „ ১৲
„ হরিপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, „ ১৲
„ সুবোধকুমার রায় চৌধুরী, „ ১৲
„ নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, „ ১৲
„ হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, „ ১০৲
„ হরিপদ রায়, কলিকাতা ৫৲
মেম্বর ইয়ংমেনস্ ইউনিয়ন, „ ১৯৶০
জনৈকবন্ধু, পটলডাঙ্গা এসোসিয়েসান ৫০৲
শ্রীযুত সিতিকণ্ঠ সাহা, পাবনা, ৫৲
„ সুশীল কুমার মিত্র, কলিকাতা ৩৲
„ জিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী, পাটনা ॥০
মনোহরপুকুর অনাথ-ভাণ্ডার,
কলিকাতা ১১৫৶০
„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, লাহোর ১৫৲
„ সুরেশ চন্দ্র বেরা, হরিয়া ২॥০
„ দ্বারকা নাথ দাস, „ ১৲
„ জানকী নাথ সাহা, কলিকাতা, ২৲
„ ঈশ্বর চন্দ্র সাহা, মেদিনীপুর, ১৲
রামকৃষ্ণ ভক্ত, ইয়ংমেনস্ ইউনিয়ন,
কলিকাতা ১০৲
শ্রীযুত গৌরীকান্ত বিশ্বাস, পুনা ২৲
„ নসিংহ মিত্র, কলিকাতা ২৲
জনৈক বন্ধু, „ ১৲
পি, চ্যাটার্জ্জী, „ ৫০৲
শ্রীযুত ভবানীশঙ্কর ও উমাকিঙ্কর
পাহারতলী ৪৲
„ রাই মোহন চৌধুরী, বালিয়াটী ১৲
„ মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, „ ২৲
ডাঃ মদন মোহন সাহা, „ ১৲

শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বাখরগঞ্জ ২৲
জনৈকবন্ধু, কালীবাটী, বর্দ্ধমান, ২৲
শ্রীযুত ব্রজলাল পাল, কলিকাতা ১০৲
„ হরিদাস মুখোপাধ্যায়, হুগলী ২॥০
জনৈক হিতৈষী, কলিকাতা ১৲
শ্রীযুত ভোলানাথ বড়াল „ ১০৲
মাঃ গঙ্গারাম, পোর্টব্লেয়ার ৪৫।০
লালা দৌলতরাম „ ২৲
শ্রীযুত গোপাল দাস „ ১॥০
„ এম্, আর, রায়, „ ২৲
নাথুমল, ডঙ্গ „ ১৲
লালা হরগোপাল, পোর্ট ব্লেয়ার ২৲
শ্রীযুত রাম লাল, „ ২৲
„ লালা সুখরাম „ ২৲
„ গোলাপচাঁদ, „ ১॥০
„ লালা „ ২৲
মিঃ আহাম্মদ হাসন সাহেব „ ১৲
„ ওয়াজিরালি সাহেব, „ ১৲
„ অমরসিং সাহেব „ ১৲
শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ দে, ৫৲
কে, চৌধুরী এণ্ড সন্স, সোহাগপুর ২৲
শ্রীযুত মনোরঞ্জন ঠাকুর, রামগোপালপুর ১৲
শ্রীমতী ননীবালা, তাম্বাবিম্, ১৲
শ্রীযুত মণীন্দ্রভূষণ দত্ত, চট্টগ্রাম ১০৲
মহাদেব ঠাকুর, মহম্মদবাজার ১৫৲
বেঙ্গলী পোষ্টেল ভলাণ্টিয়ার,
মাঃ ইউ, এন চক্রবর্ত্তী, বস্‌রা ২২৶০
৺দাক্ষায়ণী বসু, কলিকাতা ২৲
শ্রীযুত অতুল কৃষ্ণ দে, „ ২৲
জনৈক বন্ধু „ ১৲
জনৈক বন্ধু „ ৫৲
মাঃ রামচরণ সাহেব, পোর্ট ব্লেয়ার ৬৭৲
শ্রীযুত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ গুপ্ত, কসম ১০৲
জামদার বালিয়াটী ৪৯॥০
শ্রীযুত হরিভূষণ পাঁড়ে, তাম্বাবিম ১।০
„ নৃপেন্দ্রকুমার মিত্র, কলিকাতা, ১০৲
„ শরৎ চন্দ্র ঘোষ „ ৫৲
জনৈক বন্ধু „ ৫৲
মেম্বর, বঙ্গবাসী সম্মিলনী, „ ১২৲

নিত্যানন্দ সাহা, ,, ২৫॥১৫
আবদুল হাকিম, সকরলি ১৲
শ্রীযুত অশ্বিনী কুমার সমদ্দার, ,, ১
,, দুলু বিশ্বাস, ,, ১
শ্রীযুত মণিমোহন বিশ্বাস, জামসেদপুর ১২
,, ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা ১০৲
,, নিত্যলাল মুখার্জ্জি ,, ১১৩৲

১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বেলুড়-মঠে প্রাপ্ত।

রামকৃষ্ণমিশন, বরিশাল, ১৫০৲
শ্রীযুত ফণীভূষণ দত্ত, পারাজ, ৭৶০
,, হরিপদ চৌধুরী, ওলপুর, ৭৲
,, নারায়ণ চন্দ্র ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা, ১৲
,, তুলসী চরণ সরকার, খিদিরপুর, ৷৷০
,, এ, ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা, ১৲
,, নারায়ণ দাস বসু, ,, ১৲
,, দেবেন্দ্র নাথ ধাঙ্গ, সালকিয়া ১৲
,, পি, বি, মিত্র, ওরাই, ৫৲
,, মোহনলাল সাহা চৌধুরী, মায়াবতী ৩৲
,, এস, এন, ব্যানার্জ্জি, বাঁকুড়া, ১০৲
,, ভি, বিশ্বনাথ আয়ার, কারুর. ১৲
,, যজ্ঞেশ্বর চ্যাটার্জ্জি, ভাগলপুর, ৭
,, শরৎ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, চলতাজলিয়া, ৫৲
,, দেবেন্দ্র লাল সাহা, কেদারপুর, ৫৲
,, কেদারনাথ ঘোষ, সুকচর, ৩০
,, পঙ্কজকুমার আইচ, ভবানীপুর, ৫৲
,, হরি পদ পাল, বালিয়াঘাটা ২
,, এ, আর, মজুমদার, নাটোর, ৬
,, এইচ, বি, মুখার্জ্জি, বসুরা, ৫৲
,, হরিমোহন ঘোষ, ভবানীপুর, ২৫
,, মনোরঞ্জন সেন, কলিকাতা, ১৲
,, শ্রীশচন্দ্র দে, বর্দ্ধমান, ৭৷৷৵০
,, কৈলাশ চন্দ্র মণ্ডল, বান্দা, ২৲
,, বরদাকান্ত সেনগুপ্ত, কাজিরবাজার, ১৲
,, ডি, পি, ব্যানার্জ্জি, বাঁশজোড়া, ৫৲
,, এস, এন, বসু, ,, ৫৲
,, এস, বেঙ্কটাচেলাম চেটী, মান্দ্রাজ, ২৫৲
,, ফণীভূষণ পাল, উত্তরপাড়া, ৷০
,, হরিমোহন চ্যাটার্জ্জি, বালি, ৷৷০
,, ব্রজেন্দ্র কুমার দত্ত, ভবানীপুর, ৷৷০
,, নিয়ামত আলী, দত্তবাজার, ৷০
,, যতীন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি, সিঁথি, ৷০
,, তিনকড়ি সিংহ, কলিকাতা, ২৲

শ্রীযুক্ত রামরুদ্র ব্যানার্জ্জি, ,, ৵০
,, সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জ্জি, শিবপুর, ১৲
,, এস, ভদ্রখালী, ৷০
,, এইচ রায়, ৷০
,, বি, কলিকাতা ৷৷০
,, আশুতোষ ঘোষাল, ,, ১৲
,, আর, ঘোষ, ,, ৷০
,, সুশীল চন্দ্র নাগ, ঢাকা, ১৫৲
,, হরেন্দ্র কুমার আইচ, ভবানীপুর, ১৲
,, নলিনীনাথ রায় চৌধুরী, কলিকাতা ৩৲
শ্রীমতী তরুবালা দেবী, মধুপুর, ১০৲
শ্রীযুত গোপালচন্দ্র শর্ম্মা, আজমির, ৫৲
,, দীনবন্ধু পইত, শেখরনগর. ৫৲
সিংহবাহিনী মাতা, কলিকাতা, ২৫৲
শ্রীযুত শ্যামবাহাদুর, জলেশ্বরটাউন, ৫৲
,, বীরেন্দ্রলাল নাথ, আলীপুর, ২৲
,, জগবন্ধু রায়, বালীগঞ্জ, ৫৲
জনৈক বন্ধু, বোম্বাই, ৫০৲
শ্রীযুত চারুচন্দ্র দাশ, কলিকাতা, ২৲
,, শৈলেন্দ্র কুমার বল, ,, ১৲
,, এন, বি, পাণ্ডা, সাহাপুর ২৲
,, এস, এন, চক্রবর্ত্তী. কলিকাতা, ৫৲
,, শিব চন্দ্র মুখার্জ্জি, ,, ১০৲
,, এস, পি, নিয়োগী, পাউরী, ৩০৲
,, যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস, কোকদাহরা, ২৷৴০
,, অবিনাশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি, বারীনপুর ১
,, ললিত মোহন ঘোষ, কলিকাতা, ৷৵৯
,, সি, সি, মিত্র, ,, ২০৲
মিসেস্ জে, এন, বসু, বালীগঞ্জ, ৪০৲
শান্তিপুর অরিয়েণ্টেল একাডেমির
২য় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ, ২৵০
শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জি, গৌহাটী ৫৲
,, ই বিজয়ান নাগলিঙ্গম, মান্দ্রাজ, ৩৲
,, ভি, এন, কুপরাও, ,, ২০

কুমারডুবি চ্যারিটী ফাণ্ড, বরাকর, ৫_
শ্রীযুক্ত ধ্রুবলাল মুখার্জ্জি, কলিকাতা, ১_
" হরিসেনা, " ১০_
শ্রীমতী নলিনীসুন্দরী দাসী, কলিকাতা ১০
" উষাবতী দাসী, " ৪_
শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত, " ২৫
" এস, সি, দত্ত, বেহালী, ৫_
" এম, এল, গোস্বামী, পেগু, ২০_
" জিতেন্দ্র নাথ মিত্র, কলিকাতা, ১_
" অতুলকৃষ্ণ দাস, " ২_
জনৈক হিতৈষী, ২০০০_
মিস্ বাণ্ডহাম্, ক্রাইষ্টচার্চ্চ নিউজিল্যাণ্ড ৭৯৸৶
শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য্য, নড়াইল, ১_
জনৈক বন্ধু, বালী, ৫
শ্রীযুত পরাণ চাঁদ নাহতা, জিযাগঞ্জ, ১০১
জনৈক বন্ধু, " ২_
শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ভবানীপুর, ২০
" তারিণীপ্রসাদ, মুঙ্গের, ১_
ক্যাপ্টেন এম মুখার্জ্জি, ফিরোজপুর, ২৫_
শ্রীযুত অনিলচন্দ্র লাহিড়ী, শালটোরা, ৭॥০
" ভগবতী প্রসাদ, নৈনী ১_
" শীতল দাস রায়, নিশ্চিন্দিপুর, ৫_
" অপর্ণা চরণ দাস, মেদিনীপুর, ৫
শ্রীমতী হরিমতী দাসী, কলিকাতা, ৫০০_
শ্রীযুত উপেন্দ্র লাল মজুমদার, " ৫১_
" সত্য কিশোর ব্যানার্জ্জি, " ২০_
" ধীরেন্দ্র কুমার সরকার, রাঁচি, ১।০
" অন্নদা চরণ বণিক, ফেণী, ৩
" এ, কে, ঘোষ, কায়েকটানা, ১০_
" মনোমোহন বসু, হাবড়া, ১৪_
" প্রভাস মিত্র, জামসেদপুর, ২_
" সেখ মুখদুল মিঞা, " ১
জনৈক ভক্ত, কলিকাতা, ৫_
শ্রীযুত বিভূতি ভূষণ মজুমদার, মালদ্র, ৬_
" বিশ্বনাথ দাস, " ৩॥০
ডাক্তার হৃদয় নাথ ঘোষ, ১॥০
শ্রীযুত আর, এন ঘোষ, গমডাস, ২৫
" চণ্ড সিওয়ালী, ডিডাম্বি, ৫_
শ্রীযুত এস, ডি, মুখার্জ্জি, পুনা ক্যাম্প, ১_
শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি, কলিকাতা, ১_
" ভোলা নাথ মল্লিক, " ।০
প্লিডারস্ অ্যাসোসিয়েসন, হাবড়া ২০_
শ্রীযুত এস্ গোস্বামী, এলাহাবাদ, ১২_
মাঃ ননীগোপাল ঘোষ, হাবড়া, ৩॥০
শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ সেন, সওন্দপ, ৪_
" ননীগোপাল বসু, কলিকাতা, ১০_
ক্যাপ্টেন এস, পি দাস গুপ্ত, কলিকাতা ৫_
শ্রীযুত কালা চাঁদ গাঙ্গুলী, খান্দেশ, ১০_
" কাশী নাথ দত্ত, নলডাঙ্গা, ৫০_
" উষানাথ বসু, গোপালগ্রাম কাচারী ১
" পরেশ নাথ রায় চৌধুরী,
ডায়মণ্ডহারবার, ১০_
" দীননাথ চক্রবর্ত্তী, জামসেদপুর, ১৮০_
" অবিনাশ চন্দ্র রায়, গয়া, ১০_
" হরেন্দ্র নাথ সামন্ত, হাবড়া, ১০_
লালকুটী মেস, কুমিল্লা, ৩_
শ্রীযুত মহাদেব চন্দ্র বিশ্বাস, মেচপাড়া, ১
" কুমার অরুণ চন্দ্র সিংহ, বাহাদুর,
পাইকপাড়া রাজ, ১০০_
" বিশ্বনাথ বালাজিগোখেল, পুনাসিটি ৫_
" যতীন্দ্র লাল ঘোষ, বাঁশজোড়া, ৬৫॥০
" কুমুদিনী বিশ্বাস, বরিশাল, ২
জনৈক ভক্ত ১০০০_
শ্রীযুত বি, নারায়ণ, কলিকাতা, ১০_
" সি, ঘোষ, আলিপুর, ২_
জনৈক বন্ধু, ২০০০_
শ্রীযুত এ, ডি, মুখার্জ্জি, কলিকাতা, ১০
মাঃ শ্রীহরিপদ চৌধুরী, কুট, ৪৭॥০
শ্রীযুত রমাপতি চ্যাটার্জ্জি কার্সিয়াং, ১০_
" জে, কে, রাও, বেঙ্গপাহাড়, ১_
জনৈক দেশসেবক, ১০০০_
শ্রীযুত এস, ও, বুনো, রোড়ি, ১৸৶০
" এম, ও, মাঙ্গহাও, " ৸৶৭
" দুর্গাচরণ চাটার্জ্জি, বেনারস সিটি, ৩_
" শ্যামা প্রসন্ন ব্যানার্জ্জি, খিদিরপুর, ১_
" রামাণিকলাল বেদীলাল পারেখা,
আহাম্মদাবাদ, " ১০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

কাশীপুরে সেবাব্রত।

(স্বামী সারদানন্দ)

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, পৌষ মাসে যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া ঠাকুর অগ্রহায়ণ মাস সম্পূর্ণ হইবার দুইদিন পূর্ব্বে শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুর উদ্যানে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় জনকোলাহলপূর্ণ রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত শ্যামপুকুরের বাটী অপেক্ষা উদ্যানের বসত-বাটীখানি অনেক অধিক প্রশস্ত ও নির্জ্জন ছিল এবং উহার মধ্য হইতে যে দিকেই দেখ না কেন, বৃক্ষরাজির হরিৎপত্র, কুসুমের উজ্জ্বল বর্ণ এবং তৃণ ও শষ্প সকলের শ্যামলতাই নয়নগোচর হইত। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তুলনায় উদ্যানের ঐ শোভা অকিঞ্চিৎকর হইলেও নিরন্তর চারি মাস কাল কলিকাতা বাসের পরে ঠাকুরের নিকটে উহা রমণীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি প্রফুল্ল হইয়া উহার চারিদিক লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার, দ্বিতলে তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশস্ত ঘরখানিতে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে তিনি উহার দক্ষিণে অবস্থিত ছাদে উপস্থিত হইয়া ঐস্থান হইতেও কিছুক্ষণ উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্যামপুকুরের বাটীতে যেরূপ রুদ্ধ, সঙ্কুচিতভাবে থাকিতে হইয়াছিল এখানে সেইভাবে থাকিতে হইবে না অথচ ঠাকুরের সেবা পূর্ব্বের ন্যায়ই করিতে পারিবেন এই কথা ভাবিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও যে আনন্দিতা হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব তাঁহাদিগের

উভয়ের আনন্দে সেবকগণের মন প্রফুল্ল হইয়াছিল একথাও বলা বাহুল্য।

উদ্যান বাটীতে বাস করিতে উপস্থিত হইয়া যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ অসুবিধা প্রথম প্রথম নয়নগোচর হইতে লাগিল সেই সকল দূর করিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ঐ সকলের আলোচনায় নরেন্দ্রনাথ সহজেই বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুরের সেবার দায়িত্ব যাঁহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের ও চিকিৎসকগণের আবাস হইতে দূরে অবস্থিত এই উদ্যান-বাটীতে থাকিতে হইলে লোকবল এবং অর্থবল উভয়েরই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। প্রথম হইতে ঐ দুই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর না হইলে সেবার ত্রুটি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বলরাম, সুরেন্দ্র, রাম, গিরিশ, মহেন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা অর্থবলের কথা এ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা ঐ বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন এক উপায় নিশ্চয় স্থির করিবেন। কিন্তু লোকবল সংগ্রহে তাঁহাকেই ইতিপূর্ব্বে চেষ্টা করিতে হইয়াছে এবং এখনও হইবে। ঐ জন্য কাশীপুর উদ্যানে এখন হইতে তাঁহাকে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হইবে। তিনি ঐরূপে পথ না দেখাইলে অভিভাবকদিগের অসন্তোষ এবং চাকরি ও পাঠহানির আশঙ্কায় যুবক ভক্তদিগের অনেকে ঐরূপ করিতে পারিবে না। কারণ, ঠাকুরের শ্যামপুকুরে থাকিবার কালে তাহারা যেরূপে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিয়া আসিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতেছিল এখান হইতে সেইরূপ করা কখনই সম্ভবপর নহে।

আইন (বি, এল্) পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত নরেন্দ্র ঐ বৎসর প্রস্তুত হইতেছিলেন। উক্ত পরীক্ষার ও জ্ঞাতিদিগের শত্রুতাচরণে বাস্তভিটার বিভাগ লইয়া হাইকোর্টে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তদুভয়ের নিমিত্ত তাঁহার কলিকাতায় থাকা এখন একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও তিনি শ্রীগুরুর সেবার নিমিত্ত ঐ অভিপ্রায় মন হইতে এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক আইনসংক্রান্ত গ্রন্থগুলি কাশীপুর উদ্যানে আনয়ন ও অবসরকালে যতদূর সম্ভব অধ্যয়ন করিবেন, এইরূপ সংকল্প স্থির

করিলেন। ঐরূপে সর্ব্বাগ্রে ঠাকুরের সেবা করিবার সংকল্পের সহিত সুবিধামত ঐ বৎসর আইন পরীক্ষা দিবার সংকল্পও নরেন্দ্রনাথের মনে এখন পর্য্যন্ত দৃঢ় রহিল। কারণ, অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েকটা বৎসরের পরিশ্রমে মাতা ও ভ্রাতাগণের জন্য মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদনের একটা সংস্থান করিয়া দিয়াই সংসার হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক ঈশ্বর-সাধনায় ডুবিয়া যাইবেন। কিন্তু হায়, ঐ রূপ শুভসংকল্প ত আমরা অনেকেই করিয়া থাকি—সংসারের পশ্চাদাকর্ষণে এতদূর মাত্র গাত্র ঢালিয়াই বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক সম্মুখে শ্রেয়ঃ-মার্গে অগ্রসর হইব এইরূপ ভাবিয়া কার্য্যারম্ভ আমরা অনেকেই করি, কিন্তু আবর্ত্তে না পড়িয়া পরিণামে কয়জন ঐরূপ করিতে সমর্থ হই? উত্তমাধিকারিগণের অগ্রণী হইয়া ঠাকুরের অশেষ কৃপালাভে সমর্থ হইলেও নরেন্দ্রনাথের ঐ সংকল্প সংসার-সংঘর্ষে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া কালে অন্য আকার ধারণ করিবে না ত?—হে পাঠক ধৈর্য্য ধর, ঠাকুরের অমোঘ ইচ্ছাশক্তি নরেন্দ্রনাথকে কোথা দিয়া কি ভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাইয়াছিল তাহা আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

ঠাকুরের সেবার জন্য ভক্তগণ যাহা করিতেছিলেন সেই সকল কথাই আমরা এ পর্য্যন্ত বলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে, দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কালে যাঁহাকে আমরা বেদ বেদান্তের পারের তত্ত্বসকলের সাক্ষাৎ উপলব্ধির সহিত একযোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনন্দিন বিষয়সকলে এবং প্রত্যেক ভক্তের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে দেখিয়াছি সেই ঠাকুর কি এইকালে নিজ সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া সকল বিষয়ে সর্ব্বদা ভক্তগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন? উত্তরে বলিতে হয়, তিনি চিরকাল যাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন সেই জগন্মাতার উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ও একান্ত নির্ভর করিয়া এখনও ছিলেন এবং ভক্তগণের প্রত্যেকের নিকট হইতে যে প্রকারের যতটুকু সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা লওয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার অভিপ্রেত ও তাহাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত

একথা পূর্ব্ব হইতে জানিয়াই লইতেছিলেন। তাঁহার জীবনের আখ্যায়িকা বলিতে আমরা যতই অগ্রসর হইব ততই ঐ বিষয়ের পরিচয় পাইব।

আবার ভক্তগণকৃত যে সকল বন্দোবস্ত তাঁহার মনঃপূত হইত না সেই সকল তিনি তাহাদিগের জ্ঞাতসারে এবং যেখানে বুঝিতেন তাহারা মনে কষ্ট পাইবে সেখানে অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেন। চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসিবার কালে ঐজন্য বলরামকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, দশজনে চাঁদা করিয়া আমার দৈনন্দিন ভোজনের বন্দোবস্ত করিবে এটা আমার নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ, কারণ কখন ঐরূপ করি নাই। যদি বল, তবে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ঐরূপ করিতেছি কিরূপে, কর্ত্তৃপক্ষেরা ত এখন নানা সরিকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সকলে মিলিয়া দেবসেবা চালাইতেছে ?—তাহাতে বলি এখানেও আমায় চাঁদায় খাইতে হইতেছে না ; কারণ, রাসমণির সময় হইতেই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, পূজা করিবার কালে ৭৲ টাকা করিয়া মাসে মাসে যে মাহিনা পাইতাম তাহা এবং যতদিন এখানে থাকিব ততদিন দেবতার প্রসাদ আমাকে দেওয়া হইবে। সেজন্য এখানে আমি একরূপ পেন্সনে* খাইতেছি বলা যাইতে পারে। অতএব চিকিৎসার জন্য যতদিন দক্ষিণেশ্বরের বাহিরে থাকিব ততদিন আমার খাবারের খরচটা তুমিই দিও।" ঐরূপে কাশীপুরের উদ্যান-বাটী যখন তাঁহার নিমিত্ত ভাড়া লওয়া হইল তখন উহার মাসিক ভাড়া অনেক টাকা (৮০৲) জানিতে পারিয়া তাঁহার 'ছাপোষা' ভক্তগণ উহা কেমন করিয়া বহন করিবে এই কথা ভাবিতে লাগিলেন ; পরিশেষে ডফ্ কোম্পানির মুৎসুদ্দি পরম ভক্ত সুরেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ সুরেন্দর, এরা সব কেরাণী মেরাণী ছাপোষা লোক, এরা অত টাকা চাঁদায় তুলিতে কেমন করিয়া পারিবে, অতএব ভাড়ার টাকাটা সব তুমিই দিও।" সুরেন্দ্রনাথও করজোড়ে 'যাহা

* পেন্সনে না বলিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন 'পেন্সিলে খাইতেছি'।

আজ্ঞা' বলিয়া ঐরূপ করিতে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। ঐরূপে পরে আবার একদিন তিনি দুর্ব্বলতার জন্য গৃহের বাহিরে শৌচাদি করিতে যাওয়া শীঘ্র অসম্ভব হইবে আমাদিগকে বলিতেছিলেন। যুবক ভক্ত লাটু * ঐদিন তাঁহার ঐ কথায় ব্যথিত হইয়া সহসা করজোড়ে সরলগম্ভীর ভাবে "যে আজ্ঞা মশায়, হামি ত আপনকার মেস্তর (মেথর) হাজির আসি' বলিয়া তাঁহাকে ও আমাদিগকে দুঃখের ভিতরেও হাসাইয়াছিল। যাহা হউক ঐরূপে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক বিষয়ে ঠাকুর নিজ বন্দোবস্ত যথাযোগ্য ভাবে নিজেই করিয়া লইয়া ভক্তগণের সুবিধা করিয়া দিতেন।

ক্রমে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত হইতে লাগিল এবং যুবক ভক্তেরা সকলেই এখানে একে একে উপস্থিত হইল। ঠাকুরের সেবাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নরেন্দ্র তাহাদিগকে ধ্যান, ভজন, পাঠ, সদালাপ শাস্ত্রচর্চ্চা ইত্যাদিতে এমন ভাবে নিযুক্ত রাখিতে লাগিলেন যে, পরম আনন্দে কোথা দিয়া দিনের পর দিন যাইতে লাগিল তাহা তাহাদিগের বোধগম্য হইতে পারিল না। একদিকে ঠাকুরের শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব সখ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া তাহাদিগকে ললিত-কর্কশ এমন এক মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করিল যে এক পরিবার-মধ্যগত ব্যক্তিসকল অপেক্ষাও তাহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া সত্য সত্য জ্ঞান করিতে লাগিল। সুতরাং নিতান্ত আবশ্যকে কেহ কোন দিন বাটীতে ফিরিলেও ঐ দিন সন্ধ্যায় অথবা পরদিন প্রাতে তাহার এখানে আসা এককালে অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ঐরূপে শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া যাহারা সংসারত্যাগে সেবাব্রতের উদ্‌যাপন

* স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামে অধুনা ভক্তসংঘে সুপরিচিত। ইনি ছাপরা নিবাসী ছিলেন। বাঙ্গালা বুঝিতে সমর্থ হইলেও ঐ ভাষায় কথা কহিতে ইঁহার নানাপ্রকার বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়া বালকের কথার ন্যায় সুমিষ্ট শুনাইত।

করিয়াছিল সংখ্যায় তাহারা দ্বাদশ * জনের অধিক না হইলেও প্রত্যেকে গুরুগতপ্রাণ এবং অসামান্য কর্ম্মকুশল ছিল।

কাশীপুরে আসিবার কয়েক দিন মধ্যেই ঠাকুর একদিন উপর হইতে নীচে নামিয়া বাটীর চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্যানপথে অল্পক্ষণ পাদচারণ করিয়াছিলেন। নিত্য ঐরূপ করিতে পারিলে শীঘ্র সুস্থ ও সবল হইবেন ভাবিয়া ভক্তগণ উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু বাহিরের শীতল বায়ুস্পর্শে ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অন্য কারণে পরদিন অধিকতর দুর্ব্বল বোধ করায় কিছুদিন পর্য্যন্ত আর ঐরূপ করিতে পারেন নাই। শৈত্যের ভাবটা দুই তিন দিনেই কাটিয়া যাইল, কিন্তু দুর্ব্বলতা বোধ দূর না হওয়ায় ডাক্তারেরা তাঁহাকে কচি পাঁঠার মাংসের সুরুয়া খাইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। উহা ব্যবহারে কয়েক দিনেই পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বলতা অনেকটা হ্রাস হইয়া তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক একপক্ষ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলালও এই সময়ে একদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া ঐ বিষয় লক্ষ্য করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের স্বাস্থ্যের সংবাদ চিকিৎসককে প্রদান করিতে এবং পথ্যের জন্য মাংস আনিতে যুবক সেবকদিগকে নিত্য কালিকাতা যাইতে হইত। একজনের উপরে উক্ত দুই কার্য্যের ভার প্রথমে অর্পণ করা হইয়াছিল। তাহাতে প্রায়ই বিশেষ অসুবিধা হইতে

* পাঠকের কৌতূহল নিবারণের জন্য ঐ দ্বাদশ জনের নাম এখানে দেওয়া গেল। যথা, নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, গোপালদাদা (যুবক ভক্তদিগের মধ্যে ইনিই একমাত্র বৃদ্ধ ছিলেন), কালী, শশী, শরৎ এবং (ছুটকো) গোপাল। সারদা পিতার নির্য্যাতনে মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই একদিন মাত্র থাকিতে সমর্থ হইত। হরিশের কয়েক দিন আসিবার পরে গৃহে ফিরিয়া মস্তিষ্কের বিকার জন্মে। হরি, তুলসী ও গঙ্গাধর বাটীতে থাকিয়া তপস্যা ও মধ্যে মধ্যে আসা যাওয়া করিত তদ্ভিন্ন অন্য দুইজন অল্পদিন পরে মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বাটীতেই থাকিয়া গিয়াছিল।

দেখিয়া এখন হইতে নিয়ম করা হইয়াছিল, নিত্য প্রয়োজনীয় ঐ দুই কার্য্যের জন্য দুইজনকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। কলিকাতায় অন্য কোন প্রয়োজন থাকিলে ঐ দুইজন ভিন্ন অপর একব্যক্তি যাইবে। তদ্ভিন্ন বাটী ঘর পরিষ্কার রাখা, বরাহনগর হইতে নিত্য বাজার করিয়া আনা, দিবাভাগে ও রাত্রে ঠাকুরের নিকটে থাকিয়া তাঁহার আবশ্যকীয় সকল বিষয় করিয়া দেওয়া প্রভৃতি সকল কার্য্য পালাক্রমে যুবক ভক্তেরা সম্পাদন করিতে লাগিল—এবং নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগের প্রত্যেকের কার্য্যের তত্ত্বাবধানে এবং সহসা উপস্থিত বিষয়সকলের বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত রহিলেন।

ঠাকুরের পথ্য প্রস্তুত করিবার ভার কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর হস্তেই রহিল। সাধারণ পথ্য ভিন্ন বিশেষ কোন-রূপ খাদ্য ঠাকুরের জন্য ব্যবস্থা করিলে চিকিৎসকের নিকট হইতে উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া গোপালদাদা প্রমুখ দুই একজন, যাহাদের সহিত তিনি নিঃসঙ্কোচে বাক্যালাপ করিতেন তাহারা, যাইয়া তাঁহাকে উক্ত প্রণালীতে পাক করিতে বুঝাইয়া দিত। পথ্য প্রস্তুত করা ভিন্ন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে এবং সন্ধ্যার কিছু পরে ঠাকুর যাহা আহার করিতেন তাহা স্বয়ং লইয়া যাইয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়া আসিতেন। রন্ধনাদি সকল কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিতে এবং তাঁহার সঙ্গিনীর অভাব দূর করিবার জন্য ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীকে এই সময়ে আনাইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে রাখা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে যাঁহারা সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন সেই সকল স্ত্রীভক্তগণের কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত কয়েক ঘণ্টা হইতে কখন কখন দুই এক দিবস পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইতে লাগিলেন। ঐরূপে কিঞ্চিদধিক সপ্তাহকালের মধ্যেই সকল বিষয় সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

গৃহী ভক্তেরাও ঐ কালে নিশ্চিন্ত রহেন নাই। কিন্তু রামচন্দ্র অথবা গিরিশচন্দ্রের বাটীতে সুবিধামত সম্মিলিত হইয়া ঠাকুরের সেবায় কে কোন বিষয়ে কতটা অবসরকাল কাটাইতে এবং অর্থ-সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন তাহা স্থির করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। সকল মাসে সকলের সমভাবে সাহায্য প্রদান করা সুবিধাজনক না হইতে পারে ভাবিয়া তাঁহারা প্রতি মাসেই দুই একবার ঐরূপে একত্র মিলিত হইয়া সকল বিষয় পূর্ব্ব হইতে স্থির করিবার সংকল্পও এই সময়ে করিয়াছিলেন।

যুবক ভক্তদিগের অনেকেই সকল কার্য্যের শৃঙ্খলা না হওয়া পর্য্যন্ত নিজ নিজ বাটীতে স্বল্পকালের জন্যও গমন করে নাই। নিতান্ত আবশ্যকে যাহাদিগকে যাইতে হইয়াছিল তাহারা কয়েক ঘণ্টা বাদেই ফিরিয়াছিল এবং বাটীতে সংবাদটাও কোনরূপে দিয়াছিল যে, ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিতভাবে বাটীতে আসিতে ও থাকিতে পারিবে না। কাহারও অভিভাবক যে ঐ কথা জানিয়া প্রসন্নচিত্তে ঐ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেন নাই, ইহা বলিতে হইবে না। কিন্তু কি করিবেন, ছেলেদের মাথা বিগ্‌ড়াইয়াছে, ধীরে ধীরে তাহাদিগকে না ফিরাইলে হিত করিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা—এইরূপ ভাবিয়া তাহাদিগের ঐরূপ আচরণ কিছুদিন কোনরূপে সহ্য করিতে এবং তাহাদিগকে ফিরাইবার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত রহিলেন। ঐরূপে গৃহী এবং ব্রহ্মচারী ঠাকুরের উভয় প্রকারের ভক্ত সকলেই যখন একযোগে দৃঢ়নিষ্ঠায় সেবাব্রতে যোগদান করিল এবং সুবন্দোবস্ত হইয়া সকল কার্য্য যখন শৃঙ্খলার সহিত যন্ত্র-পরিচালিতের ন্যায় নিত্য সম্পাদিত হইতে লাগিল, তখন নরেন্দ্রনাথ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন এবং শীঘ্রই দুই একদিনের জন্য নিজ বাটীতে যাইবার সংকল্প করিলেন। রাত্রিকালে আমাদিগের সকলকে ঐ কথা জানাইয়া তিনি শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না। কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া পড়িলেন এবং গোপাল প্রমুখ আমাদিগের দুই একজনকে জাগ্রত দেখিয়া

বলিলেন, 'চল্, বাহিরে উদ্যানপথে পাদচারণ ও তামাকু সেবন করি।' বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরের যে ভীষণ ব্যাধি, তিনি দেহরক্ষার সংকল্প করিয়াছেন কিনা কে বলিতে পারে? সময় থাকিতে তাঁহার সেবা ও ধ্যান ভজন করিয়া যে যতটা পারিস্ আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া নে, নতুবা তিনি সরিয়া যাইলে পশ্চাত্তাপের অবধি থাকিবে না। এটা করিবার পরে ভগবান্‌কে ডাকিব, ওটা করা হইয়া যাইলে সাধন ভজনে লাগিব, এইরূপেই ত দিনগুলা যাইতেছে এবং বাসনাজালে জড়াইয়া পড়িতেছি। ঐ বাসনাতেই সর্ব্বনাশ, মৃত্যু— বাসনা ত্যাগ কর্, ত্যাগ কর্।"

পৌষের শীতের রাত্রি নীরবতায় ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। উপরে অনন্ত নীলিমা শত সহস্র নক্ষত্রচক্ষে ধরার দিকে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। নীচে সূর্য্যের প্রখর কিরণসম্পাতে উদ্যানের বৃক্ষতলসকল শুষ্ক এবং সম্প্রতি সুসংস্কৃত হওয়ায় উপবেশনযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। নরেন্দ্রের বৈরাগ্যপ্রবণ, ধ্যানপরায়ণ মন যেন বাহিরের ঐ নীরবতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইতে লাগিল। আর পাদচারণ না করিয়া তিনি এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তৃণপল্লব ও ভগ্ন বৃক্ষশাখা-সমূহের একটি শুষ্ক স্তূপ নিকটেই রহিয়াছে দেখিয়া বলিলেন, 'দে উহাতে অগ্নি লাগাইয়া, সাধুরা এই সময়ে বৃক্ষতলে ধুনি জ্বালাইয়া থাকে, আর আমরাও ঐরূপে ধুনি জ্বালাইয়া অন্তরের নিভৃত বাসনা সকল দগ্ধ করি'। অগ্নি প্রজ্বালিত হইল এবং চতুর্দ্দিকে অবস্থিত পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক ইন্ধনস্তূপসমূহ টানিয়া আনিয়া আমরা উহাতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অন্তরের বাসনাসমূহ হোম করিতেছি এই চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া অপূর্ব্ব উল্লাস অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল যেন সত্য সত্যই পার্থিব বাসনাসমূহ ভস্মীভূত হইয়া মন প্রসন্ন নির্ম্মল হইতেছে ও শ্রীভগবানের নিকটবর্ত্তী হইতেছি! ভাবিলাম তাই ত কেন পূর্ব্বে এইরূপ করি নাই, ইহাতে এত আনন্দ! এখন হইতে সুবিধা পাইলেই এইরূপে ধুনি জ্বালাইব। ঐরূপে দুই তিন ঘণ্টাকাল

কাটিবার পরে, যখন আর ইন্ধন পাওয়া গেল না তখন অগ্নিকে শান্ত করিয়া আমরা গৃহে ফিরিয়া পুনরায় শয়ন করিলাম। রাত্রি তখন ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। যাহারা আমাদিগের ঐ কার্য্যে যোগদান করিতে পারে নাই প্রভাতে উঠিয়া তাহারা যখন ঐ কথা শুনিল তখন তাহাদিগকে ডাকা হয় নাই বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ তাহাতে তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য বলিলেন, আমরা ত পূর্ব্ব হইতে অভিপ্রায় করিয়া ঐ কার্য্য করি নাই এবং এত আনন্দ পাইব তাহাও জানিতাম না, এখন হইতে অবসর পাইলেই সকলে মিলিয়া ধুনি জ্বালাইব, ভাবনা কি।'

পূর্ব্বকথামত প্রাতেই নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া যাইলেন এবং একদিন পরেই কয়েকখানি আইনপুস্তক লইয়া পুনরায় কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

জীব ও ঈশ্বরতত্ত্ব।

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

দেহাত্মবাদ।

এ সংসারে সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা সকলেই 'আমি' 'আমি' করিয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত, কিন্তু আমি যে কে তাহা আমরা কেহই ভাল করিয়া বুঝি না। আমাদের সকল ব্যবহারের মূল যে আমি, তাহার স্বরূপটা যে কি তাহা বুঝিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা আমাদের শতকরা নিরানব্বই জনের মনে দীর্ঘকালব্যাপী জীবনের মধ্যে একবারও উদিত হয় না; ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে?

দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, আমাদের এই আত্মবিস্মৃতি বা

আত্মভ্রান্তিই আমাদের সকল দুঃখের নিদান, এই ভ্রান্তি দূর করিতে পারিলেই আমাদের সকল দুঃখ মিটিয়া যায়। দার্শনিক পণ্ডিতের এই সিদ্ধান্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা তাহা লইয়া বিবাদ আবহমান কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু, তাই বলিয়া যে এই অহংতত্ত্বের বিচার একেবারে নিষ্ফল একথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না,—প্রত্যুত এই অহংতত্ত্বের বিচার দ্বারা আমরা প্রভূত লাভবান্ হইতে পারি, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান আছে, সে কথা পরে বলা যাইবে। এক্ষণে দেখা যাক, এই 'আমি কে' তাহা নিরূপণ করিতে যাইয়া ভারতের দার্শনিক পণ্ডিতগণ কে কি বলিয়াছেন। প্রবাদ আছে, দেবগুরু বৃহস্পতি এই আত্মতত্ত্ব-নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহাই চার্ব্বাক দর্শন নামে প্রথিত হইয়াছে। মহাভারতে চার্ব্বাক নামে একজন ঋষিরও খোঁজ পাওয়া যায়, তাঁহার মতই চার্ব্বাক মত, একথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। যাক সে কথা। সেই চার্ব্বাক মতটা কি এক্ষণে তাহাই দেখা যাক। চার্ব্বাক মতানুযায়ী দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে এই দেহই আমি—আমি বলিলে এ দেহটাই বুঝায়; জ্ঞানও এই দেহেরই ধর্ম্ম।

যেমন চূণ ও হলুদ এই দুইটী বস্তুর মধ্যে কাহারও ধর্ম্ম রক্ততা নহে, কিন্তু এই দুইটী বস্তু মিলিত হইলে রক্তবর্ণকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যে ভূমি, জল ও তেজঃ প্রভৃতিতে পৃথগ্ভাবে চৈতন্য বা জ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ গুণ নাই, সেই পৃথিবী, জল ও তেজঃ প্রভৃতি পরস্পর মিলিত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেহ জড়প্রকৃতি হইলে পরস্পর সংযোগ বিশেষের বলে যে জ্ঞানরূপ গুণের আশ্রয় হইবে তাহাতে বাধা কি? এই চার্ব্বাক দার্শনিকগণ জন্মান্তর মানেন না, পাপ বা পুণ্য বলিয়া কোন অদৃষ্টগুণও ইঁহারা স্বীকার করেন না, স্বর্গ বা নরক ইঁহাদের মতে গগনকুসুমের ন্যায় অলীক। তাই সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য্য ইঁহাদের মতের সারসঙ্কলন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"আত্মাস্তি দেহব্যতিরিক্তমূর্ত্তি-
র্ভোক্তা স লোকান্তরিতঃ ফলানাম্।
আশেয়মাকাশতরোঃ প্রসূনাৎ
প্রথীয়সঃ স্বাদুফলাভিসন্ধৌ॥"

"এই দেহ ব্যতীত একটী আত্মা আছে, সে আবার লোকান্তরে যাইয়া এইখানকার কর্ম্মফলের ভোক্তা হইবে—এই প্রকার আশা ঠিক গগনতরুর কুসুম হইতে উৎপন্ন যে ফল, তাহার ভোগের আশা ছাড়া আর কি হইতে পারে?"

ইঁহারা বলেন যাগ হোম সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যগুলি ব্রাহ্মণগণ নিজের প্রাধান্য ও ব্যবসায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া লোক ভুলাইবার জন্য সমাজে চালাইয়াছেন। এই সকল কার্য্য করিয়া বৃথা সময়ক্ষেপ করা পণ্ডিতের উচিত নহে—কিসে দেহ সুস্থ থাকে এবং সুস্থ দেহে প্রাণ ভরিয়া মনের মতন ভোগ করিতে পারা যায় তাহারই জন্য লোকের চেষ্টা করা উচিত।

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।"

যতদিন বাঁচিবে স্ফূর্ত্তিতে কাটাইবে, অন্ততঃ ধার করিয়াও ঘি খাইবে। এই দেহ পুড়িয়া ছাই হইবার পর আবার এই প্রকার দেহ কোথা হইতে মিলিবে?

ইহাই হইল চার্ব্বাক দর্শনের সার সংক্ষেপ চার্ব্বাক দর্শনের আর একটী নাম লোকায়ত মত। লোকে অর্থাৎ সাধারণ জনগণে যাহা আয়ত অর্থাৎ প্রচলিত তাহাই লোকায়ত। এক কথায় বলিতে গেলে লোকপ্রচলিত বা সর্ব্বসাধারণে অঙ্গীকৃত যে মত তাহাই চার্ব্বাক মত। এই দার্শনিকগণের আর একটী নাম স্বভাববাদী। সকল কার্য্যই স্বভাবের বশে উৎপন্ন হয় এই বলিয়াই ইঁহারা কার্য্যকারণতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই অনন্ত অসীম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এই বিচিত্র সৃষ্টি স্বভাববশেই হইয়া থাকে—সূক্ষ্মভাবে এই বিশ্বসৃষ্টির মূল অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, অনুসন্ধান

করিয়া এপর্য্যন্ত কেহ কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এই বিশ্ব-সৃষ্টির ভার স্বভাবের উপর সমর্পণ করিয়া সে বিষয়ে বৃথা মাথা না ঘামাইয়া দৃষ্ট ও পরিচিত উপায়গুলির দ্বারা নিজের ভোগ্য বস্তুর সংগ্রহ কর, আরামে বা স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটাইতে চেষ্টা কর, তোমার জন্ম সার্থক হইবে। পরলোক, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি কল্পিত বস্তুগুলিকে লইয়া মিছামিছি শুষ্ক তর্ক করিয়া কাল কাটান মূর্খতার পরিচয় ছাড়া আর কি হইতে পারে?—ইহাই হইল চার্ব্বাক মতে আত্মতত্ত্বের পরিচয়। এক্ষণে দেখা যাক এই প্রকার মত বাস্তব-পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ কিনা?

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এই মতটী যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন তাঁহারাই কি এই মতের উপর বিশ্বাস করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছেন? কখনই না। কেন তাহা বলি, এ সংসারে আমরা যে কয় দিন বাঁচিয়া থাকি সেই কয় দিনের জন্য আমি যে এক ব্যক্তি এই জ্ঞান না থাকিলে আমাদের দ্বারা যে কোন কার্য্যই সাধিত হয় না, ইহা কে অস্বীকার করিবে? আমার শৈশবে আমি বিদ্যার্জ্জন করি কিসের জন্য? যে আমি এখন শিশু সেই আমি যুবা হইয়া সেই বিদ্যার সাহায্যে নিজের ভালমন্দ বুঝিয়া সুখভোগ করিব বা ভাবী দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইব, এই প্রকার বুদ্ধি বা বিশ্বাস না থাকিলে আমি কখনই শৈশবে বিদ্যার্জ্জন করিতে উদ্যত হই না ইহা স্থির। আজ মাথা ঘামাইয়া—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আমি যে অর্থার্জ্জন করিয়াছি, সেই অর্থ জলের ন্যায় ব্যয় করিয়া এই যে আমি প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণ করিতে বদ্ধ-পরিকর হই, এত প্রয়াস অঙ্গীকার করি কেন? আমি বৃদ্ধাবস্থায় এই বাটীতে থাকিয়া আরামে দিন কাটাইব এই বিশ্বাসই ত ইহার মূলীভূত কারণ, কিন্তু চার্ব্বাক দর্শনের প্রসাদে আমার এই বিশ্বাস টিকে কৈ? চার্ব্বাক বলেন, দেহই আত্মা—দেহ কিন্তু বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত একই থাকে, ইহা ত কখন সম্ভবপর নহে। বাল্যকালের ক্ষুদ্র পরিমাণের দেহ আর যুবাবস্থার প্রকাণ্ড

পরিমাণ দেহ যে এক বস্তু নহে তাহা কি আর যুক্তি দিয়া বুঝাইতে হইবে ?—প্রত্যক্ষ প্রমাণই ত বলিয়া দিতেছে আমার দশম বৎসরের দেহ আর পঞ্চাশত্তম বৎসরের দেহ পরস্পর ভিন্ন, এক নহে।

এক হইবেই বা কিরূপে ? অবয়বের উপচয় বা অপচয় ঘটিলে অবয়বী যে পৃথক্ হয় তাহা ত সকলেরই জানা কথা। দেহের অবয়ব ত অন্ন ও রসের দ্বারা গঠিত হয়। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে অন্ন ও রস হইতে অবয়ব উৎপন্ন হইয়াছিল সে অবয়ব হইতে অদ্যকার ভুক্ত ও পীত অন্ন ও রস হইতে উৎপন্ন অবয়ব যে পৃথক্ তাহা কে অস্বীকার করিবে ? তাহাই যদি হইল, তবে দশ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী অবয়বসমূহ হইতে যে দেহরূপ অবয়বী উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই দেহ ও অদ্যকার নূতন অবয়বসমূহ হইতে উৎপন্ন এই নূতন দেহ কখনই এক দেহ হইতে পারে না, ইহা ত স্থিরই আছে। সুতরাং দেহ যদি আমি হই, তবে দশ বৎসরের পূর্ব্বের আমি, আর অদ্যকার আমি, নিশ্চিতই এক ব্যক্তি নহে, অথচ আমার বিশ্বাস দশ বৎসর পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম এখনও সেই আমিই রহিয়াছি এবং দশ বৎসর পরেও সেই আমি থাকিব—এই বিশ্বাসই আমাদের সকলের সংসার-যাত্রার প্রধানতম অবলম্বন। এই বিশ্বাস কিন্তু চার্ব্বাক দর্শনকে সত্য বলিয়া মানিলে ভ্রান্তিমূলক হইয়া উঠে। ভ্রান্তিকে যদি আমরা ভ্রান্তি বলিয়া বুঝি তাহা হইলে তাহার বশে আমাদের কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি হয় না, অথচ আমরা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এই ব্যবহার রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকি—এই বিশ্বাসকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া আমরা কেহই স্বীকার করি না। তাই বলিতেছিলাম, দেহকে কেহই আমরা আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করি না। এইরূপ বিশ্বাসই যদি করিতাম, তাহা হইলে, কেহই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য এত করিয়া ভূতের বেগার খাটিয়া মরিতাম না, সুতরাং সিদ্ধ হইল যে, দেহ আমি নহি, কিন্তু দেহ হইতে আমি ভিন্ন—দেহ আমার হইতে পারে আমি কিন্তু কিছুতেই দেহ হইতে পারি না। তাহাই যদি হইল, তবে সেই দেহ হইতে

ভিন্ন আমি কে? দেখা যাক, এইবার ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ববাদী আর একপ্রকার চার্ব্বাক দার্শনিকগণ এই বিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চাহেন।

ইন্দ্রিয়াত্মবাদ।

ইন্দ্রিয় দুই প্রকার -জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা আমরা গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ প্রকার বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করি, তাহাদের নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার যথা—ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্ ও শ্রবণ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়।

ইন্দ্রিয়ই আমাদের আত্মা এই মতাবলম্বী দার্শনিকগণ বলেন যে, উক্ত দুই প্রকার ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় কয়টীকে আত্মা বলা যায়, অর্থাৎ চক্ষুঃ, কর্ণ, ঘ্রাণ, রসনা ও শ্রোত্র এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ই আমাদের আত্মা। এই কয়টী ইন্দ্রিয় হইতেই আমাদের রূপরসাদির জ্ঞান হইয়া থাকে। সেই রূপরসাদির জ্ঞান এই ইন্দ্রিয় কয়টীরই ধর্ম্ম অর্থাৎ রূপজ্ঞান চক্ষুর ধর্ম্ম, রসজ্ঞান রসনার ধর্ম্ম, শব্দজ্ঞান শ্রবণের ধর্ম্ম, গন্ধজ্ঞান ঘ্রাণের ধর্ম্ম ও স্পর্শজ্ঞান ত্বগিন্দ্রেয়ের ধর্ম্ম। তাহার পর এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় ছাড়া আমাদের আর একটী ইন্দ্রিয় আছে তাহার নাম মন বা অন্তরিন্দ্রিয়। এই অন্তরিন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা আমাদের সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা ও দ্বেষ প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ হয়। সেই সুখ ও দুঃখ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ এই মনেরই ধর্ম্ম, সুখ দুঃখ প্রভৃতিও মনের ধর্ম্ম, সুতরাং মনও সুখদুঃখাদির আশ্রয় ও সুখদুঃখাদি বিষয়ক জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া তাহাকেও আত্মা বলিতে হইবে। ফলে দাড়াইল যে চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটী বহিরিন্দ্রিয় এবং মন অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় এই ছয়টী ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়া আত্মপদের অভিধেয় হয়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে এইরূপ ইন্দ্রিয়াত্মবাদ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ কিনা? ইন্দ্রিয়সমূহের আত্মত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন না তাঁহারা বলেন, ইন্দ্রিয়সমূহের আত্মত্ব স্বীকার করিলে কতকগুলি

দোষ আসিয়া পড়ে। প্রথম দোষ এই যে ইন্দ্রিয়গুলি অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অবিষয়; আমি কিন্তু আমার নিকটে প্রত্যক্ষ বিষয়, তাহাই যদি হইল তবে ইন্দ্রিয় আমার আত্মা কি প্রকারে হইবে? অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ আত্মা কি প্রকারে হইবে। যদি বল যাহারা ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া মানে তাহাদের মতে ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয় নহে—ইন্দ্রিয় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় না হইলেও মনের দ্বারা তাহাদের প্রত্যক্ষ হয়—ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, আত্মার প্রত্যক্ষ আত্মারই হইয়া থাকে ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ কিন্তু এ স্থলে সে সিদ্ধান্ত টিকিল না—কারণ চক্ষুঃ প্রভৃতি আত্মার প্রত্যক্ষ চক্ষুরাদি দ্বারা হইল না, তাহাদের প্রত্যক্ষ তোমাদের মতে মনের দ্বারাই হয়; আর মনোরূপ আত্মার প্রত্যক্ষ মনের দ্বারাই হয়। তাহাই যদি হইল তবে দাঁড়াইল এই যে আমাদের পাঁচটী আত্মা অপর একটী আত্মার প্রত্যক্ষ দ্বারা, আর মনোরূপ আত্মাটী তাহার নিজ প্রত্যক্ষ দ্বারা সিদ্ধ হয়—সুতরাং এই প্রকার বৈষম্য এইরূপ ইন্দ্রিয়াত্মবাদে দুষ্পরিহরণীয় হইয়া পড়ে। এই প্রকার ইন্দ্রিয়াত্ম-বাদের আরও দোষ এই যে, এই মতে যাহার চক্ষুঃ নষ্ট হইয়াছে তাহার রূপের স্মরণ হইতে পারে না। কারণ, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ যে, যে রূপ দেখে তাহারই সেই দৃষ্টরূপের স্মৃতি হয়, যে রূপ কখনও দেখে নাই তাহার কখনই রূপের স্মরণ হয় না—এই নিয়ম দেখিয়া আমরা কল্পনা করিতে সমর্থ হই যে যাহাতে রূপজ্ঞান হয় তাহাতেই রূপজ্ঞানের সংস্কার বা তাহার সূক্ষ্মাবস্থা থাকিয়া যায়। সময়বিশেষে সেই সংস্কার কোন কারণবিশেষ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলে তাহাতেই স্মৃতির উৎপত্তি হয়। সকলকেই বাধ্য হইয়া এই প্রকার অনুভব ও স্মৃতির একটী আশ্রয় কল্পনা করিতে হয়। এখন দেখ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদীর মতানুসারে চক্ষুর ধর্ম্ম রূপ প্রত্যক্ষ সুতরাং রূপের স্মৃতিও চক্ষুরই ধর্ম্ম হওয়া উচিত। চক্ষুঃ যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহার সঙ্গে রূপ প্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন যে রূপসংস্কার তাহাও নষ্ট হইতে বাধ্য। কারণ, আশ্রয় নষ্ট হইলে আশ্রিত ধর্ম্মের নাশ অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং যে ব্যক্তির চক্ষুঃ নষ্ট হইয়াছে তাহার রূপ স্মরণের কারণ যে রূপবিষয়ক সংস্কার তাহাও নষ্ট হইয়াছে ; আর তাহাই যদি হইল তবে তাহার পক্ষে আর রূপস্মৃতি সম্ভবপর নহে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কাহারও চক্ষুঃ নষ্ট হইলেও সে যে তাহার পূর্ব্বানুভূত রূপের স্মরণ করিয়া থাকে ইহা কে অস্বীকার করিবে ? সুতরাং এইপ্রকার আপত্তি অখণ্ডনীয় হওয়ায় বলিতে হইবে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই যে আমাদের আত্মা এই মতটী কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারিল না। এই আপত্তির পরিহার করিতে যাইয়া যদি ইন্দ্রিয়াত্মবাদী বলেন—আচ্ছা, বহিরিন্দ্রিয় আমাদের আত্মা নাই হইল, অন্তরিন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে ত এই দোষ পরিহৃত হইতে পারে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে রূপাদিবিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেই প্রত্যক্ষ চক্ষুর ধর্ম্ম নহে, কিন্তু তাহা মনেরই ধর্ম্ম, অর্থাৎ মনেই আমাদের রূপাদিবিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, মনেই রূপাদিবিষয়ের সংস্কার জন্মে এবং সময়বিশেষে নির্দ্দিষ্ট কারণবশতঃ সেই মনেই রূপের স্মরণ হইয়া থাকে। এইরূপই যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে যাহার চক্ষুঃ নষ্ট হইয়াছে তাহার রূপের স্মরণ হইতে কোন বাধা রহিল না—মন ত তাহার নষ্ট হয় নাই।

এই প্রকার যুক্তির সাহায্যে মনের আত্মত্ব যাঁহারা স্থাপন করিতে চাহেন, তাঁহাদের মতও নির্দ্দোষ হইতে পারে না। কারণ, এই মতের প্রথম দোষ এই যে, এই ভাবে মনকে আত্মা বলিলে আমাদের নিকটে আমাদের আত্মা বা তদ্গত জ্ঞানাদিধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আমরা কিন্তু আমাদের আত্মাকে আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকি, এবং আত্মগত জ্ঞান, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি ধর্ম্মেরও আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, ইহাও আমাদের অভ্যুপগত সিদ্ধান্ত। কিন্তু মনকে যদি আমাদের আত্মা বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বানুভবসিদ্ধ এই আত্মপ্রত্যক্ষ এবং আত্ম-জ্ঞানসুখাদিরূপ ধর্ম্মসমূহের প্রত্যক্ষ কিছুতেই সম্ভবপর হয় না,—

যদি বল কেন তাহা সম্ভবপর হয় না, তাহার উত্তর এই যে, মন যেহেতু অণুপরিমাণ সেই জন্যই মনের বা মনোগত ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যে বস্তু অণুপরিমাণ তাহার বা তদ্গত ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। পার্থিব পরমাণু আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে ইহা ত সকলেই স্বীকার করেন। যেহেতু পার্থিব পরমাণু মহত্বরূপ গুণের আশ্রয় নহে সেই কারণেই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, পার্থিব পরমাণুর রূপও আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, কারণ, সেই রূপ প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় হইলেও যেহেতু তাহার আশ্রয় মহৎ নহে সেই হেতু তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নহে। যদি বল, মনকে অণুপরিমাণ বলিয়া কেন মানিব? প্রত্যক্ষের অনুরোধে মনকে না হয় অণুপরিমাণ বলিয়া নাই মানিলাম; যতটা মহত্ত্ব থাকিলে বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতে পারে মনের ততটা মহত্ত্বই অঙ্গীকার করা যাক্, তাহা হইলেই ত উক্ত আপত্তি খণ্ডিত হইতে পারে। মনের আত্মত্ব ব্যবস্থাপন করিতে যাঁহারা চাহেন তাঁহাদের এই প্রকার উক্তিও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কেন তাহা বলি—

এই যে মন বলিয়া একটী অন্তরিন্দ্রিয় আছে আমরা স্বীকার করি, বল দেখি তাহাতে প্রমাণ কি? প্রত্যক্ষ না অনুমান? প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা ইহার সত্তা সিদ্ধ হইতে পারে না কারণ রূপাদি বিষয়ের ন্যায় মনকে আমরা কেহই চক্ষুঃ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। মন যদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয় হইত, তাহা হইলে গৌতম প্রভৃতি বড় বড় দার্শনিক আচার্য্যগণ মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য অনুমানরূপ প্রমাণের উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, মন সিদ্ধ করিতে হইলে অনুমানাদিরূপ পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে সেই অনুমান কিরূপ হইবে? এই যে আমরা দেখিতে পাই, সময় বিশেষে কোন রূপাদি বিষয়ের সহিত আমাদের চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ আছে অথচ

সেই বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হইল না—ইহা দ্বারা আমরা বুঝি যে, রূপের প্রত্যক্ষ করিতে হইলে চক্ষুঃই আমার পর্য্যাপ্ত কারণ নহে। তাহা যদি হইত, তবে যখনই যে রূপের সহিত আমার চক্ষুর সম্বন্ধ হয়, তখনই সেই রূপের জ্ঞান আমার চক্ষুর দ্বারা হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা হয় না। এই কারণে বলিতে হইবে চক্ষুর দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ করিতে হইলে চক্ষু ছাড়া আর একটী চক্ষুর সহকারী কারণ আছে, সেই কারণটী যদি চক্ষুর সাহায্য করে, তবেই চক্ষুঃ রূপজ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ হয়, নচেৎ নহে। এইরূপ অনুমানের সাহায্যে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহকারী যে কারণ আছে বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়, সেই কারণ বিশেষকেই দার্শনিকগণ মন বা অন্তরিন্দ্রিয় বলিয়া থাকেন। যদি বল এইরূপ অনুমানের সাহায্যে মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল, কিন্তু, সেই মন যে অণুপরিমাণ বা মহৎ তাহা ত ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে না। এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব যে ইহা দ্বারা সাক্ষাৎভাবে মনের কিরূপ পরিমাণ হওয়া আবশ্যক তাহা সিদ্ধ না হইলেও পরম্পরায় এই অনুমান দ্বারাই বুঝিতে হইবে যে সে মন অণুপরিমাণই হওয়া উচিত। কেন তাহার পরিমাণ মহৎ হইতে পারে না, তাহাও বলিতেছি।

(ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান।*

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

"Truth does not pay homage to any Society ancient or modern; Society has to pay homage to Truth or die."
Swami Vivekananda.

জড়বিজ্ঞানের সহায়তায় কতকগুলি আধিভৌতিক শক্তি আয়ত্ত করিয়া ক্ষমতামদগর্ব্বিত অষ্টাদশ শতাব্দীর মানব মাৎসর্য্যের অন্ধত্বে চৈতন্যসত্তাকে অস্বীকার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। অভিনব জড়োপাসনায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া ঐন্দ্রিয়িক সুখভোগকেই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা জগতে প্রচার করিয়াছিল। জড়বিজ্ঞানের ক্ষিপ্র উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের বহির্মুখ মন অন্তর্জগতের প্রতি ক্ষণকালের জন্যও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার অবসর পায় নাই। এ যুগের অগ্রদূতগণ যখন "আমি ও আমার" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বার্থের অনুসন্ধানে সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন, তখন সমস্ত বিশ্বে একটা বিক্ষোভময় চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই স্বার্থ দ্বন্দ্বের প্রচণ্ড ঘাতপ্রতিঘাতে বহু রাষ্ট্রবিপ্লব অত্যাচার অবিচারের মধ্য দিয়া মানব সমাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বারদেশে আসিয়া যখন উপস্থিত, তখন ঝটিকাবসানে মথিত সমুদ্রের মত সমস্ত পৃথিবীর বক্ষে একটা ত্রস্ত শান্তি একটা উদ্বিগ্ন আশঙ্কা!

এক শতাব্দী ধরিয়া স্বাধিকারপ্রমত্ত ইউরোপ ক্ষমতার মদিরা পান করিয়াছে। এখন তাহার শিরায় শিরায় মত্ততার পুলকনর্ত্তন! তাই আমরা দেখিতে পাই সে উন্মত্ত অর্দ্ধবিক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জগৎবিজয়ে বহির্গত!

---

* বিগত ৩রা শ্রাবণ থিয়জফিক্যাল সোসাইটী হলে "বিবেকানন্দ সোসাইটীর" সাপ্তাহিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

পাশ্চাত্যজগতের শতাব্দীব্যাপী গঠনের নামে এই ধ্বংসের চেষ্টা; ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই জ্ঞানী ও মনীষিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। গ্রীস ও রোমের দর্শন, কাব্য, নীতি ও সভ্যতার সহিত ভগবান্ যীশুখৃষ্টের অপূর্ব্ব প্রেমের ধর্ম্ম সম্মিলিত হইয়া যে মহান্ আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল নব্য ইউরোপ তাহা পদদলিত করিয়াছে,— বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া সে আত্মার রাজ্যকে উচ্চকণ্ঠে অস্বীকার করিয়াছে! মানুষ হইয়া মানুষকে দৈহিক শক্তিতে নিষ্পেষিত করিয়া দ্বিধাহীনচিত্তে তাহার উষ্ণ শোণিত পান করিতেছে! সভ্যতার নামে উচ্ছৃঙ্খল বিলাস, স্বাধীনতার নামে ব্যক্তিগত অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচার, জাতীয়তার নামে পরস্বলোলুপতা, ধর্ম্মের নামে ভণ্ড পাদ্রীগণের পরধর্ম্মের প্রতি অযথা আক্রমণ, দর্শন-চর্চ্চার নামে নাস্তিক্যবাদ-প্রচার! নব্য ইউরোপের জ্ঞানিগণ এই উচ্ছৃঙ্খল জাতীয় জীবনের বহুমুখী চেষ্টার উদ্দেশ্যহীন উদ্যম দেখিয়া ভীত হইলেন। এই দুর্দ্ধর্ষ জাতির সম্মুখে একটা উন্নততর আদর্শ স্থাপন করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়া তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের এই ব্যাকুলতা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির মধ্যে প্রশ্নপূর্ণ সমস্যার আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। এ অভিনব আদর্শের জন্য তাঁহারা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন? রোম ও গ্রীসের সভ্যতা ভাণ্ডারে দিবার যাহা ছিল সে তাহা দিয়াছে—তাহাদের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার সমগ্র মধ্যযুগ ধরিয়া ইউরোপ লুটিয়া লইয়াছে। সে নিঃশেষিত ভাণ্ডের বিরাট শূন্যতা দিয়া জাতির পিপাসা দূর করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। কোথায় এই আদর্শ পাওয়া যাইবে? কোথায় সে আদর্শ যাহা সমগ্র বিশ্বমানবকে এক অখণ্ড প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিবে, অথচ কাহারও জাতিগত ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ অথবা অসম্পূর্ণ করিবে না?

আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের পরপারে ইউরোপের দৈহিক ও মানসিক বংশধর এক নব্যজাতি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই আদর্শ অনুসন্ধান করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। চিকাগো মহাপ্রদর্শনীর

অঙ্গীয় এক বিরাট্ ধর্ম্মসভায় তাঁহারা পৃথিবীর জাতিসমূহকে স্ব স্ব আদর্শ স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য আগ্রহসহকারে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রত্যেক জাতির মধ্য হইতে যোগ্যতম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া ধর্ম্মমহাসভায় প্রেরিত হইল

মহাসমারোহে বিশ্বসভার উদ্বোধন হইল—প্রতিনিধিবর্গ মানব-মিলন যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিবার জন্য স্ব স্ব সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করিয়া হবিঃহস্তে দণ্ডায়মান—এ মহাযজ্ঞের পুরোহিত কে? জগৎ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল এক তরুণ সন্ন্যাসী গৈরিকউষ্ণীষ-মণ্ডিত শির ঊর্দ্ধে তুলিয়া গৌরব গর্ব্বে দণ্ডায়মান!

মহিমময় মূর্ত্তি, গৈরিকবসনভূষিত, চিকাগো সহরের ধূমমলিন ধূসরবক্ষে ভারতীয় সূর্য্যের মত ভাস্বর, মর্ম্মভেদী দৃষ্টিপূর্ণ চক্ষু, চঞ্চল ওষ্ঠাধর, মনোহর অঙ্গভঙ্গী, স্বীয় স্বাতন্ত্র্য-গৌরবে-সমুন্নত-শির স্বামী বিবেকানন্দ!

সমগ্র জগৎসভা মন্ত্রমুগ্ধবৎ উৎকর্ণ হইয়া বিংশ শতাব্দীর সমন্বয়ের বার্ত্তা শ্রবণ করিল:—

"সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি এবং তৎপ্রসূত ধর্ম্মোন্মত্ততা (fanaticism) বহুদিন হইতে এই সুন্দর পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ইহারা পাশবিক অত্যাচারে বহুবার নররক্তে ধরিত্রী প্লাবিত করিয়াছে—সভ্যতা বিনষ্ট করিয়া সমগ্র জাতিকে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছে। এই সমস্ত পাশবিক ভাবনিচয়ের উদ্ভব না হইলে আজিকার মানবসমাজ এতদপেক্ষা বহুগুণে উন্নত হইতে সমর্থ হইত। কিন্তু সময় আসিয়াছে। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আশা করি, ধর্ম্মমহাসভার সম্মানার্থে অদ্যকার প্রভাতের এই ঘণ্টাধ্বনি সমস্ত ধর্ম্মোন্মত্ততার মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিবে এবং একলক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর বিভিন্ন মতাবলম্বী ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন মানবসম্প্রদায়ের অসি ও মসী যুদ্ধের অত্যাচারের শেষ হইবে।"

"Upon the banner of every religion will soon be written in spite of their resistance. 'Help and not

fight,' 'Assimilation and not Destruction,' "Harmony and Peace and not Dessension." ইহাই নবযুগের সম্মুখে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম ঘোষণা! বিশ্ব সভ্যতাভাণ্ডারে ভারতবর্ষ তাহার যুগ যুগ সঞ্চিত অমূল্য রত্নরাশি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছে, এই বার্ত্তা ঘোষণা করিবার ভার স্বামী বিবেকানন্দের উপর অর্পিত হইয়াছিল। দ্রুত উন্নতিশীল উদ্ধত পাশ্চাত্যজগতে ভারতমাতা তাঁহার যোগ্যতম সন্তানকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়া গৌরবান্বিতা হইয়াছিলেন। এই দূত তাঁহার পুণ্য জন্মভূমির গৌরবকাহিনী বিস্মৃত না হইয়া পৃথিবীর মিলনপ্রয়াসী জাতিসমূহকে অদ্বৈত অনুভূতির অভ্রভেদী গিরিশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জলদগম্ভীরস্বরে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে যে ভয়াবহ দৃশ্যের অভিনয় হইয়া গেল, সেই মহাবিপ্লবের অবসানে আজ জড়বিজ্ঞানের অবিবেকী দম্ভ চূর্ণ হইয়াছে। অন্তরের দৈন্য ও বেদনা ঢাকিয়া যিনি বাহিরে যত আস্ফালনই করুন না কেন আজ সকলকেই নিঃস্ব ভিক্ষুকের মত ভারতের দ্বারে নবীন আদর্শের জন্য হাত পাতিয়া দাঁড়াইতে হইবে—সেই বীর সন্ন্যাসীর অবিনশ্বর আহ্বানবাণী সত্য সত্যই তাহাদের "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে।" এইবার অকাতরে দান করিতে হইবে—এই বুভুক্ষু, দরিদ্র, পদদলিত জাতিকে দাতার আসন গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা শ্রীভগবানের ইচ্ছা।

এই মহাকার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া সে দায়িত্বভার বাঙ্গালী যুবকগণের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ, আমার দেশের যুবকগণের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় অতীত দশ বর্ষ ধরিয়া সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি। তাহাতে আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের

ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ হইবে, যাহাতে ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয় বলিতেছি, এই হৃদয়বলে উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর হইতেই শত শত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য সকল প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত, এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবে। তোমাদের সম্মুখে এই মহান্ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আমি ত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই, তোমাদিগকেই সব করিতে হইবে।"

আজ এই নবযুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী যুবক আমরা শ্রদ্ধার সহিত একবার কি ভাবিয়া দেখিব না যে বীর সন্ন্যাসীর সে পরিপূর্ণ উদাত্ত আহ্বান আমরা গৌরবানুভূতি-পুলকিত হৃদয়ে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছি কিনা? যদি এখনও না পারিয়া থাকি তাহা হইলেই বা লজ্জা কি? হয়তো আমরা অনেকে চেষ্টা করিয়াছি, এখনও পরাজয় নির্য্যাতন বাধাবিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তবে কেন বলিব যে তাঁহার আহ্বান বিফল হইয়া গিয়াছে। জনকতক উচ্ছৃঙ্খল যুবকের জঘন্য বিলাস, বিজাতীয় আচার ব্যবহারের প্রতি অন্ধ অনুরাগ, হেয়ভাবে জীবনযাপন প্রণালী দেখিয়া কেন বলিব যে সমগ্র যুবকসমাজ হীনতার কলুষপঙ্কে আবক্ষ নিমজ্জমান? যাঁহারা উদীয়মান জাতীয় নির্ম্মল ললাটে এই সব কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে আমাদের বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির চক্ষে প্রথম সূর্য্যকিরণ বেদনাময়ই বটে।

কথায় কথা উঠিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ নাকি আমাদের বুঝিবার ভুলে সর্ব্বথা বিফল হইতে বসিয়াছে! আমরা নাকি কাজের কথাকে কথার কথা করিয়া কেবলমাত্র নির্লজ্জ আস্ফালন সহায়ে দৈন্যের পরিচয় দিতেছি। কথাটা সত্য কি? সত্যই কি স্বামিজীর প্রাণময় আহ্বান আমাদের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎকম্প প্রবাহিত করিয়া নবীন আশায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে নাই?

সত্য হউক মিথ্যা হউক, আমরা কি একবার চিন্তা করিয়া দেখিব না—বিবেকানন্দের নিকট দায়স্বরূপ আমরা কি কর্ম্মভার প্রাপ্ত হইয়াছি? সমগ্র জাতি কিসের আশায় আমাদের মুখ চাহিয়া আছে?

জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সভ্যতার ক্রোড়ে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যুগে যুগে কত কত বিচিত্র পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া—কত বাধা বিপত্তির বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করিয়া—কত অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় নিষ্পীড়ন সহ্য করিয়া আজ বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি। মানবসভ্যতার দ্বিতীয় যুগে যখন ভারতীয় আধ্যাত্মিক সভ্যতা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত কিরণ দিতেছিল, তখন ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বকোণে আর এক দিব্যপ্রতিভাশালী, শক্তিমান্ জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল—আজ তাহারা কোথায়? তাহাদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আর এক মহাজাতি বিধাতার মঙ্গলাশীষ মস্তকে ধারণ করিয়া সমগ্র ইউরোপে সভ্যতা প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। এ জাতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রোমকগণ। আজ তাঁহারাই বা কোথায়? কালচক্রের বিবর্ত্তনে এইরূপ আরও কত ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতি তাহাদের ক্ষণিক অভিনয় সমাপ্ত করিয়া বিশ্বরঙ্গমঞ্চ হইতে চিরদিনের মত সরিয়া পড়িয়াছে। আছে কেবল এক মহিমময় ইতিবৃত্ত—অতীতের অন্ধকারে আপনাকে আবৃত করিয়া ধ্বংসাবশেষের উপর অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে! কিন্তু এই সনাতন হিন্দুজাতি, এই চিরসহিষ্ণু ধর্ম্মপ্রাণ জাতি আজও যখন ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই তখন বুঝিতে হইবে এখনও ইহার অনেক কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে। তাই আমরা অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, যখনই আমরা জাতীয় জীবনের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া বিপথে চলিবার জন্য প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছি, তখনই শ্রীভগবানের প্রতিনিধিরূপে মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হইয়া জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন—আশার বাণী শুনাইয়াছেন!

ভারতের অতীত ইতিহাসের যাহা কিছু গৌরবময় উপাদান—যাহা লইয়া চেষ্টা করিলে আজও এই অধঃপতিত জাতি বিশ্বের

জাতিসমাজে শ্রেষ্ঠতম আসন গ্রহণ করিতে পারে—সে সমস্তই এই সকল মহাপুরুষগণের দান। ইঁহাদিগের কল্যাণময় আত্মোৎসর্গই শত শত শতাব্দী ধরিয়া জাতীয় জীবনীশক্তিকে অব্যাহত ও ক্রীয়াশীল করিয়া রাখিয়াছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার শ্রীবৃন্দাবন নদীয়া নগরে একদিন শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইতে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বন্যা ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে বাঙ্গালীর হৃদয় প্লাবিত করিয়া বৈকুণ্ঠের পথে উজান বহিয়াছিল। সে প্লাবনের ধারায় বাঙ্গালী জীবনের অনেক আবর্জ্জনা ধৌত হইয়া গিয়াছিল—বাঙ্গালীর প্রেমের ধর্ম্ম সেদিন বিপুল আবেগে বরবাহু বিস্তার করিয়া অস্পৃশ্য চণ্ডাল, এমন কি, মুসলমানকেও আলিঙ্গন করিয়াছিল। আচার, নিয়ম ও জাতিভেদের কঠোর গণ্ডীর মধ্যেও এ যে একটা কত বড় সংস্কার তাহা আধুনিক বিশ্বপ্রেমিক "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী" সংস্কারকগণ কল্পনাতেও আনিতে পারিবেন না। বাঙ্গালীর জীবনে সে এক জাগরণের যুগ! বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন-নিশার তিমিরাবগুণ্ঠনের অন্তরালে অনার্য্য বর্ব্বরজাতিসমূহের নিকট দায়স্বরূপ প্রাপ্ত যে সমস্ত জঘন্য পৈশাচিক আচার লুক্কায়িত ছিল, এই জাগরণে তাহা সমূলে ধ্বংস না হউক, আর জাতীয় জীবনের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু কালক্রমে অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া এই অপূর্ব্ব প্রেমোচ্ছ্বাস অসার ভাবোচ্ছ্বাসে পরিণত হইল। কামের উৎকট মোহ প্রেমের ধর্ম্মকে অল্পে অল্পে বিকৃত করিয়া তুলিল! সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী-জীবনে এই আদিরসের প্রভাব যে কতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল ইতিহাস ও সাহিত্য তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

একটা স্থবির মুমূর্ষু জাতি যেন স্তব্ধ জড়ত্বের উপর জরাগ্রস্ত দেহভার নিক্ষেপ করিয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে—ভারতের, বাঙ্গালার যখন প্রায় এইরূপ অবস্থা—চারিদিকে বিশৃঙ্খল চাঞ্চল্য অসহায় চেষ্টা, তখন ভারতরঙ্গমঞ্চে বৈশ্যশক্তির নূতন অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল। ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে

এক নবীন সভ্যতার দৃপ্ত সংঘাতে আমাদের বহুদিনের অভ্যস্ত তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, পাশ্চাত্য সভ্যতার খরবিদ্যুতালোকে প্রতিহত চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম যে আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে যেমন করিয়া হউক এ জাতির সমকক্ষ হইতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া তাহা সম্ভবে? আমরা শুনিলাম যে, আমরা অসভ্য, অভিশপ্ত মানবজাতি, আমাদের সমাজ জঘন্য পৈশাচিকতা, আমাদের ধর্ম্ম অন্ধ কুসংস্কার! পাশ্চাত্য শিক্ষার নব উন্মাদনায় ফরাসীবিপ্লবসমুদ্রমথিত হলাহল পান করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা যে চপলতার পরিচয় দিয়াছি, তাহা এক আত্মবিস্মৃত জাতির ব্যর্থপ্রয়াসের লজ্জাকর ইতিহাস।

সত্যই সেদিন আমাদের অধঃপতনের চরম সীমা, যেদিন আমরা আত্মদৌর্ব্বল্য প্রকট করিয়া অসংযতভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিলাম একটা সংস্কারের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের প্রেরণায় আমরা প্রথমেই জাতীয় স্বভাবানুযায়ী ধর্ম্মসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। মহামনীষী রাজা রামমোহন এ কার্য্যের প্রথম প্রবর্ত্তক। এই মহাপুরুষ আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যেই মুক্তির পথ—উন্নতির পথ অন্বেষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় রামমোহনের উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে না পারিয়া বা ভুল করিয়া বুঝিয়া এই সংস্কার কার্য্যকে এমনভাবে পরিচালিত করিলাম যে ত্রিংশবর্ষ যাইতে না যাইতে উহার উদ্দেশ্য দাঁড়াইল—স্বধর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণা, স্বসমাজের প্রতি প্রবল ঘৃণা, স্বজাতির মস্তকে অগ্নিময় অভিশাপ বর্ষণ—অপর দিকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ, অযথা স্তুতিবাদ ও যেন-তেন-প্রকারেণ গৌরাঙ্গের ছন্দানুবর্ত্তন!

এইরূপে "উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন আমরা সংস্কারের আবর্ত্তে পড়িয়া কোন্ পথে যাইব বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, পাশ্চাত্যের প্রখর বিদ্যুতের আলোকে যখন আমাদের চক্ষু প্রতিহত হইতেছিল, সমগ্র জাতির যখন প্রায় দিগ্‌ভ্রম হইবার উপক্রম, জাতির

সম্মুখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, সন্দেহের পর সন্দেহ যখন ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, বিজাতীয় পথে স্বজাতির সংস্কাররথ যখন আর চলিতে না পারিয়া প্রায় থামিয়া যাইতেছিল, দীর্ঘ এক শতাব্দীর সংস্কারফল চিন্তা করিয়া যখন আমরা একরূপ হতাশভাবে বসিয়া পড়িতেছিলাম, কি করিব ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই—তখন সেই সংস্কারের ঝড়ে আলোড়িত ও মথিত বাঙ্গালী সমাজের জঠর হইতে আবির্ভূত হইলেন—স্বামী বিবেকানন্দ!" *

সত্যই সেদিন নবযুগের প্রথম প্রভাত—যেদিন দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে সর্ব্বত্যাগী শ্রীনরেন্দ্রনাথ আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। প্রাচীন ও নবীনের সেই অপূর্ব্ব মিলনের ফলস্বরূপ নব্যভারতের আদর্শ বিবেকানন্দরূপে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিল। বিগত শতাব্দীর সংস্কারযুগের অন্তে এক প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয় যুগের (Synthetic reactionary movement) সূচনা করিয়া দিয়া তিনি সংস্কারকগণকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন— "মূর্খ অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহচর্ম্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?"

সংস্কারযুগের ধ্বংসনীতিমূলক কার্য্যপ্রণালীর প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর যাবতীয় সংস্কারপ্রস্তাব ও উদ্যমের মধ্যে তিনি কতকগুলি মারাত্মক ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাইয়াছিলেন। সংস্কারযুগ মুহূর্ত্তের জন্যও পশ্চাদ্দৃষ্টিপরায়ণ হইয়া নিজেদের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। আমাদিগেরও যে একটা সভ্যতা আছে, জাতীয় জীবনের আদর্শ আছে, ইহা একরূপ জ্ঞাতসারেই বিস্মৃত হইয়া পাশ্চাত্য আদর্শে সমাজ ও ধর্ম্মগঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। জাতিগত, জন্মগত গৌরববুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া যাহা কিছু হিন্দুর— যাহা কিছু হিন্দুত্ব তাহার বিরুদ্ধেই সংস্কার—যুগবিদ্রোহ

* শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" হইতে।

ঘোষণা করিয়াছে! সর্ব্বোপরি এ যুগের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ সংস্কার-প্রভাবগুলি কেবলমাত্র জনকতক শিক্ষিত ব্যক্তি ও দুই একটী উচ্চবর্ণের সামাজিক জীবনের সমস্যা সমাধানকল্পে রচিত হইয়াছিল—সমগ্র জাতির উন্নতির সহিত উহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। বিশাল জাতিসঙ্ঘের সহিত নিজেদের সুখ দুঃখ ভাগ করিয়া লইবার মত উদারতা সংস্কারকগণের ছিল না বলিয়াই তাঁহারা স্বজন, স্বসমাজ পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। সংস্কারকগণের এই শোচনীয় সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্যদেব গায়ের জোরে কোনপ্রকার সংস্কার চালাইবার প্রত্যেক চেষ্টাকেই তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সমাজের ভুল, ত্রুটী ও অন্যায়গুলি সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন না; বরং সংস্কারকগণের সহিত অনেকাংশে একমতাবলম্বী ছিলেন। সংস্কারের প্রয়োজনও তিনি অস্বীকার করেন নাই—তাঁহার ঘোরতর আপত্তি কেবল তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত কার্য্যপ্রণালীর উপর। এই পার্থক্যটুকু তলাইয়া দেখিবার মত ধৈর্য্য বা ইচ্ছা যাঁহাদের নাই, অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা অসঙ্কোচে আচার্য্যদেবকে পূর্ব্ব সংস্কারকগণের সহিত সমশ্রেণীর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হন। আচার্য্যদেব আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সংস্কারক বলিয়া দাবী করিয়াছেন এবং সংস্কার অপেক্ষা আমূল পরিবর্ত্তনেরই অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ, সমস্ত সমাজ-সংস্কার-সমস্যাটী তাঁহার নিকট একটী প্রশ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছিল—"সংস্কার যাহারা চায় তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কৈ?" সংস্কারপ্রার্থী লোক বলিতে তিনি ভারতের বিশাল জনসঙ্ঘের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছেন—"প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থাপ্রণয়নে সমর্থ একটী দল গঠন কর, বিধান আপনা আপনি আসিবে। প্রথমে যে শক্তি বলে,যাহার অনুমোদনে বিধান গঠিত হইবে,তাহা সৃষ্টি কর। এখন রাজারা নাই। যে নূতন শক্তিতে, যে নূতন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে নূতন ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, সেই লোকশক্তি কোথায়? প্রথমে সেই লোক-

শক্তি গঠন কর। সুতরাং সমাজসংস্কারের জন্য প্রথম কর্ত্তব্য—লোক শিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।" ইহাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগের উদীয়মান জাতির প্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য। আমাদের এই কার্য্যের সাফল্যের উপরই ভবিষ্যৎ ভারতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। সেই জন্যই তিনি ইহাকে জাতি গঠনের যুগ বলিয়া স্বীকার করেন নাই—সমাজ বা সম্প্রদায় গঠনেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি মনুষ্য গঠন করিবার জন্যই সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং ভাবাবেগে দৃঢ়তার সহিত বলিতেন, "I want to preach a man-making religion."—আমি এমন এক ধর্ম্মপ্রচার করিতে চাই যাহাতে মানুষ তৈরী হয়। তিনি বিশ্বাস করিতেন শ্রদ্ধাবান্, মেধাবী, পরকল্যাণকামনায় সর্ব্বত্যাগী কয়েকটী মানুষ পাইলে তিনি সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দিতে পারেন।

যে শক্তিসহায়ে এই প্রবুদ্ধ জাতি প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া পুনরায় বিশ্বসমাজে বরণীয় হইতে পারিবে, সে শক্তি বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে—ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া আচার্য্যদেব নবীন ভারতকে চাষার কুটীর, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ি, মুদির দোকান, হাট, বাজার, কারখানা, ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বতের মধ্য হইতে আহ্বান করিয়াছেন! এত গভীর ও ব্যাপক ভাবে, ঐকান্তিক আগ্রহ লইয়া বর্ত্তমান যুগে আর কেহ সমগ্র জাতিকে আহ্বান করিয়াছেন কিনা আমরা জানি না। আমরা দেখিয়াছি একদিন শ্রীচৈতন্য গভীর প্রেমে আচণ্ডালকে কোল দিয়াছিলেন, আর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আর এক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী শ্রীগুরুকৃপা সম্বল করিয়া গভীর শ্রদ্ধায় "নারায়ণ" জ্ঞানে বিশ্বমানবের সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন!

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া উচ্চবর্ণগণ কল্পিত আভিজাত্যের অহঙ্কারে পতিত, অজ্ঞ, দরিদ্র, নিম্ন জাতিকে পদদলিত করিয়াছেন—আর সেই অন্যায়ের ফলস্বরূপ আজ তাহারা তমোভাবাপন্ন শূদ্র পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে। জাতির এই পাপ উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা

প্রাপ্ত হইয়াছি। যতদিন না ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব—ততদিন আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। অতএব এই শূদ্রগণকে প্রথমতঃ স্ববর্ণোচিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই এবারকার যুগাবতার আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন—সেবা। এই সেবাব্রতকে আত্মোৎসর্গের দিক্ দিয়া জাতির কল্যাণকামনায় গ্রহণ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত হইয়াছেন—আমরা সেই উদীয়মান যুবক সম্প্রদায়কে সাদরে আহ্বান করিতেছি। যদি বাস্তবিকই এই বিগতভাগ্য, লুপ্তগৌরব জাতির জন্য কাহারও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়া থাকে, তবে এসো এই নবনির্ম্মিত প্রশস্ত রাজবর্ত্মে আমরা দৃঢ় অথচ ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হই। বিবিধ প্রকার বিকৃত পথে গিয়া আমরা অনেক শক্তিক্ষয় করিয়াছি। আমাদের শক্তি অল্প, অতএব অপব্যয় নিবারণ করিতেই হইবে।

আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য—আশে পাশে এই যে ম্রিয়মাণ মনুষ্যগুলি ব্যর্থতার উপর নিজের সমস্ত চেষ্টাকে নিক্ষেপ করিয়া গভীর নৈরাশ্যে মৃত্যুর আয়োজন করিতেছে—ইহাদিগকে খাদ্য দিয়া, বিদ্যা দিয়া পুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। এই কার্য্যের জন্য আচার্য্যদেব চাহিয়াছিলেন এক সহস্র অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক—যাহারা "ভগবানে বিশ্বাসরূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিবে—মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করিবে।"

আচার্য্যদেব জানিতেন, বর্ত্তমান সমাজ তাহার কতকগুলি অর্থহীন আচার নিয়ম লইয়া এই কার্য্যের প্রবল বিঘ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান হইবে। অজ্ঞ, ভণ্ড, আত্মাভিমানিগণ স্ব স্ব কল্পিত অধিকার বজায় রাখিবার জন্য এই উদারহৃদয় সেবাব্রতিগণকে উপহাস করিবে, নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা করিবে। সেইজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই এ পথের সাধকগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। ছুঁৎমার্গী গোঁড়াগণের বিরুদ্ধে নিঃসঙ্কোচে উন্নত বক্ষেই দণ্ডায়মান হইতে হইবে। আদর্শকে খাটো করিয়া কোন প্রকার আপোষের ভাব যেন বিন্দুমাত্রও

না থাকে। কারণ, সত্য ও লোকাচারের সহিত কোন প্রকার আপোষের চেষ্টাকেই তিনি কাপুরুষতা বলিয়া ধিক্কৃত করিয়াছেন।

অতএব একদিকে পাশ্চাত্যের বিচারশূন্য অন্ধ অনুকরণ, অপরদিকে কতকগুলি প্রাণহীন আচার নিয়মের বন্ধনে জড়িত হইয়া গতানুগতিক ভাবে জীবন যাপন—এতদুভয় পন্থাকে পরিহার করিয়া এক উন্নততর, স্বতন্ত্র আদর্শকে অবলম্বন করিতে হইবে এই আদর্শ আচার্য্যদেব পাইয়াছিলেন স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে—আর পাইয়াছিলেন যে সুপ্রাচীন সভ্যতার ক্রোড়ে তাঁহার জন্ম—যাহা একদিন অদ্বৈতসিংহনাদে সমস্ত প্রকার গণ্ডীব শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া মানবাত্মার অনন্ত মহিমা ঘোষণা করিযাছিল।

সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উত্থিত হইযা হিন্দু সমাজকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদসমূহ, তর্কযুক্তির দিক্ দিয়া দিব্যজ্ঞানপ্রদ শাস্ত্রসমূহকে উর্ব্বর মস্তিষ্কের ব্যায়ামভূমিতে পরিণত করিয়াছে। অধিকারবাদের দোহাই দিয়া উন্নত, উদার, জ্ঞানপ্রদ, বলপ্রদ তত্ত্বসমূহ মুষ্টিমেয় ব্যক্তি করায়ত্ত করিয়া সাধারণকে বঞ্চিত করিয়াছে। ধর্ম্মের নামে মানুষ মানুষকে পদদলিত করিয়াছে ও করিতেছে। এই জঘন্য হৃদয়হীনতার ফলস্বরূপ আজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ কোটী মনুষ্য আত্মবিশ্বাস হারাইযা অজ্ঞতার গভীর পঙ্কে আবদ্ধ নিমজ্জমান! জাতির এই মহাসঙ্কটকালে বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

আর না—পঙ্গুর মত বসিয়া বসিয়া গিরিলঙ্ঘনের সোণার স্বপন আমরা বহুদিন দেখিতেছি, এবার সত্যই উঠিতে হইবে। পথ তো চিরদিনই ক্ষুরধার, দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ! উহাকে কুসুমাস্তীর্ণ করিবার চেষ্টা করা মূঢ়তা মাত্র।

সমাজের সে শক্তি আর নাই। সমাজের চালক ব্রাহ্মণজাতি বহুদিন লুপ্ত হইয়াছেন—যাঁহারা ত্যাগ ও তপস্যার বলে সমাজকে কল্যাণের পথে চালিত করিতে পারিতেন। তাঁহাদিগের বংশধরগণের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জমাট কুসংস্কারের দুর্ব্বহভারপীড়িত সমাজের

অগ্রগতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা অন্যায়রূপে বর্ত্তমান কালেও আপনাদিগকে সমাজের নেতা বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা এই হতভাগ্য জাতির পায়ে দেশাচার ও লোকাচারের শৃঙ্খলগুলি আরও ভাল করিয়া জড়াইয়া দিবার জন্যই ব্যস্ত! ধর্ম্মের আবরণে এই দুর্নীতি দেশের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে আমরা চাহি না। যাহা হইবার হইয়াছে, এবার সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে যাহাতে ব্যক্তিমাত্রই মানবাধিকারের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আত্মোন্নতি সাধন করিতে পাবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, যে নীতিসহায়ে এই নূতন সমাজ গঠিত হইবে তাহা যেন কোন প্রকার ধ্বংসমূলক না হয়; ইহা গড়িবার যুগ—ভাঙ্গিবার নয়! সাময়িক উত্তেজনায় যাঁহারা ধৈর্য্য হারাইয়া সমাজ ভাঙ্গিতে চাহেন, এবং স্বামিজীকেও উহার অনুমোদক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কার্য্যকালে বোধ হয় ভুলিয়া যান যে স্বামিজী পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—"I have come to fulfil not to destroy."

গড়া কঠিন—ভাঙ্গা সহজ। সাম্যের নাম করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির নিন্দা করা সহজ—কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা আয়ত্ত করিয়া ব্রাহ্মণ হওয়া কঠিন। এই সুকঠিন ব্রতকেই স্বামিজী নবযুগের কার্য্যপ্রণালী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। একদিকে আদর্শ ব্রাহ্মণ—অপর দিকে চণ্ডাল! এই চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিতে হইবে। এইভাবে সমাজসংস্কার বা সমাজের মধ্যে আমূল পরিবর্ত্তন আনিবার জন্য অভিশাপবর্ষণকারী সংস্কারকের প্রয়োজন নাই। গালাগালি, পরস্পরের দোষ প্রদর্শন, নিন্দাবাদ যথেষ্ট হইয়াছে। ঐগুলি সহায়ে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হইয়া বিগত শতাব্দীর সংস্কার-যুগ মহাভ্রম করিয়াছিল। উহা আত্মকলহে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পরবর্ত্তী বংশধরগণের জন্য এক লজ্জাকর পণ্ডশ্রমের অপবাদমলিন ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছে, যাহা এখনও সময়ে সময়ে নবযুগের কর্ম্মীগণকে বিস্মিত সংশয়ে আকুল করিয়া তোলে! তবুও বিগত শতাব্দীর

সংস্কারকগণ দণ্ড—কারণ তাঁহারা সত্যকে যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পরাজয় ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়াও তাহা অকুণ্ঠিত-চিত্তে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিশ্চিতই সাধু উদ্দেশ্য লইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু সে গভীর দূরদৃষ্টি তাঁহাদিগের ছিল না বলিয়াই তাঁহারা ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই যে সমুদ্র-মন্থনে কেবল অমৃতই উঠে না—গরলও উঠে। গরল উঠিল। নব্য ভারতের সেই মহাদুর্দ্দিনে, জাতির কাতর ক্রন্দনে বিগলিতহৃদয় সমাধিব্যুত্থিত মহাযোগী দ্বিতীয় নীলকণ্ঠের মত "অভীঃ" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সে গরলরাশি পান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসিল—নূতন তত্ত্ব, নূতন নীতি, আর মুষ্টিমেয় নূতনের দল। আসিল ত্যাগ ও তপস্যার শক্তি, আসিল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিহীন নিঃস্বার্থহৃদয় সেবকের দল।

সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতা বোধ হইতেছে। সূর্য্য উঠিয়াছে। হে নবযুগের মানব! হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ রাখিয়া আর কতদিন আপনাকে বঞ্চিত রাখিবে? হে কূটবুদ্ধি রাজনৈতিক! স্তব্ধ হও। দুরাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় উচ্চাধিকারলাভের স্বপ্ন দেখিয়া জাতিকে আর আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিবার জন্য আহ্বান করিও না। দাম্ভিক সমাজ সংস্কারক! তোমার জরাজীর্ণ সংস্কারপ্রস্তাবরূপ মলিন কন্থাখানি নাড়াচাড়া করিয়া শক্তিক্ষয় করিতে তোমার লজ্জা হয় না? তুমি কি তোমার অতীত ইতিহাস পাঠ কর নাই—করিয়া বুঝ নাই, অথবা বুঝিতে চেষ্টা কর নাই যে রাজনীতি বা সমাজনীতি সহায়ে ভারতবর্ষ উঠিবে না? সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই ভারত আধ্যাত্মিকতাকেই জাতীয় জীবনের আদর্শ করিয়া লইয়াছে—উহার পরিবর্ত্তে আপাতমনোরম রাজনীতি বা সমাজনীতিকে জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডরূপে নির্ব্বাচন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র! তোমরা যথেষ্ট করিয়াছ, আর অনর্থক উত্তেজনা ও আন্দোলন উপস্থিত করিয়া জাতীয় জীবন বিক্ষোভিত করিও না।

"ওঠো ভারত! তোমার আধ্যাত্মিকতা দিয়া সমস্ত জগৎ জয়

করিয়া ফেল—আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি জগৎ জয় করিবে।" বীর সন্ন্যাসীর এ আহ্বান ও ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হইবে না। তোমার আমার মত দুই চারি জনের ইহা ভাল লাগুক আর নাই লাগুক—ইহাই আদর্শ! কাহারও জন্য এই কার্য্য আট্‌কাইয়া থাকিবে না ইহাও নিশ্চয়! এই যুগচক্রবিবর্ত্তনের অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইবার সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

এই আধ্যাত্মিক জগৎ বিজয়ের জন্য আজ ভারতকে—বিশেষতঃ বাঙ্গালাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। জাতির সর্ব্বাঙ্গে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য আমাদিগকে ত্রিশকোটী মানবের দৈহিক ও মানসিক অভাব পূরণ করিবার ভার লইতে হইবে। এই কার্য্যের জন্য পাঠশালা, কারখানা, বক্তৃতা, পুস্তক, উদ্যম, উৎসাহ সব চাই—কিন্তু সর্ব্বোপরি চাই একদল মানুষ—চাই একদল ত্যাগী সন্ন্যাসী। এই নবীন সন্ন্যাসিগণের আদর্শ থাকিবে ভারতের সেই চিরন্তন আদর্শ—অদ্বৈতানুভূতি। কেবল উহা উপলব্ধি করিবার পন্থা হইবে স্বতন্ত্র! সংসার হইতে পৃথক্ হইয়া দাড়াইতে হইবে অথবা সংসারের মধ্যেই কর্ম্মক্ষেত্রের অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতীত মহিমা স্মরণ করিয়া ভূত গরিমার ধ্বংসাবশেষের প্রতি শ্রদ্ধাবিমিশ্র সম্ভ্রমদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হয় না। অতীতকে আবার নূতন করিয়া বর্ত্তমানের বক্ষে গড়িয়া তুলিতে হইবে। লইয়া আইস প্রাচীনের গর্ভ হইতে সেই সাধকের ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা—সেই সংযমের শক্তি ও ত্যাগের মহিমা। এসো শত শত সংযতমনা ব্রহ্মচারি—ভারতের এই আধ্যাত্মিক আদর্শকে জীবনে পরিণত করিবার ব্রত গ্রহণ কর। তোমাদের হৃদয় ভরিয়া উঠুক এক অসীম শ্রদ্ধায়—শ্রদ্ধা, যাহা একদিন দ্বাদশ বর্ষীয় বালককে মৃত্যুর সম্মুখে নির্ভীক বিশ্বাসে দণ্ডায়মান হইবার প্রেরণা দিয়াছিল—শ্রদ্ধা, যাহা একদিন বেশ্যাপুত্রকেও প্রশংসনীয় আত্মচেতনায় দৃপ্ত করিয়া ঋষির পুণ্যাশ্রমে প্রবেশাধিকার দান করিয়াছিল! আজ সেই শ্রদ্ধাকে আবার ফিরিয়া পাইতে হইবে।

এই শ্রদ্ধা ভাগ্যের ধিক্কার দলিত করিয়া একটা গৌরবময় ভবিষ্যতের সূচনা করিয়া দিবে।

আমরা শ্রদ্ধা হারাইয়াছি। দুর্ভিক্ষ ব্যাধিমড়কে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। পেটে অন্ন নাই, দেহে বস্ত্র নাই! কোটী কোটী দেবঋষির বংশধরগণ পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে! কেন এমন হইল? ইহা কি বিধাতার ইচ্ছা? ক্ষমতামদগর্ব্বিত অহঙ্কারী অভিজাত-সম্প্রদায়! ভগবানের ইচ্ছার দোহাই দিয়া এই দুর্ব্বল জাতিকে পিষিয়া মারিতে চাও—পায়ের তলায় চাপিয়া রাখিতে চাও! কেন তোমার এত ধৃষ্টতা? প্রজার শোণিতপুষ্ট জমীদার! তুমি সহরে বসিয়া জঘন্য বিলাসে কালযাপন করিবে—আর ব'লিবে যে প্রজা-রক্ষার ভার রাজা লইয়াছেন—আমরা কেবল শোষণ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিব! ম্রিয়মাণ ক্ষুধিত কৃষকের প্রাঙ্গণে ঋণপত্রহস্তে মহাজন দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে অপমান করিবে—তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে—আর তুমি তাহার বিরুদ্ধে একটী অঙ্গুলীও তুলিবে না! তিল তিল করিয়া জাতি মরিতেছে—মরিবে! রক্ষা করিবেন গবর্ণমেণ্ট—আর তুমি লালসার অনলে মনুষ্যত্ব ও হৃদয় আহুতি দিয়া বিলাসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে? দ্বারদেশে জোড়করে দণ্ডায়মান আশ্রয়ভিখারী ঐ যে নারায়ণ—তাহাকে তুমি কুক্কুর শৃগালের মত অবজ্ঞাভরে তাড়াইয়া দিবে? কেহ কি একবার মুখ তুলিয়া ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না?

হে ধর্ম্ম প্রচারক! কোথায় ধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবে? জাতিকে বাঁচাইয়া তোলো! সভা করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ, সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে মামুলী উচ্ছ্বাস বা অবজ্ঞাভরে দুই টাকা চাঁদা দিয়া এ মহাসমস্যার মীমাংসা হইবে না। ঐগুলির যে প্রয়োজন নাই তাহা আমরা বলিতেছি না—ও সমস্ত মামুলী ব্যাপার চলিতে থাকুক—এসো অপরদিকে নীরব কর্ম্মী—নির্ভীক সন্ন্যাসিগণ! এসো পদমর্য্যাদাহীন, স্বজাতিপ্রেমমাত্রসম্বল, উদারহৃদয় নবযুগের অগ্রগামী "নিরাশ সেনাদল"! দলে দলে বাঙ্গালার পল্লীশ্মশানে

বসিয়া শবসাধনা আরম্ভ কর। জাতির সম্মুখে এক দিব্য আদর্শ শত সূর্য্যের দীপ্তি লইয়া জাগিয়া উঠুক। তমঃসমুদ্রে মজ্জমান লক্ষ লক্ষ নরনারী শতাব্দীর জড়ত্বপাশ ছিন্ন করিয়া রজঃশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠুক। খাদ্য, পানীয়, বসন, ভূষণ বিচিত্র বিলাস তাহারা নিজেরাই সৃষ্টি করিয়া লইবে। সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি লুপ্ত হয় নাই—তাহা জাগিয়া উঠিয়া নূতন সমাজ নবীন ভাবে গঠন করিয়া লইবে।

সাবধান সেবকগণ! সমাজে বিপ্লবের বহ্নি আর জ্বালাইয়া তুলিও না। ঐ যে তোমাদের কার্য্যের পরিপন্থী স্বরূপ জনকয়েক পক্ষাঘাত-গ্রস্ত পঙ্গুকে জড়ত্বের উপর সমাসীন দেখিতেছ—উহাদিগকে আঘাত করিও না! চলচ্ছক্তিহীন খঞ্জের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিলে সে কেবল আর্ত্তনাদ করিয়া গগন বিদীর্ণ করিবে মাত্র—দণ্ডায়মান হইয়া চলা তাহার পক্ষে অসম্ভব। থাকুক তাহার তাহদের সঙ্কীর্ণ কুসংস্কার লইয়া জড়পিণ্ডের মত অচল—তোমরা অগ্রসর হও। রজঃশক্তিদৃপ্ত বিশ্বামিত্রের ন্যায় তপঃপ্রভাবে নূতন সৃষ্টিকে গড়িয়া তোলো। ক্ষত্র-বীর্য্য ও ব্রহ্মতেজের সম্মিলনে গঠিতচরিত্র সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণ—যাও, গ্রামে গ্রামে গিয়া আচণ্ডালকে উপনিষদের অভয়বাণী শুনাও—তোমরা অমিতবীর্য্য—অমৃতের অধিকারী! শুনাও—হে মহাশক্তির সন্তান, হে প্রসুপ্ত সিংহ, জাগরিত হও। জাতির জীবনে আশার আকাঙ্ক্ষা, আত্মনির্ভরতা ফিরিয়া আসুক!

কালচক্রের বিবর্ত্তনে পৌরোহিত্য শক্তি ও অভিজাতসম্প্রদায়ের সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে—ইংরেজের আইন সমস্ত প্রকার বিশেষ অধিকারীর দাবী পিষিয়া সমভূমি করিয়া দিয়াছে। এই শুভক্ষণে, অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে অনধিকারী বলিয়া ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষকে শাস্ত্রালোচনায় নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা বৃথা! সমাজপতিগণের স্বার্থপরতায় চিরদিনের মত তাঁহাদের হস্ত হইতে শাসনদণ্ড খসিয়া পড়িয়াছে। অন্তঃসারশূন্য বৃথা আস্ফালনে জাতিকে পদতলে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা! এবার দরিদ্র

আর্ত্ত, অস্পৃশ্য "নারায়ণ" জাগিবে—সমস্ত প্রকার গভীর শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া, সে আজ বিশ্বের জাতিসমাজে বরণীয় হইবে!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ! হে নবযুগের মানব। বৃথা সন্দেহ, দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া ইহা বিশ্বাস কর। মহা উদ্বোধনের আহ্বানদুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে জাগরণের সুস্পষ্ট চাঞ্চল্য—এই পুণ্যলগ্নে বিলাসের ভিক্ষাভূষণ পদদলিত করিয়া, লইয়া আইস বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা—উগ্র, উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন সূর্য্যরশ্মির মত সরল ও নির্ম্মমভাবে সমাজের উপর পতিত হও। জ্ঞানের রুদ্রদণ্ড উদ্যত করিয়া দুর্নীতিকে তাড়না কর। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এমন এক চক্র প্রবর্ত্তন কর - যাহা সকল সম্প্রদায়ের, সকল মতের, সকল জাতির নরনারীর নিকট উচ্চ উচ্চ তত্ত্বসকল বহন করিয়া লইয়া যাউক। বিবেকানন্দের আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের কেন্দ্রীভূত জীবনগুলির মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠুক! এসো কবির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া ব্রহ্মরুদ্রতালে, ভৈরবমন্দ্রে আমরাও গাহিয়া উঠি—

হে স্বামিন্ তুলে লও তোমার উদার জয় ভেরী
করহ আহ্বান!
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব
অর্পিব পরাণ।
চাবনা পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক-বিচার
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্ত্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি;—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জ্জন করি!

শ্রীবুদ্ধ ও তাঁহার শাক্যগণ।

(শ্রীগোকুলদাস দে এম এ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহাপ্রজাবতী গৌতমী প্রমুখ শাক্যনারীদিগের সংঘে প্রবেশ করিবার প্রায় পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর পরে সকলেই অর্হত্ব লাভ করিয়া পূর্ণমনস্কাম হইলে এক দিন প্রজাবতী ভাবিলেন, আমি অতঃপর তথাগত বা তাঁহার কোন শিষ্যের পরিনির্ব্বাণ দেখিতে পারিব না। এক্ষণে সেই নরসারথির নিকট বিদায় লইয়া এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। যশোধরা ও শাক্যবধূগণেরও তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুরূপ সংকল্প জন্মিল। অনন্তর তাঁহারা সকলে ভগবৎদর্শনে বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথিমধ্যে সংসারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সেই সংকল্প জ্ঞাত হইয়া শোক করিতে আরম্ভ করিলে মহাপ্রজাবতী তাহাদের অশেষ ভাবে সান্ত্বনা দিয়া তাহা নিবারণ করিলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রজাবতী বলিলেন, "হে সুগত, সত্য বটে আমি তোমার মাতা তুমি আমার পুত্র, কিন্তু এক্ষণে তুমি পিতা হইয়াছ, আমি তোমার নিকট নবজীবন লাভ করিয়া তোমার কন্যা হইয়াছি। যেমন এক সময় আমি তোমায় স্তনপান করাইয়াছিলাম তুমিও তেমন আমায় তদপেক্ষা অমূল্য ধর্ম্মামৃত পান করাইয়াছ। হে মহর্ষে, এক্ষণে তুমি মাতৃঋণ হইতে মুক্ত। রাজমাতা হওয়া বিশেষ দুর্লভ নহে কিন্তু বুদ্ধমাতা হওয়া বড়ই দুর্লভ। আমি সেই সুদুর্লভ মাতৃত্বলাভে ধন্য হইয়াছি। অর্হত্ব লাভ করিয়া আমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত। সর্ব্ব দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া এক্ষণে তোমার আদেশে পরিনির্ব্বাণ কামনায় আমি এই শাক্যবধূদিগের সহিত তোমার নিকট উপস্থিত। হে মহাবীর, একবার তোমার পদপ্রান্তে নমস্কার করিব।" তথাগত সেই চক্রাঙ্কশোভিত পদযুগল অগ্রসর করিয়া দিলেন; প্রজাবতী

তাঁহার শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে আদিত্য-পূর্ব্ব-কুলধ্বজ, হে নরসারথি, এই আমার শেষ জীবন। আর তোমায় নমস্কার করিবার অবসর পাইব না। স্ত্রীগণ চিরকালই অন্যায় করিয়া থাকে। করুণাময়, যদি আমার কিছু অন্যায় হইয়া থাকে এক্ষণে তাহা ক্ষমা কর। আমি তোমার নিকট স্ত্রীজাতির প্রব্রজ্যা ভিক্ষা করিয়া মহা অপরাধ করিয়াছি; আমার সেই দোষ মার্জ্জনা করিও। আমি তোমারই আজ্ঞায় ভিক্ষুণীদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছি; যদি তাহাতে কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে আমায় ক্ষমা করিবে।" ভগবান্ কাতরস্বরে উত্তর করিলেন, "মাতঃ আপনি কি বলিতেছেন? যাহারা অন্যায় করিয়া ক্ষমা চাহে না তাহাদিগকেও ক্ষমা করা উচিত। পরিনির্ব্বাণোন্মুখা মহাগুণবতী আপনাকে আমি কি উত্তর প্রদান করিব। আপনি চন্দ্রলেখার ন্যায় প্রভাতের দুর্য্যোগ কল্পনা করিয়া তারাগণের সহিত চলিয়া যাইতেছেন, আমার বলিবার কিছুই নাই।" প্রজাবতীর প্রণামের পর অপর শাক্যবধূগণও সেই হিমাচলসদৃশ ভগবান্কে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন। আবার প্রজাবতী বলিলেন, "হে লোকপাল, আমার চিত্ত তোমার ধর্ম্ম পান করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছে কিন্তু তোমার দর্শনে ও মধুর বাক্য শ্রবণে আমার চক্ষু ও শ্রোত্রের পিপাসা নিবৃত্তি হইতেছে না। যাহারা তোমায় দেখিবে, তোমার মধুর বাক্য শ্রবণ করিবে, তোমার ধর্ম্ম শুনিয়া শান্তিলাভ করিবে তাহারা ধন্য।"—তারপর তিনি আনন্দ প্রমুখ ভিক্ষুদিগের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে আনন্দ নিরানন্দ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গোতমী আনন্দকে বুঝাইতে লাগিলেন, "হে বুদ্ধসেবী শ্রুতিসাগরগম্ভীর আনন্দ, আমার এই মহা সুদিনে তোমার দুঃখ করা উচিত নহে। যে আচার্য্যকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ দেখিতে পায় নাই তোমরা তাঁহার নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিতেছ। তিনি তোমাদিগকে জরা, ব্যাধি মরণরূপ মহাদুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আমিও সেই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া এক্ষণে

সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থানে গমন করিব যেখানে চক্ষু গমন করিতে পারে না। এক সময় আমি তথাগতকে অনুকম্পাপ্রযুক্ত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলাম, "হে মহাবীর ঋষিশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বলোকের হিতের জন্য তুমি অজর অমর হইয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাক।" তিনি আমায় উত্তর দিয়াছিলেন, "মাতঃ বুদ্ধদিগকে এরূপ বাক্যে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন না, ইহা তাঁহাদের স্তুতিবাক্য নহে।" তাহা কিরূপ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন,

"আরদ্ধবিরিয়ে পহিতত্তে নিচ্চং দলপরক্কমে।
সমগ্গে সাবকে পস্স এসা বুদ্ধান বন্দনা॥"

"বীর্য্যমান্ সংযতাত্মা স্বকার্য্যসাধনে দৃঢ়পরাক্রমশালী সমস্ত শিষ্য-মণ্ডলীকে ধর্ম্মমার্গে সহায়তা কর ইহাই বুদ্ধের একমাত্র বন্দনা।" গৌতমী এইরূপে আনন্দকে সান্ত্বনা দিয়া তথাগতের নিকট পরি-নির্ব্বাণের অনুমতি লইলেন। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে তিনি নিজ যোগলব্ধ ঐশ্বর্য্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। অন্য অন্য শাক্য নারীগণও তথাগতের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া পরিনির্ব্বাণের অনুমতি লইলেন। বিদায়কালে গৌতমী অশ্রুপূর্ণনেত্রে করুণাকরকে বলিলেন, 'হে লোকনাথ, তোমায় এই শেষ দেখা দেখিলাম। হে অমৃতাকার, আজ আমার সকল সংস্কার পরিনির্ব্বাণে সমাপ্ত হইবে, আর তোমার মুখচন্দ্র দেখিতে পাইব না!' ভগবান্ বলিলেন, 'মাতঃ, আপনার সত্য উপলব্ধি হইয়াছে, রূপ দর্শন করিবার জন্য কেন এত ব্যাকুল হইতেছেন? যাহা কিছু গঠিত হইয়াছে তৎ সমস্তই অনিত্য জানিবেন।' অনন্তর গৌতমী সেই শাক্য নারীদিগের সহিত কুটাগারে গমন করিয়া ধ্যানযোগে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহারাও সেই চন্দ্রের সহিত তারাগণের ন্যায় অস্তগমন করিলেন। মাতা ও শাক্য নারীদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তথাগত শ্রাবস্তী পরিত্যাগ করিলেন।

ইহার স্বল্পকাল পরে কপিলবস্তুতে আর এক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। বুদ্ধশিষ্য কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তথাগতের বংশের সহিত

সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য এক শাক্য-কন্যার পাণিপ্রার্থনা করেন। শাক্যরাজ মহানাম জন্মতত্ত্ব গোপন করিয়া দাসী-গর্ভজাত স্বীয় কন্যা বাসবক্ষত্রিয়াকে রাজসন্নিধানে পাঠাইয়া দেন। কোশলরাজ তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া তাঁহাকেই বিবাহ করেন। এই পরিণয় ফলে কুমার বৈদূর্য্যের জন্ম হয়। রাজপুত্র ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মাতুলালয় কপিলভূমি দর্শন করিতে গমন করিলে মাতার জন্মতত্ত্ব সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে। দারুণ লজ্জায় ও ক্ষোভে রাজা বাসবক্ষত্রিয়া এবং বৈদূর্য্যকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন ভগবান্ শ্রাবস্তীতে। তিনি পরমভক্ত রাজার মানসিক দুরবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া অনাহুতভাবে তাঁহার প্রাসাদে অতিথি হইলেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের উদাহরণ দিয়া রাজাকে বুঝাইয়া পুনরায় পরিত্যক্ত পত্নী ও পুত্রকে গ্রহণ করাইলেন।

কিছুদিন পরে প্রসেনজিৎ বৈদূর্য্যের উপর রাজ্যের ভার ন্যস্ত করিয়া কপিলবস্তু দর্শনে যাত্রা করেন। তখন লব্ধসুযোগ বৈদূর্য্য পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করিয়া শাক্যদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যখন তিনি সসৈন্যে কপিলবস্তুর দিকে আসিতেছিলেন, তখন দেখিলেন তথাগত তাঁহার রাজ্যান্তর্গত সুশীতল ছায়াময় বৃহৎ বটবৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অদূরে কপিলবস্তুর সীমায় আতপে একাকী বসিয়া আছেন। বৈদূর্য্য নিঃসঙ্গ হইয়া তথাগতের নিকট আসিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তথাগত উত্তর দিলেন, 'তোমার রাজ্যের বৃক্ষের অপেক্ষা আমার জ্ঞাতিগণের ছায়া সুশীতল, তাই আমি সেই ছায়ায় বসিয়া আছি।' জ্ঞাতিগণের উপর যোগীবরের অপূর্ব্ব ভালবাসা দেখিয়া বৈদূর্য্য তখনি কোশলে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ তিন বার সসৈন্যে অভিযান করিয়া তিন বারই তাঁহাকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বৈদূর্য্য ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। প্রসেনজিৎ কুমারের সেই আচরণে যারপরনাই ভীত হইয়া অজাতশত্রুর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতে মগধে আসেন কিন্তু পীড়িত হইয়া অচিরে দেহত্যাগ করেন।

যখন ভগবান্ এইরূপে তাঁহার শাক্যদিগকে মৃত্যুর হস্ত হইতে বার বার রক্ষা করিতে যত্নবান্ ছিলেন তখন সেই শাক্যগণ কর্ম্ম-বিপাকে নীচপ্রবৃত্তিক হইয়া ধীরে ধীরে ধর্ম্মজগৎ হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করতঃ তাঁহার রক্ষণশক্তির বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। শাক্যদিগের কৌমার-বৈরাগ্যবান্ যুবকগণ সকলেই ইতিপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিয়া অমৃতরাজ্যের জন্য ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা লইয়াছেন। তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণও মহাপ্রজাবতীর সহিত ভিক্ষুণী হইয়া এক্ষণে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত। কুলে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ক্রমে স্বার্থান্ধ ও হিংসাদ্বেষপূর্ণ হইয়া পাপপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। ভগবান্ দেখিলেন শাক্যগণ পূর্ব্ব সংস্কার বশে নদীতে বিষ নিক্ষেপ করিয়া আপনা আপনি সমূলে ধ্বংস হইবার চরম উপায় অবলম্বন করিয়াছে। তাঁহাদের সেই অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল কর্ম্মবাদী তথাগত কিছুতেই অপসারিত করিতে পারিলেন না এবং দুরন্ত হেতু বৈদূর্য্যকে ক্ষান্ত করিতে তাঁহার যাওয়া হইল না। বৈদূর্য্য চতুর্থবার সসৈন্যে কপিলবস্তুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া তথাগতকে পূর্ব্ববৎ দেখিতে না পাইয়া শাক্যস্থানে প্রবেশ করিলেন এবং মাতামহ মহানাম ও যাঁহারা শাক্যনাম ত্যাগ করিয়া তৃণ বা নলশাক্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন কেবলমাত্র তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিয়া সমস্ত শাক্যবংশ ধ্বংস করিলেন। কিন্তু এই মহাপাপের ফল বৈদূর্য্য এড়াইতে পারিলেন না। ফিরিয়া আসিবার সময় অচিরবতীর প্রবল বন্যায় তিনি সসৈন্যে বিনষ্ট হইলেন।

শাক্যবংশ ধ্বংসের পর তথাগতের কোমল হৃদয় কি বিষম আঘাত-প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে। যিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে এতদিন ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছিলেন ঐ ঘটনার অল্পকাল পরেই তিনি আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ, যেরূপ জীর্ণশকট বহু সংস্কার করিয়া অতি সন্তর্পণে চালাইতে হয়, সেইরূপ তথাগত তাঁহার জরাগ্রস্ত দেহশকটকেও সমধিক চেষ্টায় চালিত করিতেছেন।" সত্য বটে, তাঁহার এক্ষণে অশীতি বৎসর বয়স হইয়াছিল। কিন্তু

সেকালের পক্ষে তাহা বেশী বয়স নহে। তখন লোকে সাধারণতঃ শত বা শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিত। রাজা শুদ্ধোদন শত বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। মহা প্রজাবতী গোতমীও শতাধিক বর্ষ জীবিতা ছিলেন। ভিক্ষুগণের মধ্যে অনেকেই নিরতিশয় দীর্ঘায়ু। সুতরাং তথাগতের পক্ষে অশীতি বৎসর বেশী নহে। তাঁহার মন যতই দৃঢ় হউক না কেন তাঁহার স্নেহপূর্ণ প্রাণ কুসুমাপেক্ষাও কোমল ছিল। পিতা গত, মাতা স্ত্রী প্রভৃতি শাক্যনারীগণও পরিনির্ব্বাণ গতা, তাহার পর আত্মীয়গণও সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত, শাক্যবংশ ধ্বংসপ্রায় এ সকল কারণ অলক্ষ্যে তাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ধীরে ধীরে বেদনা সঞ্চার করিতেছিল। বোধ হয় তিনিও স্ববংশ নাশের পর যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় লীলাসংবরণের চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় সেই ক্রুর ব্যাধের ন্যায়ই অন্তক মার আসিয়া একদিন তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিল, "ভগবন্, এখন আপনার ভিক্ষু ভিক্ষুণী উপাসক উপাসিকাগণ সকলেই ধর্ম্মদৃষ্টি লাভ করিয়া স্বকার্য্যসাধনে সক্ষম হইয়া আপনার ধর্ম্মকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ, কার্য্যও সমাপ্ত। এক্ষণে আপনি পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হউন।" ভগবান্ বলিলেন, "হে পাপাত্মক, তুমি নিশ্চিন্ত হও, অদ্য হইতে তিন মাসের পর তথাগতের পরিনির্ব্বাণ ঘটিবে।" মার আনন্দে প্রস্থান করিল।

উহার ঠিক তিন মাস পরে চুন্দ কর্ম্মকারের শেষ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ভগবান্ জন্মভূমির সন্নিকটস্থ কুশী নগরীতে মল্লদিগের যমজ শালবৃক্ষান্তরে তদীয় জন্মতিথি বৈশাখী পূর্ণিমায় উপাধিহীন পরিনির্ব্বাণলাভ করিলেন। পাছে ভবিষ্যতে চুন্দের অখ্যাতি হয় এইজন্য করুণাময় দেহত্যাগের পূর্ব্বে আনন্দকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, আনন্দ, দুইটী ভোজ অন্যগুলি অপেক্ষা মহা পুণ্যতর ও মহা ফলদায়ক জানিবে। প্রথম সুজাতার দত্ত পায়সান্ন—যাহা ভক্ষণ করিয়া তথাগত বহুকালবাঞ্ছিত বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং দ্বিতীয় চুন্দের প্রদত্ত ভোজ্য—যাহা গ্রহণান্তে আকাঙ্খার শ্রেষ্ঠবস্তু পরিনির্ব্বাণ লাভে তাঁহার

নশ্বর জীবন গত হইবে।” এই বাক্যের দ্বারা আরও বোধ হয়, তথাগত তাঁহার পরিনির্ব্বাণান্তে শোক না করিয়া সকলকে আনন্দিত হইতেই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। অতঃপর মল্লেরা আসিয়া তাঁহার পূত দেহের চতুর্দ্দিকে নৃত্যগীত সহকারে সপ্তাহকাল উৎসব করিয়া রাজচক্রবর্ত্তীর ন্যায় মহা সমারোহে উহার সৎকার করিল। সসংঘ মহাকাশ্যপ আসিয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলে চিতা আপনি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল এবং পরিশেষে দেবগণ বারিবর্ষণে সেই প্রজ্জলিত চিতা নির্ব্বাপিত করিলেন। তথাগতের শেষ বাণী—

‘বয়ধম্মা সংখারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।’

—জগতের সমস্ত বস্তু অনিত্য, অতএব অপ্রমত্ত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ লাভ করিবে।’

দীপ নির্ব্বাণ হইতে দেখিয়া নির্ব্বাণ শব্দ শ্রবণ মাত্রে আমরা শিহরিয়া উঠি। কিন্তু তথাগতের নির্ব্বাণ আত্মার নির্ব্বাণ নহে—তাহা কামকাঞ্চনাসক্তির নির্ব্বাণ, অশেষবিধ অমঙ্গলজননী বাসনার নির্ব্বাণ, যাহা কিছু হীন হেয় ইতরজনসুলভ সেই বিলাসতৃষ্ণার নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণই হিন্দুর জীবন্মুক্তি। মহাপ্রাণ তথাগত স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া সেই পরমপদপ্রাপ্তির যে চরম পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা কঠোর আত্মনির্য্যাতন ও নিরতিশয় বিলাস-ভোগের মধ্যপথ। এই নির্ব্বাণ কি নিরীশ্বর নাস্তিকের নিঃশেষ নিরস্তিত্ব অবস্থা? তথাগত নাস্তিক নহেন, তিনি উদানগাথায় উজ্জল অবিনশ্বর বাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন, এমন এক বস্তু আছে যাহা অজাত, অভূত, অকৃত ও অসংস্কৃত এবং চরমে এই পরম বস্তু আছে বলিয়াই মানবের মুক্তির পরিকল্পনা ও সম্ভাবনা। এই পরি-নির্ব্বাণ-মুক্তির অবস্থা কিরূপ তথাগত তৎসম্বন্ধে আভাস দিয়া বলিয়াছেন—

‘যথ আপো চ পঠবী তেজো বায়ো ন গাধতি।’

যথায় পৃথিবী অপ্‌, তেজ বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না।

'ন তথ সুক্কা জোতন্তি আদিচ্চো ন প্পকাসতি
ন তথ চন্দিমা ভাতি তমো তথ ন বিজ্জতি ;
যদা চ অত্তনা বেদি মুনি মোনেন ব্রাহ্মণো
অথ রূপা অরূপা চ সুখ দুক্খা পমুচ্চতি।'

তথায় সূর্য্যের জ্যোতি নাই, চন্দ্রের দীপ্তি নাই, বহ্নির ভাতি নাই এবং অন্ধকারেরও একান্ত অভাব। নিরালোক, নিরন্ধকার, রূপ, অরূপ, সুখ, দুঃখ বিরহিত অবস্থা একমাত্র মুনিগণেরই ধ্যানগম্য।

ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যমুনি-বিরচিত

জীবন্মুক্তি বিবেক।

প্রথম প্রকরণ।

জীবন্মুক্তি বিষয়ে প্রমাণ।

(পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

১। বেদসমূহ যাঁহার নিশ্বাস স্বরূপ (১), যিনি বেদসমূহ হইতে সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন (২), আমি সেই বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরকে (৩) বন্দনা করিতেছি।

---

(১) "আর্দ্র কাষ্ঠ প্রদীপ্ত হইলে যেরূপ নানাপ্রকার ধূম, (অর্থাৎ ধূম স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি) নির্গত হয়, হে মৈত্রেয়ি, তদ্রূপ এই মহান্ স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্মেরও ইহা নিঃশ্বাসস্বরূপ অর্থাৎ নিঃশ্বাসের ন্যায় তাঁহা হইতে অযত্নপ্রসূত—'ইহা' অর্থাৎ যাহা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা (নৃত্যগীতাদি শাস্ত্র), উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা) শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান বা অর্থবাদ বাক্য—এ সমস্ত নিশ্চয়ই এই ব্রহ্মের নিঃশ্বাসবৎ অযত্নপ্রসূত।" (বৃ—২।৪।১)

(২) "তিনি 'ভূঃ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভূলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন"—ইত্যাদি। (তৈ ব্রা, ২।২।৪।২)। মনু বলিতেছেন—(১।২১) তিনি আদিতে এ সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম, কর্ম্ম ও অবস্থা বেদ শব্দ হইতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য—১।৩।২৮)

(৩) সকল বিদ্যার উপদেষ্টা পরমেশ্বরকে এবং স্বকীয় গুরু 'বিদ্যাতীর্থ'কে।

২। বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎ সন্ন্যাস এই দুয়ের প্রভেদ দেখাইয়া আমি উভয়ের বর্ণনা করিব। এই দুই (সন্ন্যাস) যথাক্রমে বিদেহমুক্তি ও জীবন্মুক্তির কারণ।

৩। সন্ন্যাসের কারণ বৈরাগ্য। "যে দিনই বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে সেই দিনই গৃহত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। ("যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ"—জাবাল উপ, ৪) এই বেদবাক্য হইতে (তাহা জানা যাইতেছে)। কিন্তু বৈরাগ্যের বিভাগ পুরাণ (৪) হইতে পাওয়া যায়।

৪। বৈরাগ্য দুই প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে, যথা তীব্র এবং তীব্রতর। তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যোগী (গৃহস্থাদি অধিকারী) "কুটীচক" নামক সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে (তদ্বিরুদ্ধ কর্ম্ম) পরিত্যাগ করিবেন অথবা যদি সামর্থ্য থাকে তবে "বহূদক" নামক সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে তাহাই করিবেন। আর তীব্রতর বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে সন্ন্যাসপূর্ব্বক, হংস নামক সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে, (বিরুদ্ধ কর্ম্মাদি) ত্যাগ করিবেন। কিন্তু যিনি মোক্ষকামী তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভের সাক্ষাৎ উপায়স্বরূপ পরমহংস নামক সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে (তদ্বিরুদ্ধাচরণ) পরিত্যাগ করিবেন।

৬। পুত্র, স্ত্রী, গৃহ প্রভৃতি বিনষ্ট হইলে "সংসারকে ধিক্" এই প্রকার যে চিত্তের সাময়িক (অস্থায়ী) অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহাই মন্দ বৈরাগ্য।

বিদ্যাতীর্থ ইঁহার গুরু এবং ভারতীতীর্থ ইঁহার পরম গুরু—ইহাব ইঁহার পূর্ব্বাশ্রম-বিরচিত 'পারাশর মাধব' হইতে জানা যায়। যথা—

"লক্ষ্মামাকলয়ন্ প্রভাবলহরীং শ্রীভারতীতীর্থতো
বিদ্যাতীর্থমুপাশ্রয়ন্ হৃদি ভজে শ্রীকণ্ঠমব্যাহতম্।"

(৪) যথা মহাভারতে—

"চতুর্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচকবহূদকৌ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ।"

৭। এই জন্মে (৫) যেন আমার স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি না হয়, এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয় যুক্ত যে বুদ্ধি তাহাই তীব্র বৈরাগ্য।

৮। যে লোকে গমন করিলে এই সংসারে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতে হয়, সেই লোকে যেন আমার গমন না হয়, এই প্রকার বুদ্ধির (দৃঢ় ইচ্ছার) নাম তীব্রতর বৈরাগ্য। মন্দ বৈরাগ্যে কোন প্রকার সন্ন্যাসের বিধান নাই।

৯। তীব্র বৈরাগ্যে যে দুই প্রকার সন্ন্যাসের ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে, ভ্রমণাদির (৬) সামর্থ্য না থাকিলে কুটীচক সন্ন্যাসের ব্যবস্থা, এবং তাহার সামর্থ্য থাকিলে বহূদক সন্ন্যাসের ব্যবস্থা। এই উভয় প্রকার সন্ন্যাসীই ত্রিদণ্ডধারী।

১০। তীব্রতর বৈরাগ্যে যে দুই প্রকার সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ও মোক্ষপ্রাপ্তি এই দুই প্রকার ফলভেদমূলক। হংস সন্ন্যাসী ব্রহ্ম লোকে যাইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন (কিন্তু) পরমহংস সন্ন্যাসী ইহলোকেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।

১১। এই সকল সন্ন্যাসের আচার ব্যবহার পারাশর স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে। ব্যাখ্যান গ্রন্থে আমরা (কেবল) পরমহংসের অবস্থার বিচার করিতেছি।

১২। (ঋষিগণ) বলেন, পরমহংস দুই প্রকারের হয়; এক জিজ্ঞাসু, অপর জ্ঞানবান্। বাজসনেয়িগণ (শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকপাঠিগণ) বলেন, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি জ্ঞানলাভের জন্য সন্ন্যাস করিতে পারেন। (যথা, "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি")।

১৩। এই (আত্ম) লোক ইচ্ছা করিয়াই (লাভ করিবার জন্য) সন্ন্যাসিগণ গৃহত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন।

(৫) এই তীব্র বৈরাগ্য নিত্যানিত্যবিচারজনিত নহে। কেননা তাহা হইলে বলিতেন, 'আর কখনও অর্থাৎ ইহজন্মে বা জন্মান্তরে'।

(৬) তীর্থযাত্রা, স্বজন ভিন্ন অপরের নিকট ভিক্ষা করা ইত্যাদি।

(বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২)। যাঁহাদের বুদ্ধি দুর্ব্বল তাঁহাদের (বুঝিবার সুবিধার) জন্য আমরা এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ গদ্যে বলিব।

লোক দুই প্রকার; আত্মলোক ও অনাত্মলোক। তন্মধ্যে অনাত্ম (৭) লোক তিন প্রকার, ইহা বৃহদারণ্যক ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে। যথা—

"অথ ত্রয়ো বাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি। সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্ম্মণা কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ।"

অথ শব্দের দ্বারা বাক্যারম্ভ করিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (১।৫।১৬) বলিতেছেন, লোক তিনটা বৈ নহে, যথা—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। তন্মধ্যে এই মনুষ্যলোক পুত্রের দ্বারাই জয় করা যায়, অন্য কর্ম্মের দ্বারা নহে, কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক (জয় করা যায়), বিদ্যা (উপাসনা) দ্বারা দেবলোক জয় করা যায়। সেই স্থলেই (বৃহ; ১।৪।১৫) আত্মলোকের কথা শুনা যায়, যথা—

"যো হ বা অস্মাল্লোকাৎ স্বং লোকমদৃষ্ট্বা প্রৈতি স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি"—যে কেহ আত্মলোক দর্শন না করিয়া এই লোক হইতে গমন করেন (মরেন), এই আত্মলোক (পরমাত্মা) (তাহার নিকট) অবিদিত থাকিয়া তাঁহাকে (শোক মোহাদি হইতে) রক্ষা করেন না।

"আত্মানমেব লোকমুপাসীত স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে"—(বৃহ ১।৪।১৫) আত্মলোকেরই উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি আত্মলোকেরই উপাসনা করিয়া থাকে, নিশ্চয়ই তাহার কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

[(প্রথম শ্রুতি বাক্যের অর্থ এই)—যে ব্যক্তি মাংসাদির পিণ্ড স্বরূপ এই লোক হইতে পরমাত্মা নামক আত্মলোক (অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ) না জানিয়া দেহ ত্যাগ করে, আত্মলোক বা পরমাত্মা অবিদিত অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা ব্যবহিত (অন্তর্হিত) থাকিয়া সেই আত্মলোক-জ্ঞানহীন ব্যক্তিকে মরণান্তর শোক

(৭) আনন্দাশ্রমের দুই প্রকার সংস্করণেই এস্থলে পাঠের ভুল আছে।

মোহাদি দোষ দূরীকরণ দ্বারা রক্ষা করেন না। (দ্বিতীয় শ্রুতি বাক্যের অর্থ বলিতেছেন যে) তাহার অর্থাৎ সেই উপাসকের কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ একটী মাত্র ফল দান করিয়া বিনাশোন্মুখ হয় না অর্থাৎ বাঞ্ছিত সমস্ত ফল এবং মোক্ষও প্রদান করিয়া থাকে।]* (৮) (উক্ত ব্রাহ্মণের) ষষ্ঠাধ্যায়েও উক্ত হইয়াছে—"কিমর্থং বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থং বয়ং যক্ষামহে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি" (বৃহ ৪।৪।২২) "যে প্রজামীশিরে তে শ্মশানানি ভেজিরে। যে প্রজা নেশিরে তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে"—কোন্ প্রয়োজনে আমরা বেদাধ্যায়ন করিব? কোন প্রয়োজনে আমরা যজ্ঞ করিব? যে আমাদিগের এই (নিত্যসন্নিহিত) আত্মাই এই লোক বা পুরুষার্থ, সেই আমরা পুত্রাদি লইয়া কি করিব? যাহারা পুত্রলাভের ইচ্ছা করে তাহারাই শ্মশান (পুনর্জন্মনিবন্ধন মরণযন্ত্রনা) ভোগ করে। যাহারা পুত্র ইচ্ছা করে না তাহারা *নিশ্চয়ই অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে।*

তাহা হইলে (উল্লিখিত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।২২ "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি") "এই লোক ইচ্ছা করিয়াই সন্ন্যাসিগণ গৃহত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন" এই বাক্যে "এই লোক" দ্বারা আত্মলোক উদ্দিষ্ট হইয়াছে বুঝা যায়। কারণ, (তথায় বৃহদারণ্যকের জ্যোতির্ব্রাহ্মণে) 'স বাএষ মহানজ আত্মা"—"সেই জীবই এই জন্মরহিত পরমাত্মা" এই সকল শব্দের দ্বারা কথার আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে "এই" এই শব্দের দ্বারা আত্মাই সূচিত হইয়াছে। যাহা লোকিত বা অনুভূত হয় 'লোক' শব্দের দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে ("আত্মানুভবমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি") "আত্মানুভব ইচ্ছা করিয়াই তাহারা প্রব্রজ্যা বা গৃহত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন" ইহাই পূর্ব্বোক্ত) শ্রুতির তাৎপর্য্য বলিয়া নির্ণীত হইল। স্মৃতিতেও আছে—

---

* এই অংশ কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করেন।

(৮) ভাষ্যকার বলেন—তাহার কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, কারণ, তাহার এমন কোন কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে না, যাহার ক্ষয় হইবে। "কর্ম্মক্ষয় হয় না" কথাটি সিদ্ধ পদার্থেরই অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ মাত্র।

"ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভায় পরহংসসমাহ্বয়ঃ।
শান্তিদান্ত্যাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সাধনৈঃ সহিতো ভবেৎ॥"

"ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভের নিমিত্ত পরমহংস নামক (সন্ন্যাসী) শম (মানসিক স্থৈর্য্য), দম (ইন্দ্রিয়সংযম) প্রভৃতি সকল সাধন সম্পন্ন হইবেন।"

বিবিদিষা সন্ন্যাস।

এ জন্মে বা জন্মান্তরে বেদাধ্যয়নাদি (কর্ম্ম) যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলে যে আত্মজ্ঞানেচ্ছা জন্মে তাহার নাম বিবিদিষা। সেই বিবিদিষা বশতঃ যে সন্ন্যাস সম্পাদিত হয় তাহাকে বিবিদিষা সন্ন্যাস বলে। এই বিবিদিষা সন্ন্যাস আত্মজ্ঞানের হেতু। সন্ন্যাস দুই প্রকার। (১) যে সকল কাম্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলে জন্মান্তর লাভ করিতে হয়, সেই সকল কাম্যকর্ম্মের ত্যাগমাত্রই এক প্রকার সন্ন্যাস। আর প্রৈষ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দণ্ডধারণাদিরূপ আশ্রমগ্রহণ দ্বিতীয় প্রকার সন্ন্যাস।

["পুংজন্ম লভতে মাতা পত্নী চ প্রৈষমাত্রতঃ।
ব্রহ্ম নষ্টং সুশীলশ্চ জ্ঞানং চৈতৎপ্রভাবতঃ॥"

(সন্ন্যাসীকৃত) কেবলমাত্র প্রৈষমন্ত্রোচ্চারণ করিবার প্রভাবে তাহার জননী ও পত্নী পুরুষ হইয়া জন্মলাভ করেন। এবং সেই সুশীল ব্যক্তি ও সন্ন্যাসী (তৎপ্রভাবে) যে ব্রহ্ম এতদিন তাহার নিকট অদৃশ্য অর্থাৎ অবিজ্ঞাত হইয়াছিল, তাহার দর্শনলাভ করেন এবং আত্মজ্ঞান লাভ করেন]*

তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদে ত্যাগের কথা শুনা যায় ; ত্যাগের ব্যবস্থা আছে) যথা কৈবল্য উপনিষদে, ৪র্থ কণ্ডিকায় এবং মহানারায়ণোপনিষদে ১৬।৫—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ত্বমানশুঃ" ইতি। "মহাত্মগণ ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন—কর্ম্মের দ্বারা বা পুত্রাদি দ্বারা বা ধন দ্বারা নহে"। এই প্রকার ত্যাগ করিবার অধিকার স্ত্রীলোকদিগেরও আছে। (মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মের যে চতুর্ধরীকৃত টীকা আছে,

* এই অংশ কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করেন।

তাহাতে সুলভা-জনক-সংবাদে লিখিত আছে—মোক্ষধর্ম্ম (৩২০।৭) টীকা—["ভিক্ষুকীত্যনেন স্ত্রীণামপি প্রাগ্বিবাহাদ্বা বৈধব্যাদূর্দ্ধং সন্ন্যাসেঽধিকারোঽস্তি।" "ভিক্ষুকী" এ শব্দের প্রয়োগের দ্বারা দেখান হইয়াছে যে স্ত্রীলোকদিগেরও বিবাহের পূর্ব্বে এবং বৈধব্যের পরে সন্ন্যাসে অধিকার আছে। সেই সন্ন্যাসানুসারে ভিক্ষাচর্য্য, মোক্ষ-শাস্ত্র শ্রবণ, এবং একান্তে আত্মধ্যান করা তাহাদের কর্ত্তব্য, এবং ত্রিদণ্ডাদির ধারণও কর্ত্তব্য। শারীরক ভাষ্যের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ পাদে (৯) (৩৬ সংখ্যক সূত্র হইতে পরবর্ত্তী কয়েক সূত্র পর্য্যন্ত) দেবারাধনায় অধিকার থাকা হেতু, বিধুরের (ব্রহ্মবিদ্যায়ত) অধিকার প্রতিপাদন প্রসঙ্গে বাচক্নবী ইত্যাদির নাম শুনা যায়।] + অতএব (নিম্নলিখিত) মৈত্রেয়ীবাক্য পঠিত হইয়া থাকে—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রূহি।" (বৃহ,২।৪।৩) "যে বিত্ত অথবা বিত্তসাধ্য কর্ম্মের দ্বারা আমার অমৃতা হওয়া সম্ভবে না, তাহা দ্বারা আমি কি করিব? ভগবন্ আপনি যাহা (অমৃতত্বসাধন বলিয়া) জানেন তাহাই আমাকে বলুন"

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থিগণ কোনও কারণ বশতঃ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে অসমর্থ হইলে তাঁহাদের পক্ষে স্বকীয় আশ্রমোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে কর্ম্মাদির মানসিক ত্যাগ করিবার পক্ষেও কোন বাধা নাই। যেহেতু শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ সমূহে এবং ইহ সংসারেও সেই প্রকার অনেক তত্ত্ববিদ্ বা জ্ঞানী দেখিতে

---

(৯) শারীরক ভাষ্য (৩।৪।৩৬)

"বিধুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাং চান্যতমাশ্রমপ্রতিপত্তিহীনানামন্তরালবর্ত্তিনাম্...',

"সমাবর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্যাপন করিয়াছে, অথচ বিবাহ করিয়া গৃহী হয় নাই, কি বনব্রজ্যাদি করে নাই এরূপ লোক বিধুর। পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তৎপরে দার-পরিগ্রহ করে নাই ও সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই সেরূপ লোকও বিধুর। ইহাদের বর্ণধর্ম্ম দান পূজাদিতে অধিকার থাকায়, সেই সকলের দ্বারাই তাহাদের ব্রহ্ম-বিদ্যাধিকার বিদ্যমান থাকে।" (৺কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত টীকা, ৪৭৪ পৃঃ বেদান্তদর্শন)

+ এই অংশ কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করেন।

পাওয়া যায়। দণ্ডধারণাদিরূপ যে পরমহংসাশ্রম তত্ত্বজ্ঞানলাভের কারণ, তাহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিবিধপ্রকারে সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। এইহেতু তাহার বর্ণনা করিতে বিরত হইলাম।

ইতি বিবিদিষা সন্ন্যাস।

সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়ের

কার্য্যবিবরণী (১৯১৬-১৯১৮ খৃঃ)।

ভারত ও পাশ্চাত্যের বিদ্যা সমূহের একত্র সমাবেশে অভিনব জাতীয় প্রণালীতে শিক্ষাদানপূর্ব্বক ছাত্রীদিগের মধ্যে চিন্তাশীলতা ও সকল বিষয়ে স্বাবলম্বন বৃদ্ধি করাই বর্ত্তমান কার্য্যের বিশেষ লক্ষ্য। আচার, সংযম, সদাচার, ধ্যানপরতা প্রভৃতি জাতীয় সদ্‌গুণ সমূহ না হারাইয়া ছাত্রীগণ যাহাতে কর্ম্মতৎপর এবং নরনারীর সেবাতে আত্ম-নিবেদনপূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করে এই ভাবে তাহাদিগকে গঠন করা এই কার্য্যের অন্যতম লক্ষণ।

ভারতের এবং পাশ্চাত্যের বিদ্যাসকলের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা-সম্পন্ন থাকিয়া উভয়ের একত্র সমাবেশে অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন ভাবে কলিকাতায় ১৭ নং বসুপাড়া লেনস্থ বিবেকানন্দ-পুরস্ত্রী-শিক্ষা ও নিবেদিতা-বালিকা-বিদ্যালয় পঞ্চদশ বর্ষেরও অধিককাল বঙ্গীয় মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করিয়া আসিয়াছে। মাতৃমন্দির নামধেয় ঐ কার্য্যের এক নূতন বিভাগও চারি বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহাপ্রাণ স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের প্রেরণা ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ কার্য্যের প্রতিষ্ঠাত্রীদ্বয় স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীমতী ক্রিষ্টিনা দীর্ঘকাল কঠোর আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায় প্রদর্শনপূর্ব্বক যেরূপে একজন পরলোকে এবং অন্যজন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কিয়ৎকালের জন্য আমেরিকায় গমন করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছি। অতএব বিগত তিন বৎসরে

(১৯১৬—১৯১৮ খৃঃ) ঐ কার্য্য উহার প্রত্যেক বিভাগে কিরূপ উন্নতি ও প্রসার লাভ করিয়াছে তাহাই সম্প্রতি আলোচনা করা যাইতেছে।

বিদ্যালয় ও পুরস্ত্রীশিক্ষা বিভাগদ্বয়ের উদ্দেশ্য—

(১ম) ভারত ও পাশ্চাত্যে আবিষ্কৃত বিদ্যা সকলের একত্র সমাবেশপূর্ব্বক আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতির উপযোগী নবীন প্রণালীতে ছাত্রীদিগকে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া যাহাতে তাহারা প্রয়োজনীয় বিদ্যা সকলের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সুসংযতা ও চরিত্রবতী হইয়া উঠিবে এবং চিন্তাশীলতা দ্বারা সর্ব্বদা অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা বিধানে স্বয়ং সমর্থা হইবে।

(২য়) ছাত্রীদিগের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ভাবসম্পদ্ রক্ষাপূর্ব্বক এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে তাহারা নিজ জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়া উহার সেবায় আত্মনিবেদনে আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিবে।

উক্ত বিভাগদ্বয়ের পরিচালনা—

শ্রীমতী সুধীরা বসু প্রমুখা যে সকল শিক্ষয়িত্রীর হস্তে কার্য্যভার অর্পণপূর্ব্বক ভগিনী ক্রিষ্টিনা গত ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমেরিকা গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ট্রষ্টিবর্গের সহযোগে গত তিন বৎসর এই কার্য্যবিভাগদ্বয় চালাইয়া আসিয়াছেন।

বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা—

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয় বিভাগে ১৫০ জন ছাত্রী এবং তাহাদের দৈনিক উপস্থিতি গড়পড়তায় ১৩০ ছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ঐ সংখ্যা ২০০ পরিণত হয়। তদবধি এখন পর্য্যন্ত ঐ সংখ্যা প্রায় ঐরূপই রহিয়াছে। কারণ, বর্ত্তমান বাটীতে উহার অধিক একজন ছাত্রী লওয়াও সম্ভবপর নহে।

ছাত্রীসংখ্যার ঐরূপ বৃদ্ধি হওয়ায় এবং অর্থাভাবে নিকটবর্ত্তী অন্ত একখানি বাটী ভাড়া লইবারও কর্ত্তৃপক্ষগণের সামর্থ্য না থাকায় ছাত্রীগণকে বিভাগপূর্ব্বক প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ণে ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত, প্রতিদিন দুইবার বিদ্যালয়

করার পরামর্শ পরিণামে স্থির হয়; এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে এখন পর্য্যন্ত ঐরূপ করা হইতেছে। বিদ্যালয়ের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর এক বিভাগের ছাত্রীগণ উহার প্রাতের অধিবেশনে এবং তৃতীয় শ্রেণীর দ্বিতীয় বিভাগ, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীগণ বিদ্যালয়ের অপরাহ্নের অধিবেশনে শিক্ষালাভ করিতেছে।

পুরস্ত্রী-শিক্ষাকার্য্যের শ্রেণী বিভাগ।

উক্ত কার্য্যের দুইটি শ্রেণী বিভাগের কথা আমরা পূর্ব্ব-বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। আবশ্যক হওয়ায় ১৯১৬ খ্রীঃ হইতে উহাতেও একটি শ্রেণী বাড়াইতে হইয়াছে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে উহার প্রথম শ্রেণীতে ৬ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৯ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৮ জন ছাত্রী শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ছাত্রী সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩ জন।

পুরস্ত্রী শিক্ষা বিভাগের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীগণ নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে বিদ্যালয়ের শ্রেণী সকলে বালিকাগণের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগের পাঠ্য বিষয় ঐ শ্রেণী সকলের পাঠ্য বিষয়ের সহিত সমসমান। উহার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীগণ ভবিষ্যতে শিক্ষয়িত্রী হইবার উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভ করিতে আসিয়াছেন। এই শ্রেণীতে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, সীবনবিদ্যা, চিত্রকলা ও শিক্ষাদান প্রণালী শিখান হইয়া থাকে। এই বিভাগেরই ১০ জন ছাত্রী পাঠন প্রণালীতে অভ্যস্ত হইবার জন্য নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শ্রেণী সকলের দৈনন্দিন শিক্ষা প্রদান কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। পুরস্ত্রী শিক্ষার তৃতীয় শ্রেণীতে কেবলমাত্র সীবনবিদ্যা ও সূচীশিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আট জন মহিলা এই শ্রেণীতে শিক্ষালাভ করিতেছেন।

শিক্ষাকার্য্যের অর্থাগমের উপায় সমূহ—

(১ম) আমেরিকার যুক্তরাজ্য নিবাসী জনৈক বন্ধু প্রেরিত সাহায্য।

(২য়) ভারতবাসী বন্ধুবর্গের নিকট সংগৃহীত চাঁদা।

(৩য়) শিক্ষাকার্য্যের জন্য প্রদত্ত এবং উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রমুখ কয়েক জন গ্রন্থকার লিখিত পুস্তিকা সকলের এবং সিষ্টার নিবেদিতা প্রণীত কয়েকখানি পুস্তিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ।

(৪র্থ) ভারত ও ভারতেতর দেশ হইতে প্রাপ্ত এককালীন দান।

(৫) চিরস্থায়ী ফণ্ডের সুদ স্বরূপে লব্ধ অর্থ।

বিদ্যালয়ের আলোচ্য তিন বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাব।

১৯১৬ হইতে ১৯১৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ৩ বৎসরের মোট আয় ৯০৫৫৮৵০ টাকা এবং ঐ ৩ বৎসরের মোট ব্যয় ৮১৩৩।৬ টাকা। মজুদ ৯২২৷৵৬ টাকা। বিদ্যালয়ের উপস্থিত মাসিক খরচ ২২৫৲ টাকার উপর করিয়া পড়িতেছে। ইহাতে আমাদিগকে অতি কষ্টে স্কুল চালাইতে হইতেছে। আমরা এই কার্য্যে সহৃদয় দেশবাসীর অধিকতর সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। কারণ, বিদ্যালয়টী অবৈতনিক হওয়ায় আমাদিগকে তাঁহাদের সহানুভূতির উপরেই নির্ভর করিতে হইতেছে।

মাতৃমন্দির।

শিক্ষা কার্য্যের এই বিভাগের উন্নতি গত তিন বৎসরে আশাতীত ভাবে সাধিত হইয়াছে। সিষ্টার নিবেদিতা ও ক্রিষ্টিনা যে অপূর্ব্ব আদর্শ জীবন তাঁহাদিগের ছাত্রীদের সম্মুখে এতকাল ধরিয়া যাপন করিয়াছেন তাহার প্রেরণায় কতকগুলি ছাত্রীর প্রাণে ঐরূপ করিবার প্রবল উৎসাহ ইতিপূর্ব্বে উদিত হইয়াছিল। শিক্ষাদানরূপ কার্য্য তাঁহারা ব্রতস্বরূপে গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দুরমণীগণের সেবাতে জীবন নিয়োজিত করিতে উন্মুখ হইয়াছিলেন। উহা করিতে হইলে তাঁহাদিগকে পারিবারিক সম্বন্ধ অনেকাংশে ছাড়িয়া কোন এক স্থানে একত্রে থাকিতে হইবে একথা বুঝিতে তাঁহাদের বিলম্ব হয় নাই। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীমতী সুধীরা বসু ঐ বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত ভাবে একটি ছাত্রীদিগের আবাস খুলিয়া দিলেন এবং ঐরূপ ব্রতধারিণী হইতে কৃতসংকল্প অন্য কয়েক

জনও ঐ সময়ে তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। এ পর্য্যন্ত এমন ভাবে তাঁহারা ঐ কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন যে এই অল্প কালের মধ্যেই উহার সুনাম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া সাধারণকে উহার প্রতি সশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থান হইতে অভিভাবকগণ উহাতে বালিকাগণকে প্রেরণ করিতেছেন। সুদূর মহীশূর প্রদেশের বাঙ্গালোর সহর হইতেও দুইজন ছাত্রী কিঞ্চিদধিক এক বৎসর হইল উহাতে যোগদান করিয়াছে। বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণ এই কার্য্যের সহায়তায় কেবল মাত্র বাটীভাড়া জোগাড় করিয়া দিতেছেন। বাকি সমস্ত ব্যয়ভার উহার পরিচালিকাগণ নানাবিধ উপায়ে উপার্জ্জনপূর্ব্বক আপনারাই বহন করিয়া আসিতেছেন। অতএব স্বাবলম্বন ও পরার্থে ত্যাগই যে ইঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র একথা বলিতে হইবে না।

উদ্দেশ্যের চারি বিভাগ।

(১ম) শিক্ষা ও সেবাব্রতে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এইরূপ হিন্দুরমণীগণের বাসভবনরূপে ইহা প্রধানতঃ পরিগণিত হইবে।

(২য়) পূর্ব্বোক্ত ব্রতদ্বয়ধারণে অভিলাষিণী হইয়া যে সকল হিন্দুরমণী উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে চাহেন, আশ্রম তাঁহাদিগকে নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া ঐ উচ্চাদর্শে জীবন গঠন করিবার এবং শিক্ষাদান ও সেবা করিবার বর্ত্তমান কালের প্রকৃষ্টপ্রণালী সকল শিখিবার সুবিধা বিধান করিবে।

(৩য়) কলিকাতায় থাকিবার সুবিধা না থাকায় দূরবর্ত্তী স্থানের যে সকল ছাত্রী সিষ্টার ক্রিষ্টিনা পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভে অভিলাষিণী হইয়াও আশা পূরণ করিতে পারিতেছে না, মাসিক খরচা লইয়া আশ্রম তাহাদিগের ঐ বিষয়ে সুযোগ করিয়া দিবে।

(৪র্থ) সীবনবিদ্যা, সূচীশিল্প প্রভৃতি শিখাইয়া এবং লেখাপড়া জানিলে ভদ্রপরিবারে পড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আশ্রম অসহায়া দরিদ্রা পুরস্ত্রীদিগকে জীবিকানির্ব্বাহে সহায়তা বিধান করিবে।

মাতৃমন্দিরের বর্ত্তমান অবস্থান।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আশ্রম ৫৩।১নং বসুপাড়া লেনস্থ

৮

ভবনে উঠিয়া আসিয়াছে। উক্ত বাটীর ভাড়া মাসিক ৫০৲ টাকা জনৈক সদাশয় বন্ধু এ পর্য্যন্ত বহন করিয়া আশ্রমবাসিনীদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। মন্দিরনিবাসিনীগণের সংখ্যা ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ১১, ১৯১৬ খৃঃ ১৬, ১৯১৭ খৃঃ ২৩ ও ১৯১৮ খৃঃ ২ ছিল। বর্ত্তমানে আশ্রম বাটীতে উহা অপেক্ষা অধিক আর এক জনেরও স্থান হওয়া অসম্ভব বলিয়া অনেক ছাত্রীর আবেদন নিত্য ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে।

মাতৃমন্দিরের আয়।

বাহিরের ছাত্রীগণকে পড়াইয়া আশ্রমপরিচালিকাগণ ১৯১৬ খৃঃ মাসিক ১৭৲, ১৯১৭ খৃঃ মাসিক ২৭৲ এবং ১৯১৮ খৃঃ মাসিক ৪০৲ টাকা হিসাবে গড়পড়তায় উপার্জ্জন করিয়াছেন। ধাত্রীবিদ্যা পারদর্শিনী জনৈক পরিচালিকা ১৯১৭ ও ১৯১৮ খৃঃ ২০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা এই সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহে প্রদানপূর্ব্বক মন্দিরবাসিনীদিগের চিরকৃতজ্ঞতাভাগিনী হইয়াছেন।

সীবন ও সূচীশিল্প দ্বারা আশ্রমবাসিনীগণ ১৯১৬ খৃঃ ১১৮৸৶১৫, ১৯১৭ খৃঃ ২৫০৲ এবং ১৯১৮ খৃঃ ৩২১৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

জনৈক বন্ধু ও শ্রীমতী রাধারাণী বিশ্বাস প্রত্যেকে মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে ২জন দরিদ্রা ছাত্রীর মাসিক ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। আশ্রম ইঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিল।

মন্দির পরিচালিকাগণের সাহায্যার্থ চিরস্থায়ী ফণ্ড।

পরিচালিকাগণের নিঃস্বার্থ উদ্যম ও অধ্যবসায় দর্শনে প্রসন্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের গভর্ণিং বডি ২০০০৲ টাকার কোম্পানি কাগজের সুদ প্রতি বৎসর ঔষধাদি ক্রয়ে ও অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহে তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

মন্দিরনিবাসিনী দরিদ্রা ছাত্রীগণের সাহায্যার্থ চিরস্থায়ী ফণ্ড।

মৃণালিনী স্মৃতিরক্ষা ফণ্ড ও স্বর্ণময়ী-ইন্দুবালা স্মৃতিরক্ষা ফণ্ড

শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া মৃণালিনী ঘোষের পিতা শ্রীযুত ভূপাল চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ

নগদ ২০০০৲ টাকা আন্দাজ এবং শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয়া জননা ও পত্নার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার জন্য ২১০০৲ টাকার (নামগ্যাল ভ্যালু) কোম্পানির কাগজ শ্রীরাম-কৃষ্ণ মিশনের গভর্ণিং বডির হস্তে এই অভিপ্রায়ে সমর্পণ করিতেছেন যে, উক্ত টাকা মিশনের নিকটে চিরকাল জমা থাকিবে ও উহার সুদ মন্দিরনিবাসিনা কোন তিনটী দরিদ্র নারীর শিক্ষার সাহায্যার্থ ব্যয় করা হইবে এবং প্রতি তিন বৎসরের অন্তে ঐ সাহায্য এক এক জন নূতন ছাত্রাকে দেওয়া হইবে।

শ্রীযুত ভূপাল চন্দ্র বসু ও শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকটে মন্দিরনিবাসিনীগণ ঐ জন্য চিরকৃতজ্ঞ রহিল।

কাশীধামস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগে শাখা কার্য্য।

কাশীধামের লাক্ষা নামক পল্লীতে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রায় এক বৎসর হইল একটি বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ভার মাতৃমন্দিরের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। পরিচালিকাগণ ঐ জন্য আপনাদের ভিতর হইতে দুই জনকে তথা প্রেরণপূর্ব্বক ঐ কার্য্য এত কাল পর্য্যন্ত চালাইয়া আসিতেছেন। উক্ত আশ্রমের ব্যয়ভার অবশ্য স্থানীয় মিশনই বহন করিতেছেন। বর্ত্তমানে উহাতে ৭ জন অসহায়া রমণী ও ১ জন পিতৃমাতৃহীন বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। রমণীগণের মধ্যে ২ জন সধবা ও ৫ জন বিধবা।

বালি-শাখা বিদ্যালয়।

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের যে শাখা কলিকাতার উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী বালি নামক পল্লীগ্রামে অবস্থিত বলিয়া আমরা পূর্ব্ব বিবরণীতে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কার্য্য বিগত তিন বৎসর সমভাবেই চলিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় উহা বাগবাজার বিদ্যালয়ের পদানুসরণ করিয়াই শিক্ষা প্রদানে অগ্রসর হইয়াছে। উহাতে ৩৫ জন ছাত্রী বর্ত্তমানে শিক্ষা লাভ করিতেছে এবং ছাত্রীগণের দৈনন্দিন উপস্থিতির সংখ্যা গড়পড়তায় ৩০ জন করিয়া হইতেছে।

জমি ক্রয় ও বাটী নির্ম্মাণ ফণ্ড।

শিক্ষাকার্য্যের উপযোগী কয়েকখানি বাটী নির্ম্মাণ বর্ত্তমানে একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণ এই কার্য্যের স্থানাভাব দূর করা একান্ত প্রয়োজন বুঝিয়া বাগবাজারস্থ নিবেদিতা লেনে ১৫ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৩ বর্গফুট পরিমিত একখণ্ড ভূমি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে ২৪,৬৪৫৸৶৪ টাকা ব্যয়ে ক্রয় করিয়াছেন। দেশ ও দশের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহারা যে সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে এই কাল পর্য্যন্ত সাধারণের পূর্ণ সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছেন। ঐজন্য সাহসে বুক বাঁধিয়া তাঁহারা এই হিতকর শিক্ষানুষ্ঠানের জন্য ঐ টাকা বর্ত্তমানে কর্জ্জ করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ঈশ্বর কৃপায় উহার কতকাংশ পরিশোধ হইলেও ১২,২৫৮৸৶২ পরিশোধ হইতে এখনও বাকি রহিয়াছে। তাহার পর উক্ত জমীর উপরে প্রশস্ত বিদ্যালয়গৃহ এবং মাতৃমন্দিরের ছাত্রীআবাসের জন্য অন্ততঃ ৫০ জন বালিকার থাকিবার মত অন্য একখানি বাটী নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তজ্জন্যও অনেক অর্থের প্রয়োজন। আবার কার্য্যের স্থায়িত্ব সম্পাদনের জন্য এমন একটি ফণ্ডের প্রয়োজন যাহার সুদ হইতে উহার মাসিক ব্যয় চিরকাল নির্ব্বাহ হইতে পারে। কারণ স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতা ঐ উদ্দেশ্যে যে টাকা বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণের হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা যৎসামান্য এবং কেবল মাত্র এই কার্য্যের বিদ্যালয় ও পুরস্ত্রী শিক্ষা বিভাগদ্বয়ের জন্য। এই কার্য্যের অন্যতম বিভাগ মাতৃমন্দিরের জন্য ঐ উদ্দেশ্যে কিছুমাত্র টাকা এখনও পাওয়া যায় নাই। অতএব হে সদাশয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, অগ্রসর হও—এই সদনুষ্ঠানের যে কোন বিভাগের অভাব মোচনে তোমাদের ইচ্ছা হয় তাহাতেই যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য প্রদানপূর্ব্বক দেশের রমণীকুলের স্থায়ী কল্যাণ বিধান কর—শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্ত্তিমতী প্রকাশস্বরূপা নারীগণের সেবা করিয়া দেশকে উন্নত কর এবং স্বয়ং কৃতার্থ হও। যাঁহার করুণা ও কৃপা ভিন্ন জগতে কোন কার্য্যই সম্ভবপর

হয় না, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষোত্তম তোমাদিগের হৃদয়ে শুভ প্রেরণা আনয়ন করিয়া এই কল্যাণকর অনুষ্ঠানে দান করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য প্রদান করুন!

সংবাদ ও মন্তব্য।

১৯১৩ হইতে ১৯১৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত চারি বৎসরের কার্য্যবিবরণী ও মিশন সংক্রান্ত অন্যান্য বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় সাধারণ কার্য্যবিবরণী বেলুড়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে জনসাধারণ মিশন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা বেশ ধারণা করিতে পারিবেন।

মালয় উপদ্বীপের অন্তর্গত কোয়ালালামপুর নামক স্থানে স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে "বিবেকানন্দ আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আশ্রমপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মান্দ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শর্ব্বানন্দ প্রায় প্রতিবৎসর ঐস্থানে গমন করিয়া ঐ কার্য্যে জনসাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বিগত জুন মাসে আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি পুনরায় ঐ স্থানে গমন করেন। স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহার বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তিনি ঐ মাসে আশ্রম হলে নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেনঃ—

'হিন্দুমতে জীবনের আদর্শ', 'ধর্ম্ম', 'কর্ম্মজীবনে বেদান্ত', 'আত্মা বা মানুষের যথার্থ স্বরূপ', 'কর্ম্ম ও পুনর্জ্জন্মবাদ', 'হিন্দুমতে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ', এবং 'বেদান্ত ও সিদ্ধান্তমতের সমন্বয়'। শীঘ্রই মান্দ্রাজ মঠ হইতে জনৈক সন্ন্যাসী তথায় গমন করিয়া আশ্রমের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ঠাকুরের ভাব দেশে যতই ছড়ায় ততই মঙ্গল।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সবডিভিসনের অন্তর্গত হরিনগর গ্রামে গত এপ্রিল মাসে কয়েকজন যুবকের উদ্যোগে একটী নৈশ শ্রমজীবী বিদ্যালয় ও একটী স্ত্রীশিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই

বিদ্যালয়দ্বয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণের পরামর্শানুসারে পরিচালিত হইতেছে। শিক্ষার অভাবই ভারতের একটী প্রধান সমস্যা, উহা দূর করিবার জন্য দেশের যুবকবৃন্দ সচেষ্ট হইলেই উহার সাফল্য অচিরে সম্ভবপর। মিশনের যুবকবৃন্দের ঐ বিষয়ের উৎসাহের সহিত অর্থেরও নিতান্ত প্রয়োজন। সহৃদয় দেশবাসীর মুখ চাহিয়াই স্থানীয় যুবকবৃন্দ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। বিদ্যালয় দুইটী নিয়মিত ভাবে পরিচালিত করিতে হইলে মাসিক অন্ততঃ ২০৲ টাকার প্রয়োজন। এই মহৎকার্য্যে মাসিক চাঁদা হিসাবে অথবা এককালীন দান হিসাবে যিনি যাহা দান করিতে চান তাহা (১) ম্যানেজার, উদ্বোধন আফিস, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, অথবা (২) শ্রীকেদারনাথ হাজারিবস্যা, সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ নৈশ ও স্ত্রী বিদ্যালয়, হরিনগর, পোঃ রাধানগর, জেলা মেদিনীপুর—এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য।

(বাঙ্গালা ও বিহার)

আমাদের দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য পূর্ব্ববৎ সমভাবেই চলিতেছে। নিম্নে ২৬শে জুন হইতে ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক চাউল বিতরণের হিসাব প্রদত্ত হইল।

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
	বাগদা (মানভূম)	
৪৯	১১৩৯	৬৮/
৪৭	১০১২	৫২/৪
৩৭	৭১৮	৩৬/৬৸
৩৮	৬২	৩১৸৷

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
	ইঁদপুর (বাঁকুড়া)	
৩২	৫৫৩	২৮।৩
৩১	৫১১	২৬।০
২৮	৩৩২	১৭/৫
২৬	২২৬	১১॥৪
	কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া)	
১৯	১৬৬	৮॥৮
১৯	১৬৩	৮॥২
১৯	১৭৬	৯।৪
১৯	১৮১	৯॥৮
	গঙ্গাজলঘাটী (বাঁকুড়া)	
১০	১৫৫	৮॥০
১০	১২৬	৭/২
১০	১১৯	৬।৭
১০	৮০	৬॥৪
	বাঁকুড়া	
৪	৪৮	২॥০
	কুণ্ডা (সাঁওতাল পরগণা)	
২৭	৩১১	১৬/
২৭	৩১১	১৬/

এই কেন্দ্র হইতে ২৭॥০ মণ বীজ দেওয়া হইয়াছে।

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
	সরমা (সাঁওতাল পরগণা	
৩৪	৩৩০	১৯/
১১	৩০২	১৮/

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
	ব্রাহ্মণবেড়িয়া (ত্রিপুরা)	
৩২	৫৯০	৩০/৬
৩২	৬৪২	৩২/৬৸
৩২	৬৬৪	৩৪/১।
৩২	৭২৬	৩৭/৫
	বিটঘর (ত্রিপুরা)	
৯	৫২০	৩০/
৯	৮৪০	৩০/

বিটঘরকেন্দ্রে প্রত্যেক সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ২ সপ্তাহে /১ সের করিয়া ৬০/ মণ সকরকন্দ আলু দেওয়া হইয়াছে।

	ভারুকাটী (বরিশাল)	
২৮	৫৪৪	১৩/৬

গৃহদাহের সাহায্যার্থে ভুবনেশ্বরে ৯০৲ ও মেদিনীপুরে ৫০৲, আর্থিক সাহায্যার্থে লতাবদীতে ২৫৲ এবং চাউল বিতরণের জন্য ভারুকাটীতে ৩০০৲ টাকা ও দেওয়া হইয়াছে।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে নূতন বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছে—

বেলুড় (হাবড়া) ৪৬, বাগবাজার (কলিকাতা) ৪, বাগদা (মানভূম) ৩৬৪, ইঁদপুর (বাঁকুড়া) ৩৮০, দত্তখোলা (ত্রিপুরা) ৬৬, বিটঘর (ঐ) ৩৬, কুণ্ডা ১১২, সরমা ৯৪, মিহিরাম ৩৪, ভারুকাটী (বরিশাল) ১১৮, গুঠিয়া (ঐ) ৪০, বাসন্তী (ফরিদপুর) ২০, কোটালীপাড়া (ঐ) ৮০, ঢাকা ৫২, কলমা (ঐ) ৪০, লতাবদী (ঐ) ৫২, জয়নগর (২৪ পরগণা) ৪৮।

এতদ্ব্যতীত ইনফ্লুয়েঞ্জার সময়ে পীড়িতব্যক্তিগণকে ঔষধ ও পথ্যাদি দান করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে অনেক দুঃস্থ ব্যক্তিকে বীজধান্য দান ও তাহাদের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে চাউলের দোকান খুলিয়া সস্তাদরে চাউল বিক্রয় করায় অনেকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান।

(স্বামী সারদানন্দ)

কাশীপুরের উদ্যানে আসিবার কয়েক দিন পরে ঠাকুর যেরূপে একদিন নিজ কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্যানপথে স্বল্পক্ষণের জন্য পাদচারণা করিয়াছিলেন তাহা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। উহাতে দুর্ব্বল বোধ করায় প্রায় এক পক্ষকাল তিনি আর ঐরূপ করিতে সাহস করেন নাই। ঐ কালের মধ্যে তাঁহার চিকিৎসার না হইলেও চিকিৎসকের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কলিকাতার বহুবাজার পল্লীনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী অক্রূর দত্তের বংশে জাত রাজেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আলোচনায় ও উহা সহরে প্রচলনে ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ইঁহার সহিত মিলিত হইয়াই হোমিও-মতের সাফল্য ও উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম-পূর্ব্বক ঐ প্রণালী অবলম্বনে চিকিৎসায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঠাকুরের ব্যাধির কথা রাজেন্দ্রবাবু লোকমুখে শ্রবণ করিয়া, এবং তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারিলে হোমিওপ্যাথির সুনাম অনেকের নিকটে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া চিন্তা ও অধ্যয়নাদি সহায়ে ঐ ব্যাধির ঔষধও নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়াছিলেন। গিরিশ চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের সহিত ইনি পরিচিত ছিলেন। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, অতুলকৃষ্ণকে একদিন এই সময়ে কোন স্থানে দেখিতে পাইয়া তিনি সহসা ঠাকুরের শারীরিক অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক তাঁহাকে চিকিৎসা করিবার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং বলেন, "মহেন্দ্রকে বলিও আমি অনেক ভাবিয়া

চিন্তিয়া একটা ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়াছি, সেইটা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাইবার আশা রাখি, তাহার মত থাকিলে সেইটা আমি একবার দিয়া দেখি।" অতুলকৃষ্ণ ভক্তগণকে এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলালকে ঐ বিষয় জানাইলে উহাতে কাহারও আপত্তি না হওয়ায় কয়েকদিন পরেই রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরকে দেখিতে আসেন এবং ব্যাধির আদ্যোপান্ত বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক লাইকোপোডিয়ম (২০০) প্রয়োগ করেন। ঠাকুর উহাতে এক পক্ষেরও অধিককাল বিশেষ উপকার অনুভব করিয়াছিলেন। ভক্তগণের উহাতে মনে হইয়াছিল, তিনি বোধ হয় এইবার অল্পদিনেই পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিবেন।

ক্রমে পৌষমাসের অর্দ্ধেক অতীত হইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী উপস্থিত হইল। ঠাকুর ঐ দিন বিশেষ সুস্থ বোধ করায় কিছুক্ষণ উদ্যানে বেড়াইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অবকাশের দিন বলিয়া সেদিন গৃহস্থ ভক্তগণ মধ্যাহ্ন অতীত হইবার কিছু পরেই একে একে অথবা দলবদ্ধ হইয়া উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐরূপে অপরাহ্ন ৩টার সময় ঠাকুর যখন উদ্যানে বেড়াইবার জন্য উপর হইতে নীচে নামিলেন তখন ত্রিশ জনেরও অধিক ব্যক্তি গৃহ মধ্যে অথবা উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের তলে বসিয়া পরস্পরের সহিত বাক্যালাপে নিযুক্ত ছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া প্রণাম করিল এবং তিনি নিম্নের হলঘরের পশ্চিমের দ্বার দিয়া উদ্যানপথে নামিয়া দক্ষিণ মুখে ফটকের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। ঐরূপে বশতবাটী ও ফটকের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর গিরিশ, রাম, অতুল প্রভৃতি কয়েক জনকে পথের পশ্চিমের বৃক্ষতলে দেখিতে পাইলেন। তাহারাও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তথা হইতে প্রণাম করিয়া সানন্দে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। কেহ কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর সহসা গিরিশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গিরিশ,

তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলিয়া বেড়াও তুমি (আমার সম্বন্ধে) কি দেখিয়াছ ও বুঝিয়াছ?" গিরিশ উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে ভূমিতে জানুসংলগ্ন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধমুখে করজোড়ে গদ্গদ স্বরে বলিয়া উঠিল, "ব্যাসবাল্মীকি যাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কি আর বলিতে পারি!" গিরিশের অন্তরের সরল বিশ্বাস প্রতি কথায় ব্যক্ত হওয়ায় ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া সমবেত ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমাদের কি আর বলিব, আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হউক্!" ভক্তগণের প্রতি প্রেম ও করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি ঐ কথাগুলি মাত্র বলিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। স্বার্থগন্ধহীন তাঁহার সেই গম্ভীর আশীর্ব্বাণী প্রত্যেকের অন্তরে প্রবল আঘাত প্রদান-পূর্ব্বক আনন্দস্পন্দনে উদ্বেল করিয়া তুলিল। তাহারা দেশ কাল ভুলিল, ঠাকুরের ব্যাধি ভুলিল, ব্যাধি আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ না করিবার তাহাদের ইতিপূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ভুলিল এবং সাক্ষাৎ অনুভব করিতে লাগিল যেন তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া কোন এক অপূর্ব্ব দেবতা হৃদয়ে অনন্ত যাতনা ও করুণা পোষণপূর্ব্বক বিন্দুমাত্র নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও মাতার ন্যায় তাহাদিগকে স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় প্রদান করিতে ত্রিদিব হইতে সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন! তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণের জন্য তাহারা তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং জয়রবে দিক্ মুখরিত করিয়া একে একে আসিয়া প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। ঐরূপে প্রণাম করিবার কালে ঠাকুরের করুণাব্ধি আজি বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার উপস্থিত করিল। কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হইয়া দিব্য শক্তিপূতস্পর্শে তাহাকে কৃতার্থ করিতে আমরা ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রায় নিত্যই দেখিয়া-ছিলাম, অদ্য অর্দ্ধবাহ্য দশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে ঐ ভাবে

স্পর্শ করিতে লাগিলেন! বলা বাহুল্য, তাঁহার ঐরূপ আচরণে ভক্তগণের আনন্দের অবধি রহিল না। তাহারা বুঝিল আজি হইতে তিনি নিজ দেবত্বের কথা শুদ্ধ তাহাদিগের নিকটে নহে কিন্তু সংসারে কাহারও নিকটে আর লুক্কায়িত রাখিবেন না, এবং পাপী তাপী সকলে এখন হইতে সমভাবে তাঁহার অভয়পদে আশ্রয় লাভ করিবে—নিজ নিজ ত্রুটি, অভাব ও অসামর্থ্য বোধ হইতে তদ্বিষয়েও তাহাদিগের বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। সুতরাং, ঐ অপূর্ব্ব ঘটনায় কেহবা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহাকে কেবলমাত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কেহবা গৃহমধ্যস্থ সকলকে ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হইবার জন্য চীৎকার করিয়া আহ্বান করিতে লাগিল, আবার কেহবা পুষ্পচয়নপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঠাকুরের অঙ্গে উহা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ঐরূপ হইবার পরে ঠাকুরের ভাব শান্ত হইতে দেখিয়া ভক্তগণও পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল এবং অদ্যকার উদ্যান-ভ্রমণ ঐরূপে পরিসমাপ্ত করিয়া তিনি বাটীর মধ্যে নিজ কক্ষে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

রামচন্দ্র প্রমুখ কোন কোন ভক্ত অদ্যকার এই ঘটনাটিকে ঠাকুরের কল্পতরু হওয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয় উহাকে ঠাকুরের অভয়-প্রকাশ অথবা আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক সকলকে অভয় প্রদান বলিয়া অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। প্রসিদ্ধি আছে, ভাল বা মন্দ যে যাহা প্রার্থনা করে কল্পতরু তাহাকে তাহাই প্রদান করে। কিন্তু ঠাকুর ত ঐরূপ করেন নাই, নিজ দেব-মানবত্বের এবং জনসাধারণকে নির্ব্বিচারে অভয়াশ্রয় প্রদানের পরিচয়ই ঐ ঘটনায় সুব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, যে সকল ব্যক্তি অদ্য তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিল তাহাদিগের ভিতর হারাণচন্দ্র দাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। কারণ, হারাণ প্রণাম করিবামাত্র ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাহার মস্তকে নিজ পাদপদ্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐরূপে কৃপা করিতে

আমরা তাঁহাকে অল্পই দেখিয়াছি। * ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় ঐদিন ঐস্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—'ইতিপূর্ব্বে ইষ্ট মূর্ত্তির ধ্যান করিতে বসিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কতকটা মাত্র মানস নয়নে দেখিতে পাইতাম, যখন পাদপদ্ম দেখিতেছি তখন মুখখানি দেখিতে পাইতাম না—আবার মুখ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্তই হয় ত দেখিতে পাইতাম, শ্রীচরণ দেখিতে পাইতাম না—ঐরূপে যাহা দেখিতাম তাহাকে সজীব বলিয়াও মনে হইত না—অদ্য ঠাকুর স্পর্শ করিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইষ্টমূর্ত্তি হৃদয়পদ্মে সহসা আবির্ভূত হইয়া এককালে নড়িয়া চড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল!'

অদ্যকার ঘটনাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের আট দশ জনের নাম মাত্রই আমাদিগের স্মরণ হইতেছে। যথা—গিরিশ, অতুল, রাম, নবগোপাল, হরমোহন, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী (রায়) হারাণ, রামলাল, অক্ষয়। কথামৃত লেখক মহেন্দ্রনাথও বোধ হয় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তগণের একজনও ঐদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁহাদিগের অনেকে ঠাকুরের সেবাদি ভিন্ন পূর্ব্বরাত্রে অধিকক্ষণ সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকায় ক্লান্ত হইয়া গৃহমধ্যে নিদ্রা যাইতেছিলেন। লাটু ও শরৎ জাগ্রত থাকিলেও এবং ঠাকুরের কক্ষের দক্ষিণে অবস্থিত দ্বিতলের ছাদ হইতে ঐ ঘটনা দেখিতে পাইলেও স্বেচ্ছায় ঘটনাস্থলে গমন করে নাই। কারণ, ঠাকুর উদ্যানে পদচারণ করিতে নীচে নামিবামাত্র তাহারা ঐ অবকাশে তাঁহার শয্যাদি রৌদ্রে দিয়া ঘরখানির সংস্কারে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং কর্ত্তব্য কার্য্য অর্দ্ধ নিষ্পন্ন

* বেলিয়াঘাটা নিবাসী হারাণচন্দ্র কলিকাতার ফিন্‌লে মিওর কোম্পানীর আফিসে কর্ম্ম করিতেন। ঠাকুরের কৃপার স্মরণার্থ তিনি ইদানীং প্রতি বৎসর মহোৎসব করিতেন। স্বল্পদিন হইল দেহ রক্ষাপূর্ব্বক তিনি অভয়ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

করিয়া ফেলিয়া যাইলে ঠাকুরের অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া তাহাদিগের ঘটনাস্থলে যাইতে প্রবৃত্তি হয় নাই।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আরও কয়েক জনকে আমরা অদ্যকার অনুভবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠ নাথ আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা এই বিষয়ের উপসংহার করিব। বৈকুণ্ঠনাথ আমাদিগের সমসাময়িক কালে ঠাকুরের পুণ্য-দর্শন লাভ করিয়াছিল। তদবধি ঠাকুর তাহাকে উপদেশাদি প্রদানপূর্ব্বক যে ভাবে গড়িয়া তুলিতেছিলেন তদ্বিষয়ের কোন কোন কথা আমরা লীলাপ্রসঙ্গের স্থলে স্থলে পাঠককে বলিয়াছি। মন্ত্রদীক্ষা প্রদানে ঠাকুর বৈকুণ্ঠনাথের জীবন ধন্য করিয়াছিলেন। তদবধি সে সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিয়া যাহাতে ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ হয় তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। ঠাকুরের কৃপাভিন্ন ঐ বিষয়ে সফলকাম হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া সে তাঁহার নিকটেও মধ্যে মধ্যে কাতর প্রার্থনা করিতেছিল। এমন সময়ে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন এবং পরে কাশীপুরে গমনরূপ ঘটনা উপস্থিত হইল। ঐ কালের মধ্যেও বৈকুণ্ঠনাথ অবসর পাইয়া দুই তিনবার ঠাকুরকে নিজ মনোগত বাসনা নিবেদন করিয়াছিল। ঠাকুর তাহাতে প্রসন্ন-হাস্যে তাহাকে শান্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "রোস্ না, আমার অসুখটা ভাল হউক, তাহার পর তোর সব করিয়া দিব।"

অদ্যকার ঘটনাস্থলে বৈকুণ্ঠনাথ উপস্থিত ছিল। ঠাকুর ভক্তদিগের মধ্যে দুই তিন জনকে দিব্যশক্তিপূত স্পর্শে কৃতার্থ করিবামাত্র সে তাহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম পুরঃসর বলিল, "মহাশয়, আমায় কৃপা করুন্।" ঠাকুর বলিলেন, "তোমার ত সব হইয়া গিয়াছে।" বৈকুণ্ঠ বলিল, "আপনি যখন বলিতেছেন হইয়াছে তখন নিশ্চয়ই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি যাহাতে উহা অল্পবিস্তর বুঝিতে পারি তাহা করিয়া দিন্। ঠাকুর তাহাতে 'আচ্ছা' বলিয়া ক্ষণেকের জন্য সামান্য ভাবে আমার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিলেন মাত্র।

উহার প্রভাবে কিন্তু আমার অন্তরে অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আকাশ, বাড়ী, গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি যেদিকে যাহা কিছু দেখিতে লাগিলাম তাহারই ভিতরে ঠাকুরের প্রসন্ন হাস্য-দীপ্ত মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। প্রবল আনন্দে এককালে উল্লাসিত হইয়া উঠিলাম এবং ঐ সময়ে তোমাদের ছাদে দেখিতে পাইয়া 'কে কোথায় আছিস্ এই বেলা চলে আয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে থাকিলাম। কয়েক দিন পর্য্যন্ত আমার ঐরূপ ভাব ও দর্শন জাগ্রত কালের সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত রহিল। সকল পদার্থের ভিতর ঠাকুরের পুণ্য দর্শন লাভে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। আফিসে বা কর্ম্মান্তরে অন্যত্র যথায় যাইতে লাগিলাম তথায়ই ঐরূপ হইতে থাকিল। উহাতে উপস্থিত কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে না পারায় ক্ষতি হইতে লাগিল এবং কর্ম্মের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া উক্ত দর্শনকে কিছু কালের জন্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াও ঐরূপ করিতে পারিলাম না। অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় পাইয়া কেন উহা প্রতিসংহারের জন্য তাহার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিদাভাষ হৃদয়ঙ্গম হইল। মুক্ত পুরুষেরা সর্ব্বদা একরস হইয়া থাকেন ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য স্মরণ হওয়ায় কতটা নির্ব্বাসনা হইলে মন উক্ত একরসাবস্থায় থাকিবার সামর্থ্য লাভ করে তাহার কিঞ্চিদাভাষও এই ঘটনায় বুঝিতে পারিলাম। কারণ, কয়েক দিন যাইতে না যাইতে ঐরূপে একই ভাবে একই দর্শন ও চিন্তাপ্রবাহ লইয়া থাকা কষ্টকর বোধ হইল। কখন কখন মনে হইতে লাগিল, পাগল হইব না কি? তখন ঠাকুরের নিকটে আবার সভয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, 'প্রভু আমি এই ভাব ধারণে সক্ষম হইতেছি না, যাহাতে ইহার উপশম হয় তাহা করিয়া দাও!' হায় মানবের দুর্ব্বলতা ও বুদ্ধিহীনত, এখন ভাবি কেন ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম—কেন তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থির রাখিয়া ঐ ভাবের চরম পরিণতি দেখিবার জন্য ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকি নাই?—না হয় উন্মাদ হইতাম, অথবা দেহের পতন হইত। কিন্তু

ঐরূপ প্রার্থনা করিবার পরেই উক্ত দর্শন ও ভাবের সহসা এক দিবস বিরাম হইয়া গেল! আমার দৃঢ় ধারণা, যাঁহা হইতে ঐ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাঁহার দ্বারাই উহা শান্ত হইল। তবে ঐ দর্শনের একান্ত বিলয়ের কথা আমার মনে উদিত হয় নাই বলিয়াই বোধ হয় তিনি কৃপা করিয়া উহার এইটুকু অবশেষ মাত্র রাখিয়াছিলেন যে, দিবসের মধ্যে যখন তখন কয়েকবার তাঁহার সেই দিব্যভাবোদ্দীপ্ত প্রসন্ন মূর্ত্তির অহেতু দর্শন লাভে আনন্দে স্তম্ভিত ও কৃতকৃতার্থ হইতাম।"

জীব ও ঈশ্বরতত্ত্ব।

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মন বা অন্তরিন্দ্রিয় যদি অণুপরিমাণ না হইয়া আমাদের দেহের ন্যায় মহৎ বা বড় হইত, তাহা হইলে একই সময়ে আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সকল প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় না। মনোনিবেশ করিয়া আমরা যখন রূপ দেখি, তখন আমাদের স্পর্শ, গন্ধ, রস বা শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না ইহার কারণ কি? নৈয়ায়িকগণ বলেন, ইহার কারণ মন নিতান্ত ক্ষুদ্র পরিমাণের বস্তু বলিয়া এককালে দুইটী বা ততোধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিতে পারে না; এই কারণে এককালে একটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একপ্রকার বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হয়। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, মনের সহিত যোগ না ঘটিলে কোন ইন্দ্রিয়ই জ্ঞান জন্মাইতে পারে না, সুতরাং বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, মন যখন যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হয় তখন সেই ইন্দ্রিয়ই জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ হয়। মনের পরিমাণ নিতান্ত ছোট বলিয়া একই

সময়ে মন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থিত ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির সহিত মিলিত হইতে পারে না। এই জন্য একই সময়ে দুইটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দুইপ্রকার বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না—ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সেই অণুপরিমাণ মন আত্মা হইতে পারে না; কারণ, আত্মা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ যে দ্রব্যের হয় তাহা মহৎ হওয়া আবশ্যক, না হইলে পার্থিব পরমাণুরও প্রত্যক্ষ হইতে পারিত।

কিন্তু মনের এই প্রকার অণুত্ব সকল দার্শনিকের সম্মত নহে। বৈদান্তিক আচার্য্যগণ মনকে মধ্যম পরিমাণ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, যে যুক্তির সাহায্যে নৈয়ায়িকগণ মনকে অণুপরিমাণ বলিয়া সিদ্ধ করিতে চাহেন তাহা যুক্তিসহ নহে। কারণ একই সময়ে আমাদের দুইটী বা ততোধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বস্তুর বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষ হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্ত সর্ব্বজনসম্মত নহে। সময় বিশেষে একই সময়ে আমাদের একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বহু বিষয়ের ও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহার যথেষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন আমরা সুশীতল সুরভিত সুমিষ্ট জল পান করি, তখন একই সময়ে সেই জলের শৈত্য, সৌরভ ও মিষ্টতার প্রত্যক্ষ আমাদের হইয়া থাকে, ইহা কে অস্বীকার করিবে। সেই একই সময়ে রসনার সাহায্যে আমরা জলের মধুর রসের আস্বাদ করি, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা জলের শৈত্যের অনুভব করি, আর ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার সৌরভের আঘ্রাণ করি। সুতরাং একই সময়ে ত্বগিন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় মিলিত হইয়া আমাদের তিন প্রকার গুণের অর্থাৎ স্পর্শ, গন্ধ ও রসের প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া দেয়। তাহাই যদি হইল, তবে মনের অণুত্ব সিদ্ধ হইল কিরূপে? মন যদি অণু হইত, তাহা হইলে একই সময়ে ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত তাহা মিলিত হইত কিরূপে? সুতরাং মন অণুপরিমাণ হয় বলিয়া তাহা আমাদের আত্মা হইতে পারে না—এই প্রকার যুক্তি দ্বারা মনের আত্মত্ব খণ্ডিত হইতে পারে না। এই

কারণ মনের আত্মত্ব খণ্ডন করিতে হইলে অন্য প্রকারের যুক্তি অবলম্বন করিতে হইবে, সে যুক্তি কি তাহাই এক্ষণে দেখান যাইতেছে।

কোন কার্য্য হইতে গেলে তাহা করণ ও কর্ত্তা এই দুইপ্রকার কারণের অপেক্ষা করিয়া থাকে, ইহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেরই অঙ্গীকার্য্য। দেখ, বৃক্ষের ছেদনরূপ কার্য্য তাহার করণ কুঠারের অপেক্ষা যেমন করে, সেইরূপ কুঠারের চালয়িতা একজন কর্ত্তারও অপেক্ষা করে, কেবল কুঠার বা কেবল কর্ত্তার দ্বারা ছেদন রূপ ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না—ইহা সকলেরই অনুভব সিদ্ধ। প্রকৃত স্থলেও আমাদের সুখ দুঃখ প্রভৃতির যে প্রত্যক্ষ হয়, সেই প্রত্যক্ষ ও কার্য্য, কার্য্য হইলেই তাহার করণ ও কর্ত্তা এই দুইটী পরস্পর বিভিন্নস্বভাবযুক্ত কারণ থাকা চাই বলিয়া, এই সুখ দুঃখ প্রভৃতির অনুভূতিরূপ কার্য্য একটী করণ ও তাহা হইতে ভিন্ন একটী কর্ত্তার অপেক্ষা করিবেই ইহা স্থির—মন হইতেছে সেই অনুভূতির করণ, সুতরাং তাহার কর্ত্তা যে মন হইতে ভিন্ন তাহাও স্থির—সেই কর্ত্তাকেই আত্মা বলা উচিত। আমাদের সর্ব্বসাধারণ অনুভবও আমাদিগকে ইহাই বুঝাইয়া দেয় কারণ আমরা সকলেই বুঝি ও বলিয়া থাকি যে, আমি মনের দ্বারা সুখ বা দুঃখের অনুভব করিতেছি। এই প্রকার অনুভব আমাদিগকে স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে যে, আমি ও মন এক বস্তু নহি; মন আমার অনুভূতিরূপ কার্য্যের করণ, আর সেই অনুভূতিরূপ কার্য্যের যে কর্ত্তা তাহা আমি। সুতরাং যুক্তি ও অনুভব মিলিত হইয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে, আমি মন নহি, কিন্তু মন আমার অনুভূতিরূপ কার্য্যের সহায় মাত্র। এই কারণে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, মন বা অন্তরিন্দ্রিয় কখনই আত্মা হইতে পারে না। তাহাই যদি হইল তবে সে আত্মার স্বরূপ কি? তাহা মনের আত্মত্ববাদী নির্ণয় করিতে পারিলেন না। এক্ষণে দেখা যাক্ অপর দার্শনিকগণ সেই আত্মার তত্ত্ব নিরূপণ কি ভাবে করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধমতে আত্মতত্ত্ব

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে,—

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তিনি আত্মতত্ত্ব বিষয়ে কিরূপ মতের প্রচার করিয়াছিলেন সাক্ষাদ্ভাবে তাহা এখন জানিবার উপায় নাই; কারণ, তিনি নিজমত প্রচার করিবার জন্য কোন গ্রন্থ নিজে রচনা করেন নাই। তাঁহার শিষ্য সন্ন্যাসী বিরক্ত ভিক্ষুগণ তাঁহারই মুখে যে সকল উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহাই আবার নিজ সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু কোন প্রকার গ্রন্থ রচনা করেন নাই। এই ভাবে প্রায় একশত বৎসর কাটিয়া যাইবার পর, যখন বৌদ্ধসম্প্রদায়ে বুদ্ধদেবের প্রশিষ্যগণের মধ্যে নানাকারণে কোন্‌টী বুদ্ধদেবের প্রকৃত উক্তি আর কোন্‌টী নহে তাহা লইয়া সংশয় ও তর্ক উঠিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় বৌদ্ধস্থবিরগণ মিলিত হইয়া একটী সঙ্গীতি বা মহাসম্মিলনী করিয়াছিলেন। সেই মহাসম্মিলনীতে কতিপয় নির্ব্বাচিত বৌদ্ধস্থবির মিলিত হইয়া ঐকমত্যসহকারে কতকগুলি ভগবান্ বুদ্ধদেবের বচন সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থই বর্ত্তমান বৌদ্ধত্রিপিটক নামক বিরাট মহাগ্রন্থসমূহের মূলগ্রন্থ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এইরূপ একশতবৎসর পরে উত্তরোত্তর আরও দুইটী সঙ্গীতি বা বৌদ্ধ মহাসম্মিলন আহূত হইয়াছিল। ঐ দুইটী সম্মিলনীতে এইভাবে বৌদ্ধভিক্ষুগণ মিলিত হইয়া শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে চলিত বৌদ্ধমতগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহাই পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল পুস্তক পালি বা তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল; সংস্কৃত ভাষায় একখানিও রচিত হয় নাই। খ্রীষ্টিয় শতাব্দীর আরম্ভের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বপর্য্যন্ত এইরূপে প্রাকৃতভাষায়

ভারতে বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল। পরে মহাযান নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল। এই মহাযান সম্প্রদায়ের আচার্য্য অসঙ্গ, নাগার্জ্জুন, ধর্ম্মকীর্ত্তি ও দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ভিক্ষুগণ ক্রমে সংস্কৃত ভাষায় এই নবোদিত বৌদ্ধ দার্শনিক মতের প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ দার্শনিক-গ্রন্থগুলি এখনও অধিকাংশভাবে অনাবিষ্কৃত বা বিলুপ্ত হইয়াছে। আচার্য্য কুমারিলভট্ট, গৌড়পাদ ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পুনরুদীয়মান সনাতনধর্ম্মের নেতৃবৃন্দ যে সময়ে ভারতের দার্শনিক সাম্রাজ্যের বরণীয় সিংহাসনে চক্রবর্ত্তীরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে ঐ সকল সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ মহাযান গ্রন্থসমূহের যে বিশেষ ভাবে প্রচার ছিল, তাহার বহুতর প্রমাণ ঐ সকল মহাত্মাগণের রচিত গ্রন্থসমূহে উপলব্ধ হইয়া থাকে। সেই সকল প্রমাণের সাহায্যে বৌদ্ধগণ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে কিরূপ মতাবলম্বী ছিলেন, তাহাই এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হইবে,—

সংস্কৃত দার্শনিকগণ বৌদ্ধমতকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—যথা সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই দুই মতে বাহ্য ঘটপটাদি বস্তুর সত্তাও অঙ্গীকৃত হইয়াছে ; এই কারণে, এই দুইটী মতকে সর্ব্বাস্তিত্ব-বাদীর মত বলিয়া আচার্য্যশঙ্কর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুইটী মতের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য এই যে, সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যপদার্থের সত্তা অঙ্গীকৃত হইলেও তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোচর নহে, কিন্তু অনুমেয় ইহাই সিদ্ধান্ত। যোগাচার মতে কিন্তু বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও গোচর হইয়া থাকে ইহাই বিশেষ। বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে কিনা এই বিষয়ে এই উভয় মতে পরস্পর বিরোধ থাকিলেও উভয় মতেই আত্মস্বরূপ-নির্ণয় একই প্রকার। এই জন্যই প্রথমে এই দুইমতে আত্মস্বরূপ কি ভাবে নির্ণীত হইয়াছে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে—

সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতে জীবতত্ত্ব

এই মত-দ্বয়ে বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে পদার্থ দুইপ্রকার। বাহ্য বস্তুও দুই প্রকার, ভূত ও ভৌতিক। ভূত কিন্তু চারি প্রকার, যথা ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু। এই চারিপ্রকার ভূতের গুণ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ প্রভৃতি এবং এই ভূতসমূহ হইতে সমুৎপন্ন বহিরিন্দ্রিয়-গুলিই ভৌতিক। ইঁহারা আকাশ বলিয়া একটী পৃথক্ ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, আকাশকে ইঁহারা অভাব স্বরূপই বলিয়া থাকেন। মোটের উপর বাহ্য প্রপঞ্চ বলিলে, এই ভূত ও ভৌতিক দ্বিবিধ বস্তুকে বুঝা যায়। আভ্যন্তর বস্তুও দুইপ্রকার যথা, চিত্ত ও চৈত্ত — চিত্ত শব্দের অর্থ বিজ্ঞান স্কন্ধ বা বিজ্ঞান প্রবাহ ; চৈত্ত শব্দের অর্থ রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ—স্কন্ধশব্দের অর্থ ধারা, প্রবাহ বা সন্ততি কিম্বা সমষ্টি। রূপস্কন্ধ শব্দের অর্থ—নিজ নিজ বিষয়ের সহিত বর্ত্তমান যে চক্ষুরাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়, তাহাই। অর্থাৎ বিষয়াকার পরিণামযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহই রূপস্কন্ধ শব্দের অর্থ। সুখ ও দুঃখ প্রভৃতির অনুভূতিই বেদনাস্কন্ধ। এইটী গোরু, এইটী অশ্ব এই প্রকার নাম শুনিলে যে বিশেষ্য ও বিশেষণের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক প্রতীতি হয় অর্থাৎ এইটী গোরু, এইটী অশ্ব, এইপ্রকার শব্দ শ্রবণ করিবার পর আমাদিগের যে প্রতীতি বা জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই সংজ্ঞাস্কন্ধ। আসক্তি, বিদ্বেষ, মোহ, ধর্ম্ম বা পুণ্য এবং অধর্ম্ম বা পাপ প্রভৃতি গুণগুলিই সংস্কারস্কন্ধ। এবং আমি আমি এইরূপ জ্ঞান প্রবাহগুলিই বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই বিজ্ঞানস্কন্ধের আর একটী নাম আলয়-বিজ্ঞান।

এই পাঁচ প্রকার স্কন্ধের মধ্যে আলয়-বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান-স্কন্ধই চিত্ত বা আত্মা এবং অন্য চারিটী স্কন্ধকে চৈত্ত বলে। এই চিত্ত ও চৈত্তের যে সংঘাত বা সমষ্টি তাহাই আধ্যাত্মিক বা আভ্যন্তরতত্ত্ব—ইহা ছাড়া সকল বস্তুই বাহ্য বলিয়া স্বীকৃত।

এই সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক নামে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমতে কোন বস্তুই স্থায়ী নহে ; সকল বস্তুই এই মতে ক্ষণিক, সকল বস্তুই

উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়, কোন বস্তুই এক্ক্ষণের অধিক থাকে না, এইরূপে সকল বস্তুকেই দ্বিতীয় ক্ষণে বিনাশী বলায় বৌদ্ধগণের নাম হইয়াছে বৈনাশিক।

যে প্রকার যুক্তিদ্বারা বৌদ্ধগণ সকল বস্তুকেই ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

বৌদ্ধদার্শনিক বলেন যে, কোন বস্তুই এক্ক্ষণের অধিক থাকিতে পারে না। কারণ স্থায়ী বস্তু কখনই সৎ বা সত্তাযুক্ত হইতে পারে না, এই সিদ্ধান্তটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে সত্তা বা অস্তিত্ব কাহাকে বলে অগ্রে তাহাই বুঝিতে হইবে। নৈয়ায়িক প্রভৃতি স্থিরবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে, সত্তা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের ধর্ম্ম। বস্তু উৎপন্ন হইলে তাহার সহিত সত্তার সম্বন্ধ হয় বলিয়া তাহারা সৎ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। তাঁহাদের মতে দ্রব্যগুণ প্রভৃতি ধর্ম্মী বা আশ্রয়; সত্তা তাহাদের ধর্ম্ম—এই ভাবে অতিরিক্ত সত্তারূপ একটী নিত্য সিদ্ধ ধর্ম্মের দ্বারা কোন বস্তুকে সৎ বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, দ্রব্য বা গুণ প্রভৃতির সহিত ঐরূপ সত্তার সম্বন্ধ কি তাহাই নিরূপণ করা যায় না; যখন সম্বন্ধই বুঝা যায় না তখন সেই সম্বন্ধে সত্তা-যুক্ত হইলে বস্তু সৎ হয় এই প্রকার সিদ্ধান্ত কিরূপে যুক্তিসহ হইতে পারে? দেখ সম্বন্ধ সেই দুইটী বস্তুরই মধ্যে সম্ভবপর, যে দুইটী বস্তু পরস্পর পৃথক্‌ভাবে থাকিয়া পরে মিলিত হইয়া থাকে। আমার হস্তের সহিত এই লেখনীর সম্বন্ধ আছে, কিন্তু এই লেখনী ও হস্তের সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে লেখনী ও হস্ত এই দুইটী বস্তুই পরস্পর পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান ছিল, সুতরাং এই দুইটীর মধ্যে সম্বন্ধও হইয়াছে; যে বস্তু সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বক্ষণে থাকে না তাহার সহিত কোন বস্তুরই সম্বন্ধ হইতে পারে ইহা কখনও সম্ভবপর নহে—ইহাই যদি প্রমাণ সিদ্ধ নিয়ম হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি ঘটের সহিত সত্তার সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ঘট ছিল কি না? যদি বল ছিল,

তাহা হইলে বলিব, সত্তার সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ঘট যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব ত সত্তার সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়া গেল, তবে আবার তাহাকে সৎ বলিয়া বুঝাইবার জন্য সত্তার সম্বন্ধের ভার তাহার উপর চাপাইয়া লাভ কি? আর যদি বল সত্তার সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বক্ষণে ঘটের অস্তিত্ব ছিল না, তাহা হইলে বলিব ঘটের যখন অস্তিত্ব নাই তখন তাহা অসৎ বা গগনকুসুম-কল্প অর্থাৎ অলীক। দুই সদ্ বস্তুরই পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া থাকে; অসতের সহিত অর্থাৎ অলীকের সহিত কোন সদ্ বস্তুর কোন প্রকার সম্বন্ধই হইতে পারে না—ইহা ত সকলেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং সত্তার সহিত সম্বন্ধ হইলে ঘটাদি বস্তু সৎ হয় এই প্রকার অতিরিক্ত সত্তাবাদীর মত কোন প্রকারেই যুক্তিসহ হইতেছে না। এই কারণে নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে যে ভাবে বস্তুর সত্তা নিরূপণ করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে তাহা কিছুতেই প্রমাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ইহার উপর নৈয়ায়িকগণ একটী কথা বলিয়া থাকেন তাহাও যে যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহাই এইক্ষণে দেখান যাইতেছে—নৈয়ায়িকগণ বলেন যে সম্বন্ধ যদি সকল স্থানে একই প্রকারের হইত, তাহা হইলে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের উল্লিখিত যুক্তি অখণ্ডনীয় বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারিত, কিন্তু বাস্তবিক সকল সম্বন্ধই যে একই প্রকারের হইবে তাহা বলা যায় না। বস্তুতঃ, সম্বন্ধ দ্বিবিধ হইয়া থাকে যথা, যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ ও অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ। যে বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি সম্ভবপর, সেই বস্তু দুইটীর যে পরস্পর সম্বন্ধ, তাহারই নাম যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ যেমন পূর্ব্বোক্ত লেখনী ও হস্তের সম্বন্ধ যুতসিদ্ধই হইয়া থাকে। আর যে বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি সম্ভবপর নহে, সেই বস্তু দুইটীর যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহাই অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ, যেমন দ্রব্যের সহিত গুণের বা ক্রিয়ার যে সম্বন্ধ, তাহা অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ। কারণ, দ্রব্য ও গুণ অথবা দ্রব্য বা ক্রিয়া পরস্পর সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না;

অর্থাৎ লেখনী ও হস্ত এই দুইটী বস্তু যেমন সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে পরস্পর পৃথক্‌ভাবে দুইটী বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া প্রতীত হয় সেইরূপ দ্রব্য ও তাহার গুণ বা ক্রিয়া সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে পৃথক্‌ভাবে আমাদের নিকট স্বতন্ত্র বা পৃথক্ দুইটী বস্তু বলিয়া প্রতীত হয় না; এই কারণে দ্রব্যের সহিত তদীয় গুণ বা ক্রিয়ার যে সম্বন্ধ তাহাকে অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ বলিতে হইবে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সত্তার সহিত ঘটাদি দ্রব্যের সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া যে দোষের উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেই দোষ তবেই সম্ভবপর হইত, যদি সত্তা ও ঘটাদির সম্বন্ধ যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ হইত। বাস্তবপক্ষে, কিন্তু তাহা নহে; কারণ, সত্তার সহিত ঘটাদি দ্রব্যের যে সম্বন্ধ আছে তাহা অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ, যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ নহে, তাঁহারা যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঘটাদি বস্তুর সহিত সত্তার যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে, আমরাও বলিতেছি না, ঘটাদি দ্রব্যের সহিত সত্তার যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ আমরাও মানি না। তাহাদের মধ্যে অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধই হইয়া থাকে, সুতরাং যুতসিদ্ধ সম্বন্ধের অঙ্গীকার করিলে যে সকল আপত্তি উঠিতে পারে, তাহার দ্বারা অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধবাদীর মত কিছুতেই খণ্ডিত হইতে পারে না।

এইক্ষণে দেখা যাক নৈয়ায়িক দার্শনিকগণের এই প্রকার যুক্তির খণ্ডন করিতে যাইয়া বৌদ্ধদার্শনিকগণ কিরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শঙ্করের কুলপরিচয় ও জন্ম।

(শ্রীমতী—)

শিবগুরু গুরুগৃহে এক মনে বিদ্যাভ্যাসে রত, তাঁহার বিদ্যানুরাগ দর্শনে অধ্যাপক মহাশয় পরম পরিতুষ্ট। পিতা বিদ্যাধিরাজ পুত্রের পাঠপ্রিয়তা শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত। এইরূপে অবাধে বহু বর্ষ অতীত হইয়া গেল। শিবগুরু যৌবনে পদার্পণ করিলেন ও গুরু-গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার সঙ্গে বেদাধ্যয়ন শেষ হইয়া গেল। তিনি এক্ষণে গুরুসন্নিধানে থাকিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য লোকমুখে নানাদিকে ঘোষিত হইতে লাগিল। বিদ্যাধিরাজ পুত্রের কৃতিত্ব শ্রবণে অপার আনন্দ লাভ করিলেন, বিদ্যার যাহা ফল, তাহা ক্রমে শিবগুরুতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা নিত্য নিয়মিত পূজার্চ্চনা গুরুসেবা এবং অবকাশ পাইলেই নিভৃতে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। লোক সমাগম তাঁহার ভাল লাগিত না, গুরুগৃহে আগন্তুক দেখিলেই তিনি প্রস্থান করেন। তাঁহার সদাচার, নিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণোচিত অনুষ্ঠান দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় যারপর নাই প্রীত। স্বরোপিত অমৃতবৃক্ষ ফলবান্ হইলে কাহার না আনন্দ হয়?

বিদ্যাধিরাজ লোক মুখে পুত্রের যশঃ শ্রবণে যেমন সুখী হইয়াছিলেন, পুত্রের কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের সংবাদে কিন্তু তেমনি চিন্তিতও হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইয়া গেল তথাপি পুত্র গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন না ইহাই তাঁহার বিশেষ চিন্তার বিষয়।

পুত্র সৎ হউক, পিতামাতার যেরূপ কামনা, কন্যা সৎপাত্রে

সমর্পিত হয় ইহাও তদ্রূপ কামনার বিষয়। বিদ্যাধিরাজের আদর্শ-পুত্রের আদর্শ চরিত্রের কথা শুনিয়া অনেক জনক জননী শিবগুরুর জন্য লালায়িত হইলেন। বহু কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ বিদ্যাধিরাজের নিকটে আসিতে লাগিলেন। বিদ্যাধিরাজ সকলকেই মিষ্টবাক্যে জানাইলেন যে, পুত্র গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিলেই তিনি পুত্রের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি শীঘ্রই পুত্রকে আনয়ন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

এইরূপে অধিক দিন অতীত হইতে না হইতেই বিদ্যাধিরাজ শিবগুরুর অধ্যাপক মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিলেন ও পুত্রকে গৃহে আনয়ন করিবার আদেশ ভিক্ষা করিলেন।

শিবগুরুর আচার্য্য পত্রোত্তরে বিদ্যাধিরাজকে জানাইলেন যে, শিবগুরুর শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, অতএব তিনি এক্ষণে গৃহে গমন করিয়া সংসারী হউন ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

বিদ্যাধিরাজ শিবগুরুর অধ্যাপক মহাশয়ের পত্র পাইয়া অবিলম্বে যথাশক্তি নানাবিধ উপঢৌকনাদি সংগ্রহ করিয়া পুত্রের গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। উপহারদ্রব্য-সম্ভার অধ্যাপক চরণে অর্পণ করিয়া পুত্রকে গৃহে লইয়া যাইবার অনুমতি চাহিলেন।

অধ্যাপক মহাশয় শিবগুরুকে আহ্বান করিলেন ও আনন্দে গদ্গদভাবে বলিলেন, "বৎস! অধ্যয়ন শেষ হইয়াছে, অধ্যাপনাতেও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছ, চরিত্রে তুমি সহাধ্যায়িগণকে পরাজিত করিয়াছ, এক্ষণে তোমার পিতা তোমায় গৃহে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন, তুমি তাঁহার অনুগমন কর আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বধর্ম্মপালনে সমর্থ হইবে।" গুরুবাক্য শ্রবণে শিবগুরু বাত্যাহত বৃক্ষের ন্যায় বিচলিত হইলেন, তিনি করজোড়ে গুরুচরণে নিবেদন করিলেন যে, তিনি সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন না, আচার্য্যের আদেশ পাইলে আজীবন গুরু সন্নিধানেই বাস করিবেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য।

পুত্রের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে বিদ্যাধিরাজ মনে মনে নিতান্ত শঙ্কিত

হইলেন। তিনি পুত্রকে যথোচিত উপদেশ-বাক্যে গৃহে ফিরিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অধ্যাপক মহাশয়ও শিবগুরুকে বুঝাইলেন ও পুনঃ পুনঃ গৃহে ফিরিবার আদেশ প্রদান করিলেন। শিবগুরু বুঝিলেন তাঁহার অভীষ্ট সহজে সিদ্ধ হইবার নহে। অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনি পিতার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিদ্যাধিরাজ পুত্রকে গৃহে আনয়ন করিলেন কিন্তু শিবগুরু গৃহে আসিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধিরাজ পুত্রের আচরণ দেখিয়া মনে মনে অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু পুত্র যদি ক্রমে সংসারবিরাগী হয়, এই চিন্তায় ক্রমে উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন।

এদিকে শিবগুরু গৃহে আসিয়াছেন শুনিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রায়ই বিদ্যাধিরাজের নিকটে আসিতে লাগিলেন। একদিন বিদ্যাধিরাজ শিবগুরুকে কহিলেন, "বৎস, তোমাকে কন্যাদান করিবার ইচ্ছায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ বহুদিন হইতে আমার নিকট যাতায়াত করিতেছেন। তন্মধ্যে যাঁহার কন্যা আমাদের মনোনীত হইবে তাঁহার সহিতই কুটুম্বিতা স্থাপন করিব ভাবিতেছি। আমাদের ইচ্ছা তুমি এইবার বিবাহ করিয়া সংসারী হও।"

পিতৃবাক্যে শিবগুরু এবার আর চমকিত হইলেন না, কিন্তু, বিমর্ষের ছায়া তাঁহার মুখচন্দ্রমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তিনি সবিনয়ে পিতাকে জানাইলেন যে, তাঁহার সংসার আশ্রমে কোনরূপ স্পৃহা নাই, তিনি আজীবন অধ্যয়ন অধ্যাপনাতেই নিরত থাকিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন ইহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। অতএব বিবাহ তিনি করিতে পারিবেন না।

বিদ্যাধিরাজ বহুদিন হইতে এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন এবং তজ্জন্য পুত্রকে গৃহে আনিয়াও এতদিন এরূপ প্রস্তাব করেন নাই। এক্ষণে তিনি পুত্রের কথায় মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মায়ার বন্ধন অতি দৃঢ়, তিনি সুযোগ পাইলেই পুত্রকে বিবাহের জন্য অনুরোধ

করিতে লাগিলেন এবং শিবগুরুও কিছুতেই সম্মত হন না। পুত্রের ঔদাসীন্যে জননী যত ব্যাকুলা হয়েন, পিতা তত নহেন, তাই শিবগুরুর ঔদাসীন্যে বিদ্যাধিরাজ মনে মনে দুঃখিত হইলেও ততবেশী ব্যস্ত বা কাতর নাই। কিন্তু তাঁহার পত্নী পুত্রের এই ভাব দেখিয়া সাতিশয় ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। তিনি বিদ্যাধিরাজের নিকট পুত্রের বিবাহের জন্য কখনও বা অনুযোগ করেন কখনও বা অবলার বল ক্রন্দনের শরণাপন্ন হন।

বিদ্যাধিরাজও এবিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না—পুত্র সংসারী না হইলে পিতৃকুলের পিণ্ড লোপ, বংশ লোপ, পিতৃপুরুষের জলতর্পণ লোপ হইবে এই চিন্তায় তিনি সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকিতেন। তদ্ভিন্ন কন্যাদায়-গ্রস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সানুনয় অনুরোধ, অথচ সে অনুরোধ রক্ষায় তিনি অসমর্থ বলিয়া তাঁহাদের নিকট লজ্জিত হইতে ছিলেন। এক্ষণে পত্নীর ব্যাকুলতায় তিনি যেন বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে দিনের পর দিন যাইতেছে, সহসা একদিন শিবগুরুর আচার্য্য বিদ্যাধিরাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য্যকে দেখিয়া বিদ্যাধিরাজ যেন অকূলে কূল পাইলেন। শিবগুরুও স্বীয় আচার্য্যকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা পিতাপুত্রে আচার্য্যের চরণে প্রণিপাত করিলেন।

আচার্য্য তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক শিবগুরুকে নিকটে বসাইলেন এবং শিবগুরুর মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক বলিলেন,—"বৎস, আমি লোকমুখে শুনিলাম তুমি বিবাহে অনিচ্ছুক। তুমি সংসার-আশ্রম গ্রহণ করিবে না, সন্ন্যাসী হইবে ইহাই তোমার ইচ্ছা। কয়েকটী ব্রাহ্মণের বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, তাঁহারা তোমার পিতার নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি বিবাহে অসম্মত জানিয়া তাঁহারা দুঃখিতচিত্তে আমার নিকট গমন করিয়াছিলেন। বৎস! আমি তাঁহাদের অনুরোধে আজ তোমার পিতৃগৃহে আসিয়াছি। এক্ষণে আমার এই ইচ্ছা যে, তুমি বিবাহ করিয়া সংসারী হও। জগতে সদ্ব্রাহ্মণ অতি দুর্ল্লভ, তুমি সেই ব্রাহ্মণগণের অলঙ্কার। তোমার বংশ

রক্ষা পাইলে জগতে সদ্‌ব্রাহ্মণের বংশ বৃদ্ধি পাইবে। বিদ্যাদান যেরূপ শ্রেষ্ঠ, জগতকে একটি সৎপুত্র প্রদান করাও তেমনি শ্রেষ্ঠ। তুমি তাহা হইতে জগতকে বঞ্চিত করিও না। আমার আদেশে তুমি বিবাহ কর, তোমার কোনও ভয়ের কারণ নাই। শাস্ত্রানুসারে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিলে তুমি মোক্ষমার্গ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তুমি আমার বাক্যপালন কর, তোমার উত্তম গতি লাভ হইবে"।

গুরুভক্ত শিবগুরু গুরুর আদেশ শ্রবণে নতশিরে মৌন হইয়া রহিলেন। তিনি জানিতেন গুরুবাক্য পালনই প্রধান ধর্ম্ম, গুরু বাক্যের প্রতিবাদ করা শিষ্যের অকর্ত্তব্য। সুতরাং তিনি নিরুত্তর রহিলেন। আচার্য্যও "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্" বুঝিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই সুযোগে বিদ্যাধিরাজও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তিনিও পুত্রকে মিষ্টবাক্যে অনেক বুঝাইলেন। শিবগুরুর জননী সাশ্রুনয়নে পুত্রের হস্তধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—"বাবা তুমি বিবাহ না করিলে আমার শ্বশুরবংশ নির্ব্বংশ হইবেন, লোকে অভিশাপ দিয়া থাকে যে 'তুমি নির্ব্বংশ হও' নির্ব্বংশের তুল্য কষ্ট আর কি আছে?" অতএব তুমি বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা কর।

এইবার শিবগুরু নিরুপায়, তিনি বুঝিলেন—প্রবল প্রারব্ধেরই ইহা সূচক। সুতরাং "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এই কথা স্মরণ করিয়া তিনি বিবাহে সম্মত হইলেন।

পুত্রের সম্মতি পাইয়া বিদ্যাধিরাজদম্পতী সানন্দে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিলেন।

শিবগুরু বিবাহে সম্মত, এ কথা ক্ষণকাল মধ্যেই আত্মীয়জন মধ্যে প্রচারিত হইল। যে সকল ব্রাহ্মণেরা এতদিন শিবগুরুকে কন্যাদানের জন্য উৎসুক ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে দলে দলে বিদ্যাধিরাজের নিকটে আসিতে লাগিলেন।

কালটী গ্রামের অদূরে মঘপণ্ডিতের বাস। তিনি মনে মনে শিবগুরুকে জামাতা করিবার ইচ্ছা করিলেও এপর্য্যন্ত বিদ্যাধিরাজের

নিকট আসেন নাই। শিবগুরুর বিবাহে সম্মতির কথা অবগত হইয়া আজ তিনিও বিদ্যাধিরাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজ সুন্দরী ও সুশীলা কন্যার গুণগ্রামের পরিচয় দিয়া বিদ্যাধিরাজকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাধিরাজ সকলকেই যেমন বলেন তদ্রূপ তাঁহাকেও আশা দিয়া বলিলেন,—"মহাশয় পাত্রী সুলক্ষণাক্রান্ত হইলে বিবাহ বিষয়ে কোনও আপত্তি নাই।" আপনি কন্যা প্রদর্শনের দিন স্থির করুন।

ব্রাহ্মণকে বিদায় প্রদান করিয়া বিদ্যাধিরাজ পাত্রীর গুণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

তিনি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিলেন, মঘপণ্ডিতের এই কন্যাটী রূপেগুণে অনুপমা। কন্যার নাম বিশিষ্টা। বিশিষ্টা অতি সুশীলা, গৃহকর্ম্মে নিপুণা,দেবদ্বিজে ভক্তিমতী, ধর্ম্মাচরণে সর্ব্বদাই উৎসুকা, পূজনীয়জনের সেবাপরায়ণা, কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহশীলা এবং অতিশয় বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী বালিকা। কন্যার বিষয় অবগত হইয়া বিদ্যাধিরাজ পরম সুখী হইলেন এবং মনে মনে এই কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহের স্থির করিলেন। কন্যার কুল-পরিচয় তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। মঘপণ্ডিত অতি সদ্‌বংশীয় সদাচারসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন। সুতরাং বিবাহে আর আপত্তি কি হইতে পারে।

যথাসময়ে উভয় পক্ষেরই পাত্রপাত্রী দেখা হইয়া গেল। বিবাহের পূর্ব্বে যাহা কিছু করণীয় তাহাও করা হইল। অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণে শিবগুরু বিশিষ্টা দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিদ্যাধিরাজ পত্নীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি পুত্রসহ নববধূ বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন এবং বধূর অনুপম রূপমাধুর্য্য দেখিয়া আনন্দে গদগদ হইলেন। সমাগত আত্মীয় কুটুম্বজনও নববধূর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, সকলেই একবাক্যে বধূর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহাতে বিদ্যাধিরাজ পত্নীর আনন্দ আরও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। ক্রমে যথাবিধি শুভ-বিবাহের সমুদয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। সমাগত কুটুম্ববর্গ বিদায় গ্রহণ করিলেন। নববধূও পিতৃগৃহে গমন করিলেন।

বিদ্যাধিরাজদম্পতীও পুত্র সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন, তাঁহাদের অস্থির মন সুস্থির হইল।

বৎসরান্তে শুভদিনে নববধূ শ্বশুরালয়ে দ্বিরাগমন করিলেন এবং শ্বশুরঘর করিতে লাগিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল বিশিষ্টা দেবীর মধুর প্রকৃতি, বিনয়নম্র আচরণ এবং শান্তস্বভাবে বিদ্যাধিরাজ-দম্পতী বড়ই সুখী হইলেন। শিবগুরু মনোমত পত্নীলাভে মনে মনে সন্তুষ্ট। গুরুর আদেশে শাস্ত্রমত গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালনই এখন তাঁহার লক্ষ্য হইল।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইল। বিশিষ্টা দেবী যৌবনে পদার্পণ করিলেন। শিবগুরুর পিতামাতা সর্ব্বদাই বধূর সন্তান সম্ভাবনার আশায় আশান্বিত থাকেন। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিল, বিশিষ্টা দেবীর পুত্র সম্ভাবনার কোনও লক্ষণই প্রকাশ পাইল না।

বৃদ্ধ বিদ্যাধিরাজ কিন্তু নিশ্চিন্ত নহেন, তিনি বধূর পুত্রাকাঙ্ক্ষায় নানারূপ ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। শ্বশুর শাশুড়ীর উপদেশমত বিশিষ্টা দেবী কত বার, ব্রত, উপবাস, পূজার্চ্চনা, করিতে লাগিলেন, কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণের চরণে কতবারই ধন্না দেওয়া হইল, ঔষধ সেবন, মাদুলী ধারণ কিছুরই ত্রুটি হইল না। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ, তাঁহার প্রতি ষষ্ঠীদেবীর কৃপা হইল না।

এইবার শিবগুরুর পিতামাতা বধূর পুত্রসম্বন্ধে বিষম সন্দিহান হইলেন। এমন রূপগুণবতী বধূ শেষে বন্ধ্যা হইল, ইহা অপেক্ষা কষ্টের বিষয় আর কি আছে? বংশরক্ষার জন্য বহু অনুনয় বিনয়ে পুত্রকে বিবাহে সম্মত করাইয়াছিলেন, এক্ষণে সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল ইহা কি অল্প পরিতাপের কথা! ওদিকে তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, আর কতদিনই বা জীবিত থাকিবেন। এখনও যদি বধূর পুত্র না হইল, তবে আর পৌত্রমুখ সন্দর্শন কিরূপে করিবেন? এই সব চিন্তায় বৃদ্ধদম্পতী বড়ই মনকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

শিবগুরু পিতামাতার মনকষ্ট বুঝিয়া মনে মনে বড়ই অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরাধীন কর্ম্মে মনুষ্যের কি হাত আছে? তাঁহাদের চিন্তা ও অশান্তিই সার হইল।

দুঃখের উপর দুঃখ। অল্পদিনের মধ্যেই একে একে বৃদ্ধ বিদ্যাধিরাজ দম্পতীও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। যদিও তাঁহাদের বয়স যথেষ্ট হইয়াছিল তথাপি পিতামাতার অভাবে শিবগুরু যেন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। কারণ, তিনি পিতৃমাতৃ আদেশে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রমতেই সংসারধর্ম্ম পালন করিতেন, সংসারের কোনরূপ ভার তাঁহাকে বহন করিতে হইত না, তাঁহাকে সংসারের কোনও জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ কখন করিতে হইত না, শাস্ত্রচর্চ্চাতেই অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতেন। কেবল ইহাই নহে, পিতামাতার শোকেও তিনি কাতর হইলেন, কারণ তাঁহারা পৌত্রমুখ দর্শন করিতে পারিলেন না, বংশ রক্ষাও হইল না। পণ্ডিত শিবগুরু এই সকল চিন্তায় বড়ই কাতর হইলেন, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান এসময় আর তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না।

যথা সময়ে যথারীতি শিবগুরু পিতামাতার আদ্যকৃত সম্পন্ন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই শিবগুরুর যৌবনকালের ন্যায় পুনরায় যেন ঔদাসীন্য দেখা দিল। তিনি সদাই চিন্তামগ্ন প্রায়ই নির্জ্জনে থাকেন, অধ্যয়নাধ্যাপনাতেও আর পূর্ব্ববৎ উৎসাহ নাই, কাহারও সহিত বড় দেখাশুনা করেন না। তিনি এখন কেবলই ভাবেন, বংশ রক্ষার জন্যই গুরু-আদেশে বিবাহ করিলাম, কিন্তু তাহা ত হইল না, তবে আর সংসারে প্রয়োজন কি? পিতামাতাও গত হইয়াছেন তাঁহাদের জন্যই সংসারী হইয়াছিলাম, এক্ষণে আর আমার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কেন, এক্ষণে আমার সন্ন্যাসই শ্রেয়ঃ। কিন্তু যখন পতিব্রতা বিশিষ্টা দেবীর মলিন মুখচন্দ্রমা দর্শন করিতেন তখনই তাঁহার সে বাসনা যেন কোথায় চলিয়া যাইত।

এ দিকে বিশিষ্টা দেবী পতির উদাসীন ভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ই ভীত ও চিন্তিত হইতে লাগিলেন। একে ত তিনি

পরম স্নেহপরায়ণ পিতৃমাতৃতুল্য শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুতে সাতিশয় ব্যথিতা, তদুপরি পতির এই সংসার-ঔদাসীন্য। তিনি যে কি করিবেন বুঝিতে পারিলেন না। পুত্র অভাবে বংশরক্ষায় নিরাশ হইয়াই যে পতির এই ভাবান্তর, বুদ্ধিমতী বিশিষ্টাদেবীর তাহা অজ্ঞাত ছিল না। তিনি একান্ত মনে ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে সহসা একদিন তিনি শিবগুরুকে বলিলেন, "দেব! বংশরক্ষা বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছি বটে, তথাপি আমার ইচ্ছা একবার দেবাদিদেব মহাদেবের শরণ গ্রহণ করিব। শুনিয়াছি, আশু তুষ্ট হয়েন বলিয়া তাঁহার নাম আশুতোষ, অতএব তাঁহার চরণে আশ্রয় লইলে তিনি কি নিরাশ করিবেন? তিনি দয়াময় তাঁহার দয়াতে আমাদের মনস্কামনা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। অতএব আসুন আমরা এইবার ভগবান্ শিবের আরাধনায় নিযুক্ত হই!"

পত্নী-বাক্যে শিবগুরু যেন সহসা চমকিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, সত্যই ত আমরা পুত্রাকাঙ্ক্ষায় অনেক কর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু কই শিবের আরাধনা ত সেরূপ ভাবে করা হয় নাই। অতএব একবার শিবের তপস্যা করা যাউক।

শিবগুরু এই ভাবিয়া পত্নী-বাক্যে সম্মত হইলেন, এবং কোথায় গমন করিয়া কিরূপে শিবের তপস্যা করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহার মনে পড়িল, গ্রামের অনতিদূরে বৃষ পর্ব্বত। তথায় কেরলরাজ রাজশেখর স্থাপিত একটী শিবমন্দির আছে। তথায় জ্যোতির্লিঙ্গ জাগ্রত মহাদেব বিরাজিত আছেন। তিনি ভাবিলেন এই বৃষ পর্ব্বতেই গমন করিয়া শিবারাধনা করিবেন এবং পত্নীকে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন। বিশিষ্টাদেবীর হৃদয়ে যেন আশার সঞ্চার হইল; তিনি তখনই যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

শিবগুরু ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ, তিনি কি কোন কর্ম্ম দিনক্ষণ

না দেখিয়া করিবেন? তিনি শুভদিনে শুভক্ষণে বিশিষ্টাদেবীকে সঙ্গে লইয়া আত্মীয়গণকে গৃহরক্ষা এবং কুলদেবতা পূজার ভার অর্পণ করিয়া বৃষ পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে বৃষপর্ব্বতে গমন করিতেছেন, তাহা সকলকে না বলিলেও সকলেই বুঝিলেন যে পুত্রাকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণদম্পতীর এই আয়োজন। কেননা ব্রাহ্মণ-দম্পতীর মনঃকষ্টের কথা কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। শিবগুরু সকলেরই প্রিয়। সুতরাং সকলেই তাঁহার মঙ্গল কামনা করিলেন।

যথাসময়ে শিবগুরু বৃষপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং পুরোহিত মহাশয়কে স্বীয় সঙ্কল্পের কথা বলিলেন। শিবগুরু সস্ত্রীক সম্বৎসর শিবের আরাধনা করিবেন জানিয়া পুরোহিত মহাশয়ের বড়ই আনন্দ হইল। তিনি তাঁহাদের জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং যথাসাধ্য সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিবার আশ্বাস প্রদান করিলেন।

এতদিনে শিবগুরুর অভীষ্ট সিদ্ধির যথার্থ সূচনা হইল—তিনি তথায় সস্ত্রীক কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন। বৃষপর্ব্বতের নিম্নে একটী ক্ষুদ্র নদী ছিল। শিবগুরু পত্নীসহ প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তথায় অবগাহন স্নান করিতেন এবং স্নানান্তে মন্দির মধ্যে শিবের পূজা সমাপন করিয়া শিবধ্যান, শিবহোম ও শিবনাম জপেই অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সারাদিন অনশনে থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে শিবচরণামৃত পান এবং যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন।

নিদ্রা একরূপ পরিত্যক্ত হইল; প্রায় সারারাত্রিই তাঁহারা জপ ও ধ্যানে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠাদর্শনে পুরোহিত মহাশয় চমৎকৃত হইলেন। তপঃ প্রভাবে তাঁহাদের ক্ষীণ দেহে যেন দিব্যজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইল। মুখশ্রী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল; সহসা দেখিলে লোকে মনে করিত যেন তপোলোক হইতে একজন ঋষি ও ঋষিপত্নী চন্দ্রশেখরেশ্বরের পূজা করিতে আসিয়াছেন।

ক্রমে সম্বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। শিবগুরু ভাবিলেন, বৎসর শেষপ্রায়, কিন্তু কৈ এখনও ত আশুতোষের দয়া হইল না! ভগবান্ আর কতদিন আমাদের প্রতি বিরূপ থাকিবেন? আমাদের বাসনা কি পূর্ণ হইবে না? এইরূপে তিনি মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বিশিষ্টাদেবীর কিন্তু কোন ব্যাকুলতা নাই। আশুতোষের দয়ার প্রতি তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস। নিত্য কার্য্যে তাঁহার কোনরূপ শৈথিল্যই পরিদৃষ্ট হইল না। অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের শেষ পর্য্যন্ত সকল ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা দেবতাগণের স্বভাব; আশুতোষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিলেও শিবগুরুর ভাগ্যে ব্যতিক্রম হইল না। বৎসরান্তে একদিন নিশাশেষে শিবগুরু স্বপ্ন দেখিলেন।

যেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। শিবগুরু স্বপ্নেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পাদপদ্মে প্রণিপাতপূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বৎস শিবগুরু! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতে আসিয়াছি, তুমি কি বর চাও, আমাকে বল"।

শিবগুরু তখন ব্রাহ্মণবেশী দেবাদিদেব মহাদেবকে চিনিতে পারিলেন, এবং তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব সম্পূর্ণ হইলে তিনি শিবের চরণে পতিত হইয়া বলিলেন, "ভগবন্! আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, আপনার অবিদিত কি আছে? তথাপি আপনার আদেশে আমি বলিতেছি, আমি পুত্রাকাঙ্ক্ষী, আমায় একটী পুত্র প্রদান করুন"।

আশুতোষ বলিলেন, "বৎস! তুমি কিরূপ পুত্র কামনা কর? মূর্খ শতায়ু পুত্র চাও, কিম্বা অল্পায়ু সর্ব্বজ্ঞ পুত্র চাও? তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত পাপবশে এজন্মে সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় পুত্র পাইতে পার না"।

শিবগুরু নতশিরে কহিলেন, "ভগবন্, তাহাই যদি হয়, তবে আমি অল্পায়ু সর্ব্বজ্ঞ পুত্রই কামনা করি। মূর্খ শতায়ু পুত্রে আমার কাজ নাই"। শিবগুরুর পরীক্ষা শেষ হইল, তাঁহার কথা শেষ

হইতে না হইতেই আশুতোষ বলিলেন, "বৎস! তাহাই হইবে, তোমরা অচিরে আমাকেই পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবে। জগতের হিতার্থ আমাকেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে; তোমাদের তপস্যায় আমি সাতিশয় তুষ্ট হইয়াছি, আমিই তোমাদের পুত্র হইলাম।" কথা শেষ হইতে না হইতেই শিবগুরুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। শিবগুরু আনন্দ ও বিস্ময়ে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

সমাজসংস্কারে নারীর কর্ত্তব্য।

(শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী)

সেদিন দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধ মুহূর্ত্তটী, বাল্যবিবাহের কুফল-হৃদয়ঙ্গমকারী কোন শিক্ষিত বঙ্গ সন্তানের একটী সুচিন্তিত ও সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে অতিবাহিত করিতেছি, এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ লইয়া ভ্রাতৃজায়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। শুনিলাম, তাঁহার পিত্রালয়ের এক প্রতিবেশী কন্যা বিধবা হইয়াছে, এই মাত্র পত্র পাইয়াছেন।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, বিধবা বালিকা—সম্ভ্রান্ত ধনিগৃহের শিক্ষিত পিতার দশমবর্ষীয়া কন্যা! বালিকার স্বামী বি, এ, পাস করিয়া আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কলেরা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

স্নেহাস্পদা প্রতিবেশীকন্যার দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া ভ্রাতৃজায়া অঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জনা করিলেন। আমি যদিও বালিকাকে কখনও দেখি নাই তথাপি তাহার বর্ত্তমান অবস্থা শ্রবণ করিয়া ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অশ্রুসম্বরণ করা আমার পক্ষেও অসম্ভব হইল। প্রবন্ধ পাঠে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে আনন্দটুকু লাভ করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহার দ্বিগুণ নিরানন্দে অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটী বালিকার দুঃখকাহিনী স্মৃতিপথে উদিত হইল।

ইতিপূর্ব্বে আমাদের পরিচিতা জনৈকা মহিলার একমাত্র দৌহিত্রটীর অকালমৃত্যুতে একটী মাত্র কন্যা সম্বল এক অভাগিনী বিধবার একাদশ বর্ষীয়া কন্যা বিধবা হইয়াছে শুনিয়াছিলাম। আরও শুনিয়াছিলাম, সেই বিধবার কন্যা অলক্ষণা বধূই পুত্রের অকাল-মৃত্যুর কারণ,—শ্বশ্রূর মনে এই ধারণা দৃঢ় হওয়ায় বালিকা চিরদিনের জন্য শ্বশ্রূর স্নেহবিচ্যুতা হইয়াছে। কোন অসম্ভাবিত কারণ ব্যতীত আর যে কোনদিন অভাগী বধূ শ্বশ্রূর স্নেহ লাভে সমর্থা হইবে, আত্মীয়স্বজনের মনে এরূপ ভরসা নাই। আত্মীয়-বন্ধুর উপদেশ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে তিনি পুত্রবধূকে বর্জ্জন করিয়াছেন। তদবধি আর তাহার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই। একদিন শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া "ছোট্ট ছেলেটীর বিবাহ দিয়া" "ছোট্ট একটী টুকটুকে বউ" আনিয়া ঘর আলো করিবেন বলিয়া বড় সাধেই তিনি দরিদ্র-গৃহের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দশমবর্ষীয়া কন্যা মনোনীত করিয়া পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁহার হরিষে বিষাদ হইল!

ঘর আলো হওয়া দূরে থাকুক, বিবাহের পর দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি সম্বৎসরের মধ্যেই পুত্রের জীবনান্ত করিয়া জননীর সুখ-সাধের অবসান করিল। বড় দুঃখেই অকল্যাণময়ী বধূ শ্বশ্রূর পরিত্যাজ্যা হইল। পুত্র-শোকাতুরা জননী অলক্ষণার সংস্পর্শে পুত্রের নিধন কল্পনা করিয়া ঘৃণাভরে বধূকে জন্মের মত বর্জ্জন করিলেন। কিন্তু সেই জামাতৃ-বিয়োগ-বিধুরা চিরঅভাগিনী বিধবা আজ তাঁহার শূন্য হৃদয়ের পূর্ণ সুখ অলক্ষণা বলিয়া কোথায় বিসর্জ্জন দিবেন?

জননীর বিদীর্ণপ্রায় বক্ষের উপর অনাদৃতা দুঃখিনী বালার অশ্রুকাতর কচিমুখখানির একটী করুণ চিত্র আমার মানস নয়নে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ব্যথিতচিত্তে ভাবিতে লাগিলাম,—কেন এমন হয়?

প্রবীণা গৃহিণীরা বলেন, ইহা অদৃষ্টের ফল, বিধির বিধান, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

আমরা বলি, বৈধব্য বিধির বিধান, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইতে পারে; কিন্তু এরূপ বালবৈধব্য অদৃষ্টের ফল বা বিধির বিধান নয়। বাস্তবিক যিনি বিধি তিনি দয়াময়। স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ শিশুহৃদয় যাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, সেই বিশ্ব-বিধাতার বিধান এমন নিষ্ঠুর শিশু-প্রাণঘাতী হইতে পারে না। বিশ্বের মঙ্গলই যাঁহার ইচ্ছা সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা এমন উচ্ছৃঙ্খল নহে। ইহা আমাদেরই দুর্ব্বুদ্ধি ও অদূরদর্শিতার ফল, আমাদেরই সহানুভূতিশূন্যতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয়।

নতুবা গত কয়েক বৎসর হইতে ভারতের নানাস্থানে বাল-বৈধব্যের প্রধান ও প্রথম কারণ বাল্যবিবাহপ্রথা নিবারণকল্পে বহু উদ্যোগ, আন্দোলন চলিতেছে। সমাজের নানা অকল্যাণপ্রসূ কু-প্রথাটীর উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া সারগর্ভ সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রবন্ধাদিতে শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সমাজহিতৈষী সমাজের হিতের নিমিত্ত বহু শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রভৃতি প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, অনেকেই ইহার কুফল সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন। প্রকাশ্য সভায় মুক্তকণ্ঠে সকলে ইহার বিরুদ্ধমত ঘোষণা করিয়া সামাজিকগণকে উৎসাহিত করিতেছেন কিন্তু তথাপি ভারতে, বিশেষতঃ, বঙ্গে ইহার প্রচলন সম্পূর্ণ রহিত হইতেছে না। সত্যের অনুরোধে অত্যন্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, ভারতের সুসন্তানগণের প্রবল ইচ্ছা, ঐকান্তিক চেষ্টাযত্ন সত্ত্বেও বাল্যবিবাহ বঙ্গে অব্যাহত রহিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও সেই বৎসরের পর বৎসর আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়া সহস্র সহস্র সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা বালিকা অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া শ্বশুর ভবন উজ্জ্বল করিতে যাইতেছে, সেই শত শত

বালিকা জনকজননীর প্রাণে শেল বিদ্ধ করিয়া চিরজীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। এখনও বালিকা-মাতার দৈহিক অপুষ্টতা ও সন্তানপালনে অনভিজ্ঞতা শত সহস্র শিশুর অকালমৃত্যুর কারণ হইতেছে; নানা অমঙ্গলে বঙ্গ সংসার প্রতিনিয়তই অশান্তিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। দীর্ঘকালের অসংস্কৃত সমাজের সংস্কারে সহায়তা করিবার নিমিত্ত দেশনায়কগণের সাদর আহ্বান উপেক্ষা করিয়া এখনও সামাজিকগণ দশম, একাদশ, দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিয়া, অথবা বালিকা পুত্রবধূকে গৃহে আনিয়া দেশাচারের সম্মান রক্ষা করিতেছেন। দেশাচারের শাসনাধীন হইয়া আজিও কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে অপেক্ষাকৃত বয়স্থা কন্যার বিবাহ দিতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে।

ইহাতে কি বুঝিতে হইবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে এই দেশব্যাপী আন্দোলন বৃথা হইতেছে? বালিকার দুঃখ-মোচনে, তাহাদের জীবনের প্রকৃত উন্নতি সাধনে সদাযত্নশীল বঙ্গের পরদুঃখকাতর সুসন্তানগণের এত চেষ্টা কি তবে নিষ্ফল হইতেছে? না—তাহা অসম্ভব। সামান্য একটা সামাজিক কুপ্রথা দুরীকরণের নিমিত্ত এত যত্ন এরূপ চেষ্টা কখন সম্পূর্ণ বিফল হইতে পারে না, তবে এ চেষ্টার যতদুর সফলতা লাভ করা উচিত দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই, এতদিনের এত আন্দোলন উদ্যমের ফলে বাল্যবিবাহ নিবারিত না হউক, শিশুবিবাহ একরূপ রহিত হইয়াছে। বঙ্গের জনকজননীর অন্তর হইতে গৌরী, পৃথিবী বা রোহিনীদানের সদিচ্ছাটুকু বোধ হয় যেন চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ স্থলে এক দুই অথবা তিন চারি বৎসরের বিধবার সংখ্যাও হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। বহুবর্ষব্যাপী আন্দোলনের ফলে বঙ্গবালার ভাগ্যের আংশিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাদের জীবনব্যাপী দুঃখ দুর্দ্দশার মূলোচ্ছেদ হয় নাই, এখনও তাহাদের জীবন সুন্দর ও শান্তিময় করিবার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। যে ভাবে সংস্কার-কার্য্য চলিতেছে তাহাতে শত

বৎসরেও যে তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার অবসান হইবে সে আশা করা যায় না।

অভাগিনী বঙ্গবালার দুঃখে সহৃদয় পুরুষের প্রাণ কাঁদিয়াছে। পুরুষের হৃদয় ইহাদের দুঃখ মোচনে উন্মুখ হইয়াছে। দেশের সন্তানগণের ভবিষ্যজননী বালিকাদের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ পুরুষের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু রমণীকে এখনও এ কার্য্যে উৎসাহিত করে নাই। আমাদের প্রাণ বোধ হয় যেন আমাদের পরম স্নেহাস্পদা কোমলপ্রাণা বালিকাদের দুঃখে এখনও যথার্থ কাঁদে নাই। বঙ্গবালার দুঃখমোচনে, সমাজের উন্নতি সাধনে যথাসাধ্য সহায়তা করিবার প্রকৃত ইচ্ছা এখনও আমাদের অন্তরকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী ও শক্তিশালী করে নাই। দেশাচারের অন্যায় শাসন উপেক্ষা করিয়া কল্যাণকর ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিবার মত মানসিক বল জন্মে নাই। তাই, শুধু বালিকাদের নহে, সমগ্র সমাজ, সমগ্র জাতির কল্যাণকর এ সংস্কারচেষ্টা রমণীর সহানুভূতি ও সাহায্য অভাবে সফল হইতেছে না। সমাজে নারীর শক্তি পুরুষের অপেক্ষা কোন কোন অংশে স্বল্প ও সীমাবিশিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু গৃহসংস্কার ও গৃহস্থালীর সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত রমণীর সাহায্য যেমন একান্ত প্রার্থনীয়, সমাজসংস্কার ও সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিতে হইলেও রমণীর সহায়তা অত্যাবশ্যক। এ সাহায্য ব্যতীত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোন সামাজিক সংস্কারকার্য্যে সফলতা লাভ করা একরূপ অসম্ভব।

গৃহ বা সমাজসংস্কারে নিযুক্ত হইয়া রমণীগণ সকলে একমত হইয়া যাহা এক বৎসরে সম্পন্ন করিতে পারিবেন, পুরুষের শত চেষ্টায় তাহা দশ বৎসরেও সম্পন্ন হইবে কি না সন্দেহ। সমাজসংস্কারে নারীর শক্তি আশ্চর্য্যফলপ্রদ হইলে কি হয়, অদুরদর্শিতা ও রক্ষণশীলতা আমাদিগকে পুরুষের কার্য্যে সহায়তা-বিমুখ করিয়াছে। আমরা সকলই দেখিতেছি, সকলই বুঝিতেছি, তথাপি কোন বিষয়ে কোন একটা বিধি নামীয় অবিধির পরিবর্ত্তনে উৎসাহ নাই, কোন

একটা হিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা নাই। সেই একই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া রোদন! সেই একই পিতৃপিতামহের নিরয়গমনের অহেতুক আশঙ্কায় বালিকার জীবন অশান্তিময় করিবার আয়োজন!

বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজে যাহা কিছু অনিষ্ট ঘটাইতেছে সকলই আমাদের দোষে। আমরাই বালিকাদের দুঃখ দুর্দ্দশার পথ প্রশস্ত রাখিয়াছি। আমাদেরই নির্ব্বুদ্ধিতা বহু শিশুর অকালমৃত্যুর কারণ। বহু সংসার অশান্তিময় হইবার হেতু।

আমরা—কন্যা ও বধূদিগের জননী ও শ্বশ্রূগণ—যদি অষ্টাদশ, ঊনবিংশ বর্ষের পূর্ব্বে (বিংশ লিখিতে সাহস হয় না, কেননা যে দেশের মেয়েরা কুড়ি হইলেই বুড়ি বিশেষণে বিশেষিত হইতে বাধ্য, সেখানে কুড়ি বৎসর বয়সের বধূ গৃহে আনিতে পরামর্শ দেওয়ার মত দুঃসাহস না রাখাই ভাল)—সংসারের গুরুভার-বহনোপযোগী শিক্ষা ও সামর্থ্য লাভের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ না দিই, পুত্রবধূ গৃহে না আনি—একাদশ দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ সুতরাং বিবাহের উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া অতিরিক্ত পণ আদায় করিয়া বধূর পিতাকে স্থলবিশেষে সর্ব্বস্বান্ত বা গৃহহীন না করি, কন্যাদায়গ্রস্তকে তাঁহার কন্যার অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া রূপ অপরাধের দণ্ডস্বরূপ বরপণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট নগদ টাকা ও স্বর্ণ রৌপ্যাদির পরিমাণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধিদ্বারা ঋণভারে প্রপীড়িত করিয়া তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ না হই, তাহা হইলে যে বাল্য-বিবাহ রহিতকরণের জন্য পুরুষেরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারিতেছেন না তাহা কি অচির কালের মধ্যেই রহিত হইয়া যায় না? বিধাতার দান কুমারী-জীবনের নির্দ্দিষ্ট সুখটুকুও ঐ বয়স পর্য্যন্ত বালিকারা নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে পায় না? ভবিষ্যতে সুখের সংসার স্থাপন করিবার জন্য আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মা ও আদর্শ গৃহিণী হইবার জন্য শিক্ষালাভের যথেষ্ট সময় পায় না? অবশ্যই পায়, কিন্তু সে সুযোগ দেয় কে? সংসারে

আমরা ভয়ের শাসনেই ত সদা ব্যস্ত। দেশাচারের ভয়, সমাজের ভয়, নরকের ভয়, লোকনিন্দার ভয়, কতদিকের কতবিধ ভয়ের শাসনে আমাদের মনের স্বাধীনতা নষ্ট; আমাদের স্বদোষ স্বীকারের সাহসটুকু পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। তাহা না হইলে আমরা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও কোন প্রতিবিধান না করিয়া শুধু অদৃষ্টকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকি কেন? আমাদের চোখের উপর আমাদেরই ননীর পুতুলি মেয়েগুলি, বৌগুলি অসময়ে সংসারে প্রবেশ করিয়া নানা কষ্টভোগ করিতেছে দেখিয়াও এই অকল্যাণপ্রসূ বাল্যবিবাহপ্রথা রহিত করিবার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হই না কেন?

এ পর্য্যন্ত অনেক প্রবীণা ও নবীনা গৃহিণীর সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, ইহার সংস্কার সাধন যে অতি কর্ত্তব্য, সত্য ও ন্যায়ের অনুরোধে কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু যৌবন-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না, ইহাতে ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে পাপস্পর্শ করিবে কি না, এ বিষয়ে তাঁহাদের বিষম সন্দেহ আছে। তারপর শাস্ত্রবচনাদি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া নানা দোষাদোষের আলোচনা করিয়া যদি এ সন্দেহ ভঞ্জন করা যায়, তথাপি অবশিষ্ট থাকে সমাজের ভয়। ইহা ত দেখি ধর্ম্মভয় অপেক্ষা প্রবল। ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা সমাজশাসনে ইঁহারা অধিক সন্ত্রস্ত। সত্যের, ধর্ম্মের বা মঙ্গলের অনুরোধে, স্নেহ বা প্রীতির আকর্ষণে দেশাচার বা সমাজশাসন লঙ্ঘন করিবার সাহস নাই! অনেক সময় অনেক কোমলহৃদয়া সৎবুদ্ধিসম্পন্না গৃহিণীকে দুঃখিতভাবে সেই অতি পুরাতন কথাটী বলিতে শুনিয়াছি—"বুঝি ত মা সব কিন্তু কি ক'রব, সমাজের নিয়মে আবদ্ধ ত আমরা, সে নিয়ম কি আর রদ্ ক'রতে পারি। চিরকাল যা' হয়ে আসচে, বাপ পিতামহ যা' করে গিয়েছেন তোমার আমার মতে তা কি আর উল্টে যাবে?"

কথাটা নেহাত মিথ্যা নয়, সমাজশাসন অথবা দেশাচারকে লঙ্ঘন করা বড় সহজ কথা নয়। দু'দশ জনের কাজ নয়। কিন্তু

এই সমাজ—বাধ্য প্রজার মত নিরন্তর আমরা যাহার নিয়মের অধীন, যাহার ভয়ে সদা সশঙ্কিত—এই অদ্ভুতকর্ম্মা অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন পদার্থ টী কি ?

বাস্তবিক ইহা কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষ নহে এবং অনেক সময় অনেক বিষয়ে ইহার প্রাণহীনতার পরিচয় পাইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রাণহীন জড় নহে। দেশের ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, সৎ অসৎ, উচ্চ নীচ, সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারীকে লইয়াই একটী সমাজ এবং ইহাদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধি বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ও ক্ষমতাবান্, তাঁহাদেরই প্রবর্ত্তিত নিয়মসমূহ সামাজিক নিয়ম নামে উক্ত। সমাজভুক্ত বালক, বৃদ্ধ, যুবা প্রত্যেক নরনারী সেই সামাজিক নিয়ম, সমাজশাসন মান্য করিতে বাধ্য। সে বিধি সে শাসন সমাজের হিতের নিমিত্ত। প্রাচীন ঋষিগণ যাহা প্রজাকুলের হিতের নিমিত্তই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা হইতে অমঙ্গল প্রসূত হওয়া সম্ভব নয়। আমরা যদি সেই বিধিই মানিয়া চলিতাম তাহা হইলে আজ ভারতে এক বৎসর বয়স্কা হিন্দু বিধবা থাকিত না, দশ এগার বৎসরের বাল-বিধবাকে দারুণ গ্রীষ্মে একাদশীর দিন একবিন্দু তৃষ্ণার জলে বঞ্চিত হইয়া নয়নজল ফেলিতে হইত না। ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকাকে সন্তানশোকে কাতর হইতে বা দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা বধূকে গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের সে বিধি এখন সম্রাট্, সামাজিকগণ তাহার অনুগত প্রজা এবং দেশাচার সেই সম্রাটের প্রতিনিধি। সম্রাট্ অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত বিধি—তিনি তাঁহার সিংহাসনেই থাকেন, তাঁহার দেখা বড় সহজে কেহ পায় না, সুতরাং প্রতিনিধি দেশাচারেরই এখানে প্রাধান্য ; তাহারই প্রবল প্রতাপে সকলে সন্ত্রস্ত। দেশাচারের বিধিই সকলের সুবিদিত, তাহাই সমাজ-বিধি, তাহার পালনেই সকলে বাধ্য। যে ইহা নির্ব্বিচারে পালন করিতে সমর্থ সেই উত্তম সামাজিক বা বাধ্য প্রজা, সুতরাং সমাজপতির প্রসন্নতা লাভে সমর্থ। কিন্তু যে মন্দভাগ্য ইহার ন্যায়ান্যায় বিচারে উদ্যত, বিধি মানীর

অবিধির উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প; কুপ্রথার বশবর্ত্তী হইতে অসম্মত, দেশাচারের নিকট তাহার শাস্তি অনিবার্য্য, সমাজে তাহার নির্য্যাতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং, দেশাচারের বিরুদ্ধাচরণ করা সহজ-সাধ্য নয়, এই বোধেই কেহ ইহার ধর্ম্মানুমোদিত শাস্ত্রসম্মত পরিবর্ত্তনেও সাহসী হয় না বুঝিলাম। কিন্তু শত শত নরনারী লইয়া যে সমাজ, শত মস্তিষ্কের চিন্তাপ্রসূত যে সামাজিক নিয়ম দু' একজন যদি তাহার বিরুদ্ধবাদী হয়েন সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারা যায় না, কিন্তু, যখন কোন বিশেষ নিয়মের বিরুদ্ধে শত কণ্ঠ ধ্বনিত হয়, শত লেখনী তাহার অন্যায় ঘোষণা করে, সহস্র হস্ত তাহা নিবারণে উত্থিত হয়, শত শত চিত্ত ব্যথিত হইয়া তাহার উচ্ছেদ কামনা করে, তথাপি কেন সে প্রথা রহিত হয় না? আপন ভ্রম বুঝিয়াও কেন সমাজ অবিলম্বে তাহা সংশোধন করে না; অথবা স্থল বিশেষে সংশোধন চেষ্টা করিয়াও আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারে না? সমাজ যদি প্রাণহীন নয়, যদি কাষ্ঠ, প্রস্তর বা মৃন্ময় স্তূপ নয়, বাস্তবিক জ্ঞানধর্ম্মবিশিষ্ট সদসৎবুদ্ধিসম্পন্ন সজীব মানবের সমষ্টি, তবে কেন, কোন্ কারণে এমন অসম্ভব সম্ভব হয়?

মনে হয়, পরস্পরের সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবই ইহার অন্তরায়। স্ত্রী এবং পুরুষ লইয়া সমাজ, স্ত্রীলোক সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ, একথা আমরা প্রত্যেকেই স্বীকার করি এবং আমরা যে পুরুষের সৎকার্য্যের সঙ্গিনী, সংসার পালনে সহায়তাকারিণী সহধর্ম্মিণী ইহা স্পষ্ট বলিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করি না কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা তাঁহাদের সৎকার্য্যের, তাঁহাদের সদুদ্দেশ্য সাধনের কতটুকু সাহায্য করি তাহা একটু ভাবিয়া দেখি না।

ইহার প্রমাণ এই বাল্যবিবাহ রহিতকরণ চেষ্টায়। সহধর্ম্মিণী যদি সত্যই সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইতেন, যথাসাধ্য চেষ্টায় স্বামীর সৎকর্ম্মের সহায়তা করিতেন, তাহা হইলে আর এমন হইত না যে, স্বামী প্রকাশ্য সভায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতায় শ্রোতাদের প্রাণে অপূর্ব্ব উৎসাহের সৃষ্টি করিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে

ফিরিলেন; গৃহে সহধর্ম্মিণী দেশাচারের ভয়-ভীতা বঙ্গের কন্যাদায়-গ্রস্তা জননী, হয়ত তখন তাঁহারই অবিবেচনার সমালোচনায় ব্যস্ত— "ওগো ঘরে যাঁর এগার বার বছরের আইবুড়ো মেয়ে তাঁর কি এ সভাসমিতিতে ঘুরে অনর্থক সময় নষ্ট করা শোভা পায়?" স্ত্রী হয়ত জানেনই না যে, তাঁহার স্বামী সভায় কোন্ বিষয়ের আলোচনায় নিজের অবিবাহিতা কন্যাটীর বিবাহের চিন্তায় বিরত ছিলেন। স্বামী গৃহ প্রবেশের স্বল্পক্ষণ পরেই গৃহিণী পাখা হস্তে বাতাস করিতে করিতে নানা অনুরোধ উপরোধ যুক্তি পরামর্শে বাল্যবিবাহ বিরোধীর উৎসাহ ঠাণ্ডা করিতে বসিলেন। কিন্তু সে জ্বলন্ত উৎসাহ কি সহজে ঠাণ্ডা হয়, একদিনে না হয় দুদিনে দশদিনে বহুযত্নে বহুচেষ্টায় অবশেষে অবলার মহাস্ত্র অশ্রুপাতের দ্বারা তিনি সে অসাধ্য সাধনে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইলেন। বাকী যেটুকু রহিল, আত্মীয় স্বজন ও কন্যার ভাবী শ্বশুর মহাশয় তাহা পূরণ করিয়া লইলেন, অর্থাৎ দশচক্রে মিলিয়া বাল্যবিবাহ বিরোধীর দ্বারাই তাঁহার স্বীয় বালিকা কন্যার শুভবিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করাইলেন। নহিলে সমাজবিধি যে শক্তিহীন হইয়া পড়ে, দেশাচারের মান রক্ষা হয় না; আর হিন্দুঘরের ছেলে মেয়ের জননীদের ছোট্ট মেয়েটীর বিবাহ দিয়া ছোট্ট একটী জামাই আনিবার এবং ছোট্ট একটী টুকটুকে বউ ঘরে আনিয়া ঘর আলো করিবার সাধ যে অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

আবার, নানা অবশ্যম্ভাবী কারণে কন্যার জননীকে অনেক সময় উদার ভাবাপন্না দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কন্যার শ্বশ্রূঠাকুরাণীদের প্রায়ই প্রাচীন পন্থা অনুসরণ করিতে দেখা যায়, এবং বাধ্য হইয়া সকলকে তাঁহাদের মতই শিরোধার্য্য করিতে হয়, যেহেতু সকলেই জানেন, বিবাহিত জীবনের আরম্ভে অধিকাংশ স্থলে শ্বশ্রূর সুদৃষ্টি কুদৃষ্টির উপরই নববধূর শুভাশুভ, আনন্দ নিরানন্দ নির্ভর করে।

যাহা হউক, সকল দিক দেখিয়া বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, হিন্দু সমাজের বিবাহ-সংস্কার শুধু পুরুষের নয়, স্ত্রীপুরুষে মিলিত

সাহায্য ও সামর্থ্য ব্যতীত সুসম্পন্ন হইবে না। সমস্ত হিন্দুনারীর সহানুভূতি, একতা ও মিলিত চেষ্টার উপর ইহার সফলতা নির্ভর করিতেছে। মানব জীবনের যাহাতে উন্নতি ও মঙ্গল হয় মানব মাত্রেরই যেমন তাহা করা কর্ত্তব্য, নারীর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার লাঘব হয় নারী মাত্রেরই তাহা করা কর্ত্তব্য, ইহাই ভাবিয়া, একবার আমার দেশের জননী ও ভগিনিগণ সকলে একমত হইয়া এই কুপ্রথাটীর উচ্ছেদ সাধন করুন। এক্ষণে দেশে অতি অল্পই পুরুষ আছেন যাঁহারা বাল্যবিবাহের কুফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার উচ্ছেদ কামনা না করেন। শুধু আপনাদের ইচ্ছা হইলেই অতি সহজে ও অতি অল্পকালের মধ্যেই ইহা রহিত হইয়া যাইবে। জগতে অকাল মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, এখনও যদি এই বাল্যবিবাহের প্রচলন রহিত করা না হয়, আজ না হয় দশ বৎসর পরে, দশ বৎসর না হয় শত বৎসর পরে য়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতির ন্যায় এদেশেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইবে। সতীর দেশে, সীতা সাবিত্রীর দেশে তাহা কি রমণীকুলের গৌরবজনক হইবে? না তাহাতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের স্বর্গগমনের পথ প্রশস্ত হইবে? বাল্যবিবাহ রহিত করুন, বিধবাবিবাহ কথাটীর অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

আর শুধু যে বালিকাদের বিবাহের সময় পিছাইয়া দিলেই হইল তাহা নহে, এই অবসরে তাহাদের এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা প্রত্যেকে আপনাপন কর্ত্তব্য সুন্দর ভাবে বুঝিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। এ শিক্ষা শুধু বর্ত্তমান স্কুলের পরীক্ষা পাশ ও অল্পবিস্তর সূক্ষ্ম শিল্প বা দুই একটা সাংসারিক কাজেই সমাপ্ত না হয়। এ সেই শিক্ষা যাহাতে হিন্দুর আদর্শ-নারী চরিত্রের আলোকপাতে হিন্দুবালাদের হৃদয় উজ্জ্বল, চিন্তা নির্ম্মল, আকাঙ্ক্ষা বিলাস-বাসনা-শূন্য ও পবিত্র হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে পতি ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অর্থ কি তাহাও যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

এ শিক্ষা শুধু গৃহে বা শুধু স্কুলে হইলে সম্পূর্ণ ও সুন্দর

হইবার আশা করা যায় না। প্রত্যেক হিন্দু নারী প্রত্যেক জননী এবং শিক্ষয়িত্রী আত্মপর নির্ব্বিশেষে যদি এ শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিয়া সাধ্যমত চেষ্টা করেন, তবেই ধীরে ধীরে সমাজের এক মহান্ সুমঙ্গল সাধিত হইবে। হিন্দুমহিলাগণ ব্রতের ন্যায় ইহা পালন করিলে পবিত্র অনন্ত-ব্রতের ফল লাভ করিবেন। বঙ্গবালার জীবন সুন্দর, সংসার সুখের হইবে।

আমাদের পল্লীগ্রামের অবস্থা ও তাহার প্রতিকারের উপায়।

(শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এস্-সি)

পল্লীগ্রামই অন্তর্ম্মুখী হিন্দুজাতির সভ্যতার কেন্দ্র। এই স্থানেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, সৌন্দর্য্যের মহান্ আকর-স্বরূপ সুন্দরের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই পল্লীগ্রামের শান্তিময় নিস্তব্ধতায় তাঁহাদের চিত্ত বিক্ষেপ-শূন্য হইয়া গভীর সমাধিমগ্ন হইত—এবং তখন তাঁহারা সেই অতীন্দ্রিয় চিদ্ঘন সুন্দরের আভাস পাইয়া ধন্য হইতেন। এই পল্লীগ্রামের অনতিদূরে বৃক্ষলতাসুশোভিত নিভৃত তপোবনমধ্যস্থ ঋষিদের আশ্রমগুলি চতুর্দ্দিকে আধ্যাত্মিক ভাব-তরঙ্গ প্রেরণ করিত, এবং পল্লীবাসিগণ ঐ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকার রূপ মহান্ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া যথার্থ আন্তরিকতার সহিত তাঁহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মগুলির

* এই প্রবন্ধে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধটীতে নারী নারীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেছেন; সুতরাং তাহা প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই হেতু আমরা ইহা পত্রস্থ করিলাম। (উদ্বোধন সং)

যথাযথ অনুষ্ঠান করিতেন। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে, ধূপ ধূনা পুষ্পচন্দনের সৌরভে প্রত্যেক গৃহে পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিত।

আজও পল্লীগ্রামে প্রাকৃতিক সুষমার অভাব নাই, কিন্তু আমরা সে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম—উহার স্রষ্টার অন্বেষণ ত দূরের কথা। আজও প্রভাত-তপন বর্ণচ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের শীর্ষদেশে আবির্ভূত হন, আজও বিহগকুল সুললিত কণ্ঠে পল্লীগ্রাম মুখরিত করে, কিন্তু ইহাতে আমাদের মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয় না। দিগন্ত-বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রের শ্যামল বক্ষে পবনচালিত তরঙ্গগুলি দর্শনে আমাদের হৃদয়ে আনন্দলহরী উত্থিত হয় না। পল্লীগ্রামের শান্তিময় নিস্তব্ধতা এখনও বিদ্যমান, কিন্তু আমাদের চিত্ত বিক্ষেপ-শূন্য হইয়া গভীরধ্যানে লীন হয় না।

ইহার কারণ আমরা আমাদের মহান্ আদর্শ হারাইতে বসিয়াছি। ভগবৎলাভের ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করাই যে মানবের মহান্ আদর্শ তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। সেইজন্যই পল্লীগ্রামের বিশেষ প্রযোজ-নীয়তাটী আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। যদি আমাদের জীবন-সাধনায় ঐ প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনুভব করি তাহা হইলে পল্লীগ্রাম পরিত্যাগের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান থাকিলেও ঐ কারণগুলি দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইব, কিছুতেই স্থান ত্যাগ করিব না।

পল্লীগ্রামের অধুনাতন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে উহার দুরবস্থার জন্য আমরাই অনেকটা দায়ী। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যাভাবই একটী প্রধান অভাব। প্রত্যেক বাড়ীতেই অন্ততঃ একজন প্লীহা যকৃত ও ম্যালেরিয়ায় বার মাস ভুগিতেছে এতদ্ব্যতীত পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ বৎসরে দুই তিন মাস শয্যাশায়ী থাকেন। অনেকেরই শরীর শীর্ণ ও নিস্তেজ, জীবনীশক্তি

হ্রাসপ্রাপ্ত। এতদ্ব্যতীত কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর প্রকোপে মাঝে মাঝে পল্লীগ্রাম বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু আমরা স্বাস্থ্যপালনের অতি সাধারণ, সহজ এবং অল্পব্যয়সাপেক্ষ নিয়মগুলি পালন করিতেও নারাজ।

কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি উৎকট ব্যাধির বীজ অপরিষ্কার জলের ভিতরে বৃদ্ধি পায় এবং উহা ঐ জলের সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া ব্যাধি উৎপাদন করে। এই কথাটী অতি সহজ হইলেও আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না—আমরা স্বেচ্ছায় পুষ্করিণীর জল অপরিষ্কার করি।

পল্লী-রমণীগণ পানীয় জলের পুষ্করিণীতে প্রস্রাব ও শৌচাদি করেন এবং বিষ্ঠামূত্রযুক্ত কন্থা প্রভৃতি ধৌত করেন। অধিক কি, পল্লীবাসী পুরুষগণও অনেক সময় ঘটি কিম্বা গাড়ু বহন করা অসুবিধাজনক বোধ করিয়া শৌচাদি পানীয় জলের পুষ্করিণীতে সম্পন্ন করেন।

দ্বিতীয়তঃ, যে স্থানে কূপ খনন করা যাইতে পারে সেই স্থানে যাঁহাদের অর্থবল আছে তাঁহারাও কূপ খনন করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন না। পুষ্করিণী অপেক্ষা কূপের জল সমধিক পরিষ্কার এবং উহাতে প্রস্রাব শৌচাদি অসম্ভব বলিয়া ঐ জল পরিষ্কার রাখা আদৌ শক্ত নহে।

তৃতীয়তঃ, অপরিষ্কার জল যদি ফুটাইয়া ভাল করিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ঐ জল শরীরের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। পল্লীগ্রামে জ্বালানি কাষ্ঠের অভাব নাই এবং তিনটী কলসী ক্রয় করিয়া কয়লা ও বালির ফিল্টার তৈয়ারী করিতে কিছু ব্যয় হয় না বলিলেও চলে। তথাপি আমরা এইরূপ ভাবে পানীয় জল পরিষ্কৃত করিয়া সেবন করিতে নারাজ।

অনেক বাটীর চতুর্দ্দিকে আগাছা বৃদ্ধি পাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন হইয়া উঠিতেছে; পাঁশকুড়গুলি হিমালয়ের ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত হইতেছে। হয় ত বাড়ীর মধ্যেই প্রাচীরের এক কোণে একটী

ডাবায় অকারণ মাস্যাবধি জল জমিয়া পোকা মাকড়ের বংশ বৃদ্ধি করিতেছে। পল্লীরমণীগণের এবং বালকবালিকাদিগের পরিধেয় বসনের মলিনতা রক্ষা করা যেন ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লীরমণীগণ এক অদ্ভুত শুচি-জ্ঞানের প্রেরণায় অনেক সময়ে বিনা কারণে দিনে তিন চারিবার স্নান করিতে বাধ্য হন। সিক্ত বসনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়া তাঁহারা শুচি রক্ষা করেন। আমাদের দেশের অসংখ্য শিশু-মৃত্যুর জন্য যে আমরা দায়ী তাহা 'স্বাস্থ্য সমাচারের' নিম্নলিখিত উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়—

"আমাদের শিশুরা কিরূপ উপেক্ষিত হয় তাহা সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই দেশের ভীষণ আঁতুড়ঘরকে যমের ঘরও বলা যায়। উহার মধ্যে আলো ও বায়ু প্রবেশ নিষেধ। এই ঘরে সন্তানকে যে ধাত্রী ধারণ করিয়া থাকে সে কিরূপ অজ্ঞ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। ধাত্রী-বিদ্যা সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞানই নাই। সেই অশিক্ষিতা নারী তাহার অপরিচ্ছন্ন হস্তে যেমন তেমন ছুরী বা বাঁশের চটা দিয়া শিশুর নাড়ী ছেদন করে। এমন অবস্থায় যদি শিশু ধনুষ্টঙ্কারে না মরে ত কে মরিবে?"

পল্লীগ্রামের দ্বিতীয় অভাব অর্থাভাব। কচিৎ দুই এক গ্রামে এক আধ জন জমীদারের বাস। সাধারণতঃ, পল্লীগ্রামে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়—মধ্যবিত্ত, দীনমধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী। প্রথম শ্রেণীর লোকসংখ্যা অপর দুই শ্রেণীর অনুপাতে অতি নগণ্য। এক্ষণে দেখা যাউক শ্রমজীবী ও দীনমধ্যবিত্ত ব্যক্তিদিগের অবস্থা কিরূপ। এই বিষয় আলোচনা করিতে হইলে আমাদের জানা উচিত যে, যে সম্প্রদায় যত দরিদ্র তাহার আয়ের তত অধিক অংশ অন্নবস্ত্রের জন্য ব্যয়িত হয়। এই তথ্য অনুসারে দারিদ্র্যের পরিমাণ বুঝা যাইবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গণনায় বিভিন্ন বিষয়ে এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের পারিবারিক ব্যয়ের যে অনুপাত জানা যায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	মজুর	কৃষক	সূত্রধর	কর্ম্মকার	দোকানদার	দীনমধ্যবিত্ত
১। খাদ্য	৯৫·৪ } ৯৯·৪	৯৪·০ } ৯৭·০	৮৪·৫ } ৯৬·৫	৭৯·০ } ৯০	৭৭·৭ } ৮৬·৭	৭৪ } ৭৮·৭
২। বসন	৪·০	৩·০	১২	১১	৯	৪·৭
৩। চিকিৎসা	০	১	১	৫·০	৫·৯	৮·০
৪। শিক্ষা	০	০	০	০	১·০	৩·৩
৫। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ	·৬	২	২·৫	৪·৫	৫·০	৮·০
৬। বিলাসের সামগ্রী	০	০	১·০	১·০	১·৪	২·০
	১০০,০	১০০,০	১০০,০	১০০,০	১০০,০	১০০,০

এই তালিকা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রমজীবী ও দীনমধ্যবিত্ত ব্যক্তির খাদ্য ও বসনের ব্যবস্থা করিয়া উদ্বৃত্ত প্রায় কিছুই থাকে না। বিলাত ও আমেরিকার শ্রমজীবিগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীই সঞ্চয় করিতে সক্ষম। আমেরিকায় গড়ে শতকরা ৪ হইতে ৪০ ডলার পর্য্যন্ত ও ইউরোপে ১৬ হইতে ২২ ডলার পর্য্যন্ত সঞ্চয় হইয়া থাকে। এই দুই স্থানের শ্রমজীবিগণের আর্থিক অবস্থার তুলনায় আমাদের শ্রমজীবিগণের আর্থিক অবস্থা কত হীন তাহা উপরোক্ত গণনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যত্র আয় তত্র ব্যয় করিয়াই যদি আমাদের শ্রমজীবিগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত তাহা হইলেও ক্ষোভ হইত না। অনেক সময়ে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, উৎকট পীড়ার চিকিৎসা অথবা আকালের জন্য শ্রমজীবিগণকে ঋণজালে আবদ্ধ হইতে হয়।

এই নিদারুণ দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষিকার্য্যের অবনতি, অল্প মূল্যে শস্য বিক্রয়, উচ্চহারে ঋণ গ্রহণ এবং বহুমূল্যে ব্যবহার সামগ্রী ক্রয়—এই চারিটীই প্রধান।

কৃষিকার্য্যের অবনতি নিবন্ধন ফসলের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। কৃষকগণ উপযুক্ত সার এবং যন্ত্রাদির ব্যবহার

জানে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকুরিজীবী হওয়ায় জমীজমার খবর রাখেন না। বৎসরান্তে নিজের ভাগের শস্য বুঝিয়া লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন, আর যাঁহারা গ্রামে থাকেন শস্য বৃদ্ধি করিবার কোন চিন্তা তাঁহাদের মস্তিষ্কে স্থান পায় না।

উপযুক্ত সার ও যন্ত্রের ব্যবহার দূরের কথা, ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থাও যথাযথ হইয়া উঠে না। আমেরিকায় কৃষকগণ বলে, বৃষ্টির জল ত আকস্মিক ঘটনা, উহার উপরে কৃষিকার্য্য কেন নির্ভর করিবে। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষকগণ চাতকের মত বৃষ্টির জলের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। যথা সময়ে বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। যে দেশে ১০।১২ হাত খনন করিলেই জল নির্গত হয় সেই দেশে কৃষিক্ষেত্রে জলের অভাব! ২০৲ ২৫৲ টাকা ব্যয় করিলে কৃষি-ক্ষেত্রের উপযোগী কূপ খনন করা যাইতে পারে, তথাপি পল্লী-বাসী মধ্যবিত্ত, এমন কি, ধনীব্যক্তিগণও এইরূপ কূপের ব্যবস্থা করেন না। তবে আমাদের দেশের তালুকদারের জমী টুকরা টুকরা অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। এমত অবস্থায় পাশা পাশি জমীগুলির স্বত্বাধিকারিগণ চাঁদা তুলিয়া কূপখননের ব্যবস্থা অনায়াসে করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা এরূপ করেন না। আমরা রেলের লাইনের স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত আছি। অবশ্য রেলের জন্য জলসরবরাহ অনেক কমিয়াছে, অনেক নদী খাল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এ অবস্থায়ও কূপ বা পুষ্করিণী খনন করিয়া জলের ব্যবস্থা করা আমাদের সাধ্যাতীত নহে।

আজকাল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কৃষকগণ কৃষির ক্রমোন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর। শুনিয়াছি, আমাদের দেশের এক জাতীয় অম্লরসযুক্ত লেবুর বীজ আমেরিকায় লইয়া গিয়া এমন বৃক্ষ উৎপাদন করিয়াছে যে, সেই বৃক্ষে বার মাস অতি সুমিষ্ট বহুলরসযুক্ত বীজ-বিহীন কমলালেবু ফলিতেছে। আমাদের দেশের কণ্টকময় মনসা গাছ সেখানে কণ্টকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে এবং এই গাছ অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর ভূমিতে বৃদ্ধি পাইয়া গো মহিষাদির উৎকৃষ্ট

খাদ্য যোগাইতেছে। আমেরিকার একজন কৃষিতত্ত্ববিৎ নানা প্রকার ফলের কলমের সংমিশ্রনে প্রায় দুইশত নূতন ফল সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র কৃষি-বিদ্যা অদ্ভুত উৎকর্ষ লাভ করিতেছে ঠিক তখনই আমরা বলিতেছি কলিকাল পড়িয়াছে—মাতা বসুন্ধরা আর ফসল প্রসব করিতে পারিতেছেন না!

কৃষি সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য ও অনভিজ্ঞতাবশতঃ আমরা দুর্ভিক্ষের কারণ সৃজন করিতেছি। যদিও ধান্য-শস্য নষ্ট হইবার বহু কারণ বিদ্যমান, তথাপি আমরা সমুদয় ক্ষেত্রে কেবল মাত্র ধান্যের বীজ রোপণ করিয়া থাকি। যে বৎসর ধান্য শস্য নষ্ট হয় সে বৎসর আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য, কারণ, অন্য কোন প্রকার শ্বেত-সার-প্রধান খাদ্যশস্যের চাষ বিরল। ক্যাসাভা, চিনাবাদাম প্রভৃতি কতকগুলি শ্বেতসারপ্রধান ফসল আছে যাহা আমাদের দেশের মাটীতে সহজেই উৎপন্ন হইতে পারে অথচ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে নষ্ট হয় না। ক্ষেত্রের এক অংশে যদি এইরূপ ফসলের চাষ করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের সময় কুলের আঁটি খাইয়া জীবন ধারণের বৃথা চেষ্টা করিতে হয় না।

আমরা অনেক সময়ে লাভের আশায় খাদ্যশস্যের চাষ কমাইয়া, "যে সকল ফসল বিদেশে রপ্তানি হইয়া বিদেশীয় বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় সেই সকল ফসলই অধিক পরিমাণে" উৎপাদন করিতেছি। পাটের চাষ ১৮২৯ সাল হইতে ("যখন কলিকাতার কাষ্টম হাউস্ পাট রপ্তানির প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করেন") ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া খাদ্যশস্য চাষের উত্তরোত্তর হ্রাস সাধন করিয়া আসিতেছে। আমরা ইচ্ছা করিয়া দুর্ভিক্ষের এই কারণটী সৃষ্টি ও পোষণ করিতেছি।

দারিদ্র্যের দ্বিতীয় কারণ অল্প মূল্যে শস্য বিক্রয়। বৎসরের যে সময়ে কৃষকদিগের আর্থিকাবস্থা হীন হয়, সেই সময়ে তাহারা দাদন লইয়া মহাজনের নিকট অতি অল্পমূল্যে শস্য বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হয়। "পাট চাষের জন্য কৃষকেরা আষাঢ় মাসে ৫৲

অথবা ৫।৹ টাকা দাদন লইয়া আশ্বিন মাসে দালালকে এক মণ পাট দিয়া থাকে। এক মণ পাট বিক্রয় করিয়া দালালেরা ৯।১০ টাকা পাইয়া থাকে। তিসি অথবা বুট চাষের জন্য দালালেরা কৃষককে ৫ অথবা ১।।৹ টাকা দাদন দিয়া থাকে। তিন চারি মাস পরে দালালেরা কৃষকের নিকট এক মণ তিসি অথবা বুট পাইয়া উহা ৭ অথবা ২।।৹ টাকা দরে সহরের হাটে বিক্রয় করে।"

দ্বিতীয়তঃ, যে সময়ে নূতন শস্যের আমদানি হয়—অর্থাৎ যখন শস্যের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, কৃষকগণ ঠিক সেই সময়ে শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। অধিকন্তু তাহারা তাহাদের পরিমিত ফসল বড় বড় মহাজনের নিকট বিক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া দালালের নিকট অধিকতর অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

এই নিদারুণ দারিদ্র্যের তৃতীয় কারণ উচ্চহারে ঋণ গ্রহণ। যদি কোন কারণে নিঃস্ব কৃষকের এক কালীন ২০।২৫ টাকা আবশ্যক হয় এবং যদি ফসল বিক্রয়ের দ্বারা ঐ টাকা সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য না থাকে তাহা হইলে সে পল্লীবাসী কোনও কুশিদ-জীবীর ঋণজালে আবদ্ধ হয়। এ ঋণজাল কৃতান্তের পাশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। টাকাপ্রতি মাসিক চারি পয়সা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত সুদ পল্লীগ্রামে সাধারণ ব্যবস্থা। যে ব্যক্তি চারি পয়সা সুদে ২০ টাকা ধার করিবে তাহাকে বৎসরে প্রায় ১৫ টাকা সুদ দিতে হইবে। পূর্ব্বে কৃষকের আর্থিক অবস্থা যেরূপ পর্য্যালোচনা করিয়াছি তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, খাদ্য ও বসনের ব্যয় বিশেষ সঙ্কুচিত না করিলে তাহার সঞ্চয় করিবার সংস্থান কিছুই নাই। সুতরাং ঋণবদ্ধ কৃষক কেবল মাত্র বাৎসরিক সুদ পরিশোধ করিবার নিমিত্তই অর্দ্ধোপবাস করিতে বাধ্য!

শুধু ইহাই নহে, ঋণবদ্ধ কৃষক উত্তমর্ণের নিকট একপ্রকার ক্রীতদাস হইয়া পড়ে। সুদভার লাঘব করিবার আশায় কৃষক শারীরিক পরিশ্রম এবং উৎপন্ন শস্যাদি বিনামূল্যে দান করিয়া উত্তমর্ণের প্রীতি উৎপাদন করিতে সচেষ্ট হয়। অনেক সময়

উত্তমর্ণ মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়া দরিদ্র কৃষককে ঐরূপ আচরণ করিতে বাধ্য করেন।

কুশিদজীবীদিগের ব্যবসায় অর্থশাস্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ। অর্থের যেরূপ ব্যবহার দ্বারা কেবল মাত্র একব্যক্তি লাভবান্ হয়, অর্থের সে ব্যবহার অতি নিকৃষ্ট, সমাজের পক্ষে নিতান্ত অকল্যাণকর। পল্লীবাসী ধনী ও মধ্যবিত্তগণ যদি ঋণদান ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের মূলধন কৃষি ও শিল্পে নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও অনেক লাভবান্ হইতে পারেন এবং সমাজেরও যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হয়। আমরা ইচ্ছা করিলেই দারিদ্র্যের তৃতীয় কারণটী দূর করিতে পারি।

বহুমূল্যে ব্যবহার-সামগ্রী ক্রয় আমাদের পল্লীগ্রামের দারিদ্র্যের চতুর্থ কারণ। পল্লীগ্রামে উৎপন্ন শস্যাদি ও নানাপ্রকার গব্য দ্রব্য অল্প মূল্যে হইয়া থাকে বটে কিন্তু নুন, তেল, মশলা, চিনি বস্ত্রাদি অপেক্ষাকৃত উচ্চদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। কারণ, পল্লীগ্রামের দোকানদারগণ অতি সামান্য মূলধনে ব্যবসায় করে বলিয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের মহাজনদিগের নিকট পাইকিরী দরে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, পল্লীবাসী দোকানদারগণ সামান্য একখানি দোকান হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে বলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে লাভাংশ রাখিয়া থাকে। অবশ্য ধারে বিক্রয় করিতে হয় বলিয়া লাভাংশের হার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে তাহারা বাধ্য হয়। যদিও দারিদ্র্যের এই চতুর্থ কারণটী অতি সামান্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, তথাপি, আমাদের পল্লীগ্রামের ন্যায় নিঃস্ব স্থানে ইহা কিছুতেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

বিদ্বৎসন্ন্যাস।

(পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অনন্তর আমরা বিদ্বৎসন্ন্যাস বর্ণনা করিব। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের সম্যক্ অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহারা পরম-তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারাই বিদ্বৎসন্ন্যাস সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য সেই বিদ্বৎসন্ন্যাস সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে (এইরূপ বেদে শুনা যায়) যে জ্ঞানীদিগের শিরোমণি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য "বিজিগীষুকথায়" (বৃহদারণ্যক, তৃতীয় অধ্যায়) বহুবিধ তত্ত্বনিরূপণের দ্বারা আশ্বলায়ন প্রভৃতি বিপ্রগণকে জয় করিয়া "বীতরাগকথায়" (বৃহদারণ্যক, চতুর্থ অধ্যায়) সংক্ষেপে ও সবিস্তর অনেক প্রকারে জনককে বুঝাইয়াছিলেন। তদনন্তর মৈত্রেয়ীকে বুঝাইবার নিমিত্ত অবিলম্বে (নিজের অনুভূত) তত্ত্বের প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য স্বয়ং যে সন্ন্যাস সম্পাদন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন তাহার প্রস্তাব করিলেন। তদনন্তর তাঁহাকে বুঝাইয়া সন্ন্যাস সম্পাদন করিলেন। এই দুই (সন্ন্যাস প্রস্তাব ও সন্ন্যাস সম্পাদন) মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণের (বৃহ, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম ব্রাহ্মণের) আদিতে ও অন্তে পঠিত হইয়া থাকে। যথা—"অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যো হন্যদ্‌বৃত্তমুপাকরিষ্যন্মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি" (বৃহ, ৪।৫।২)। (তাহার পর যাজ্ঞবল্ক্য আশ্রমান্তর গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কহিলেন, "হে মৈত্রেয়ি, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া এই স্থান হইতে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছি") এবং "এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার" (বৃ—৪।৫।১৫)। [অরে, ইহাই (সন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ) নিশ্চয় অমৃতত্ব (অর্থাৎ

অমৃতত্ব সাধনের উপায) এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

কহোল ব্রাহ্মণেও বিদ্বৎসন্ন্যাসের কথা এইরূপ পঠিত হইয়া থাকে। যথা, "এবং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি, (বৃহ, ৩।৫ ১) । সেই আত্মাকে এইরূপ জানিয়াই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ পুত্রকামনা বিত্তকামনা এবং লোককামনা (অর্থাৎ ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা) পরিত্যাগ করিয়া (পরিশেষে) ভিক্ষাচর্য্য (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিয়া থাকেন।

এ স্থলে কেহ যেন এরূপ আশঙ্কা না করেন যে বিবিদিষা সন্ন্যাস প্রতিপাদন করাই বাক্যের তাৎপর্য্য। কেননা তাহা হইলে বিদিত্বা এই শব্দের 'ত্বা' প্রত্যয়ের, অর্থাৎ উক্ত বাক্যান্তর্গত "জানিয়া" শব্দের "ইয়া' প্রত্যয়ের পূর্ব্বকালবাচিত্বর (অর্থাৎ জানিবার পর এই অর্থের) ব্যাঘাত ঘটে, এবং ব্রাহ্মণ শব্দের ব্রহ্মবিদ্ অর্থেরও ব্যাঘাত ঘটে। এস্থলে 'ব্রাহ্মণ' শব্দে ব্রাহ্মণ জাতি বুঝাইতে পারে না, কেননা, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের * শেষে যে ' অথ ব্রাহ্মণঃ" (অনন্তর ব্রাহ্মণ) এইরূপ শব্দ প্রয়োগ আছে, তাহা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাধনস্বরূপ "পাণ্ডিত্য, বাল্য, ও মৌন" এই শব্দত্রয়ের দ্বারা সংসূচিত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন উল্লিখিত হইয়াছে।

(শঙ্কা)—যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে সেই স্থলে বিবিদিষা সন্ন্যাসযুক্ত এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত ব্যক্তি 'ব্রাহ্মণ" শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে, যথা, "সেই হেতু 'ব্রাহ্মণ' পাণ্ডিত্য (বেদান্তবাক্য বিচাররূপ শ্রবণ পরিসমাপ্ত করিয়া বাল্যের সহিত

---

* শ্রুতি বাক্যটী এইরূপ— (বৃহ, ৩।৫।) "...ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি...তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ" ।

(অর্থাৎ অনাত্মদৃষ্টি দূরীকরণ সামর্থ্যরূপ জ্ঞানবলে যুক্ত হইয়া) অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন।"

(সমাধান)—(তবে তদুত্তরে বলা যাইবে) এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কেননা তথায় "ভবিষ্যদ্‌বৃত্তি" অর্থাৎ পরে যিনি 'ব্রহ্মবিদ্‌' হইবেন এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াই 'ব্রাহ্মণ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ; তাহা না হইলে এস্থলে যে "অথ" শব্দের অর্থ 'অনন্তর' অর্থাৎ সাধনানুষ্ঠানের পরবর্ত্তী কালে সেই 'অথ' শব্দের "অথ ব্রাহ্মণঃ" এইরূপে কেন প্রয়োগ করা হইল ?

শারীর ব্রাহ্মণেও (বৃহ, ৪,৪,২২) বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎসন্ন্যাস এই দুই সন্ন্যাস স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—"এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবত্যেতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি—[এই আত্মাকে জানিয়াই মুনি (মননশীল যোগী) হয়েন, এই আত্মলোক পাইবার ইচ্ছা করিয়াই প্রব্রজনশীল (মুমুক্ষুগণ) প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন।] 'মুনি' শব্দে 'মননশীল' বুঝায়। অন্য কোনও প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না থাকিলেই এই মননশীলতা সম্ভবপর হয় সুতরাং ইহা দ্বারা সন্ন্যাসই সূচিত হইতেছে। (পূর্ব্বোক্ত) শ্রুতিবাক্যের শেষে এই কথা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলা হইয়াছে। "এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি ইতি"। [সেই এই (সন্ন্যাসাবলম্বনের স্পষ্ট কারণ) এইরূপে (স্মৃত হইয়া থাকে)—প্রাচীন আত্মজ্ঞগণ প্রজা (সন্ততি, বিত্ত, কর্ম্ম ইত্যাদি) কামনা করিতেন না ; (তাঁহারা বলিতেন) আমরা—যাহাদের এই (নিত্য সন্নিহিত) আত্মাই এই লোক সেই আমরা—প্রজা লইয়া কি করিব ? এই হেতু তাঁহারা পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ও স্বর্গাদি লোককামনা পরিত্যাগ করিয়া, তদনন্তর ভিক্ষাচর্য্য (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিতেন। এই আত্মাই এই লোক—এই স্থলে "এই লোক" অর্থে যে লোক বা পুরুষার্থ তাঁহারা অপরোক্ষভাবে অনুভব করিতেছেন।

(শঙ্কা)—এস্থলে যদি আশঙ্কা করেন যে এস্থলে মুনিত্বরূপ ফলের দ্বারা (অর্থাৎ মুনি হইবার) প্রলোভন দেখাইয়া বিবিদিষা সন্ন্যাসের বিধান করা হইয়াছে, এবং বাক্যশেষে তাহাই সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে ; এই হেতু বিবিদিষা সন্ন্যাস ব্যতীত অন্য সন্ন্যাস কল্পনা করা সঙ্গত নহে।

(সমাধান) তবে আমরা বলি, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, 'বেদন' অর্থাৎ আত্মাকে জানা, বিবিদিষা সন্ন্যাসের ফল। যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে আত্মাকে জানা ও মুনি হওয়া একই কথা, তবে বলি, এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। কেননা, "(আত্মাকে) জানিয়া মুনি হয়েন" এস্থলে আত্মাকে জানা হইবার পর মুনি হওয়া যায় এইরূপ বলায় পূর্ব্বকালীন আত্মজ্ঞানের সহিত উত্তরকালীন মুনিত্বের সাধন ও সাধ্য (উপায় ও উপেয়) সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র ।

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড় ।
৫।৬।১৬।

পরম স্নেহভাজনেষু—

কয়েক দিন হল তোমার পত্র পেয়েছি। গতকল্য রাত্র হতে এখানে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। বোধ হয় তোমাদের ওখানেও এ বৃষ্টি বাদ যাবে না। বিশ্ববিধাতা ভগবান্ না দিলে মানুষের দানে লোকের অভাব কখনই মিটে না। এই সব দুঃখ কষ্ট রোগ শোকের মধ্যেও প্রভুর লীলা দেখ্‌বার চেষ্টা কর। তিনি পরম কল্যাণময়। আমরা মাটীর খেলনা নিয়ে ভুলে আছি। কামিনী-কাঞ্চন মান-ইজ্জৎ

পেয়ে সব বিস্মরণ! তাই কৃপানিধান দয়া করে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, মহাযুদ্ধ আমাদের মধ্যে 'বহুজনহিতায়' আনেন। শেখ দেখে দেখে—কেবল শিক্ষা কর। কেবল মাত্র দুমুঠো চাল দেবার জন্য ঠাকুর তোমাদের ওখানে পাঠান নাই—মহত্ত্ব দেবত্ব দেবার জন্য। উচ্চ মন উদার হৃদয় কেমন করে লাভ কত্তে হয় শিখে নাও। এমন সুযোগ আর পাবে না। এ যুগের অবতার বলেছেন, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?"। এ ভাব প্রত্যক্ষ কর, মানব জীবন ধন্য কর, স্বামিজীর কৃপায় তোমরা আদর্শ জীবন লাভ কর। বুঝ্‌ছ না, আমরা কি এখানকার কর্ত্তা? ভগবৎ-শক্তির বিকাশ এখানে, সেই শক্তিবলে তোমরা ঐসব কাজ কর্ত্তে সমর্থ, জান না কি স্বামিজী লিখে গেছেন, "তিনি সূক্ষ্ম দেহে এই সঙ্ঘের মধ্যে বর্ত্তমান"? বিশ্বাস কর, সেই নিত্যসিদ্ধ মহা-পুরুষের আদেশবাণী। বিশ্বাস কর—তোমাদের কর্ম্মপাশ কেটে যাবে, পরাভক্তি লাভ হবে, জীবন্মুক্ত হয়ে যাবে। কিহে! তোমরা কি সাধারণ লোক? ভুলে গেছ কি যে আদ্যাশক্তির কৃপা লাভ করেছ? জগতের কটা লোকের এ সুযোগ সৌভাগ্য হয় বল? আমার খুব ভাল লাগে 'নাহং নাহং' ভাব। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি রথ তুমি রথী। কৃপাময় কেবল এইটী বোঝাচ্ছেন রোজ রোজ। মহারাজ বলেন, তোমাদের কোটী কোটী জন্মের তপস্যা হয়ে যাচ্ছে ঐ নিষ্কাম নিঃস্বার্থ কর্ম্মে—এ কেবল স্তোকবাণী নয়, সত্য কথা জান্‌বে। হরিকে ধরে হরির শক্তিতে হরির সেবা কচ্ছ। ঐ মূর্খ জড়প্রায় গণ্ডগ্রামে ঠাকুরের লীলা দেখে অবাক্ হচ্ছ! এ কার ঐশ্বর্য্য মনে কর? এর মধ্যে কি কিছু শিখ্‌বার নাই? বলি তুমি কে মাধাইদাস যে লোকে তোমার মুখে ঠাকুরের কথা শুন্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব? এইখানেই প্রভু-শক্তির বিকাশ। তুমিও সেই দেববাণী শুনাতে যেতে যাও নাকি? সাধন ভজন কার নাম? অনন্ত আকাশে লম্বা লম্বা কল্পনা জল্পনা নিয়ে থাক্‌লেই কি বড় হওয়া চলে? কবিত্ব ছেড়ে কাজে লেগে যাও,

জীবন দেখাও, আদর্শ ত রয়েছে সাম্‌নে—ভয় কি? হও আগুয়ান, তোমরা লক্ষ্যস্থানে নিশ্চয়ই পৌঁছিবে। মহারাজ, মহাপুরুষ প্রভৃতি ভাল আছেন। তোমরা তাঁদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবে। আমরা ভাল আছি। তোমাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখিবে। ঠাকুর তোমাদের রক্ষা করিতেছেন সর্ব্বদা মনে রাখিবে। দেখ্‌তে পাচ্ছ ত সব, এতেও অবিশ্বাস আন কেন? নিঃস্ব চাষাদের যদি বীজধান্য কিম্বা হাল দরকার হয় তোমাদের কর্ত্তাকে লিখিলে পাইবে। * * * তোমরা আমার ভালবাসা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। * * * ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেমানন্দ।

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।
৩০।৭।১৬।

কল্যাণবরেষু—

* * * হাসপাতাল খোলা সম্বন্ধে কে—তোমাদের জানাইয়াছে, আমারও সেই মত। যদি তাহার অভাব না থাকে তবে হাসপাতাল হতে বিরত হওয়াই উচিত। ও অতি নট্‌খটে ব্যাপার। এই সাময়িক দুর্ভিক্ষে লোক পাঠানই বেজায় মুস্কিল, তার উপর বহুদিনের জন্য সেবা কার্য্যে পাঠান মহা হাঙ্গামার কাজ।

স্বামিজীরও ইচ্ছা ছিল বিদ্যাদান। ইহা অতি উত্তম সঙ্কল্প। কেবল সেবাশ্রম আর সেবাশ্রম! ও এক হুজুক উঠেছে। কেন নূতন কি কিছু কর্‌বার নাই? স্বামিজী শেষ দিন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার কাছে কেবল বিদ্যা প্রচারের কথা বলেছিলেন। ইহাতে তোমাদের ও দেশের মহা কল্যাণ হবে, ইহা ধ্রুব সত্য, ইহা ধ্রুব সত্য। তোমাদের আদর্শ জীবন দেখ্‌লে ছেলেরা এক অপূর্ব্ব নবজীবন লাভ কর্ব্বে। হও তোমরা এই বিদ্যাপ্রচারের পথ প্রদর্শক। সাধুসঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চা কর্লে দেশের শ্রী ফিরে যাবে,

লক্ষ্য স্থির হয়ে যাবে ছেলেদের। তবেই ছেলেরা শুধু মানুষ কেন দেবতা হবে—ঋষি হবে। * * *

মহারাজ মান্দ্রাজে ভাল আছেন। এখানকার কুশল। তোমরা আমার স্নেহসম্ভাষণ ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেমানন্দ।

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।
৭।৮।১৬

স্নেহভাজনেষু—

তোমার পত্র প'ড়লাম। দীক্ষা গ্রহণ খুব দরকার। যেখানে তোমার শ্রদ্ধা সেইখানেই মন্ত্র নিতে পার। কথায় শুনেছি ঠাকুরের কাছে "গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হল, একের দয়া বিনা জীব ছারখারে গেল।" অর্থাৎ মনের দয়ার বিশেষ প্রয়োজন। চাই শুদ্ধ মন। 'মন চাঙ্গা ত কঠোরে যে গঙ্গা'। পাব পাব—এই মন নিয়েই ভগবান্ লাভ কর্ব্বো, চাই এই দৃঢ় বিশ্বাস। হবে হবে, আমার হবেই হবে, চাই এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। ক্ষেত্র তৈয়ার হয়ে থাক, ভাল বীজ পড়লেই অমনি গাছ। দেখা দেখি দীক্ষা নিলে কি হবে? অনুরাগ বাড়াও, তীব্র বৈরাগ্য ব্যাকুলতা আসুক, হবেই ত কৃপা অনুভব কর্ব্বে—শান্তি লাভ কর্ব্বে। গোপনে গোপনে ডেকে যাও ভগবান্‌কে, মনে মনে প্রাণে প্রাণে টান্‌তে হবে তবেই উপস্থিত হবেন ঠাকুর। আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেমানন্দ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

তর্কামৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কার বিরচিত। অনুবাদক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রাপ্তিস্থান—লোটাস লাইব্রেরী, ২৮।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ক্রাউন ৬৪ পৃঃ, মূল্য ॥০ আনা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় অনুবাদটী সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় গ্রন্থের একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

বঙ্গদেশ একসময়ে নব্যন্যায়ের চর্চ্চায় সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল—এক্ষণে নানা কারণে এই চর্চ্চার প্রসার খুব কমিয়া গিয়াছে। যাহাতে এই চর্চ্চা আবার বাড়ে, রাজেন্দ্রবাবু তদুদ্দেশ্যে ইতিপূর্ব্বেই 'ব্যাপ্তিপঞ্চকে'র বিস্তারিত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যাহাতে প্রথমশিক্ষার্থিগণও এবিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইতে পারেন তদুদ্দেশ্যেই ইঁহার এই বর্ত্তমান প্রয়াস। এতদুদ্দেশ্যে সাধারণতঃ বঙ্গদেশে 'ভাষাপরিচ্ছেদ' ও পশ্চিমাঞ্চলে 'তর্কসংগ্রহ' অধীত হয় বটে কিন্তু নৈয়ায়িকশিরোমণি জগদীশ বিরচিত এই গ্রন্থখানি এই বিষয়ে অনেকের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ন্যায় শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ আচার্য্যসমূহের মধ্যে একমাত্র ইনিই উক্ত শাস্ত্রে প্রথম-প্রবেশার্থিগণের জন্য এই একখানি মাত্র গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং ইহার অনুবাদ প্রচার করিয়া রাজেন্দ্রবাবু অতি প্রশংসনীয় কার্য্যই করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে ন্যায়শাস্ত্রসম্মত সাতটী পদার্থের লক্ষণ ও উহাদের অবান্তর বিভাগাদির বর্ণনা এবং জ্ঞানের উপায়স্বরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বর্ণনা করা হইয়াছে।

যাঁহারা বেদান্তের 'অদ্বৈতসিদ্ধি' আদি প্রকরণগ্রন্থগুলি পড়িতে চান তাঁহাদের পক্ষে নব্যন্যায়ের জ্ঞান অপরিহার্য্য। এতদ্ব্যতীত আধুনিক

অধিকাংশ সংস্কৃত দার্শনিকগ্রন্থ নব্যন্যায়ের পরিভাষাবহুল ভাষায় রচিত হওয়ায় সেগুলির আলোচনায়ও ন ্যায়ের সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

আমরা মূলের সহিত অনুবাদ স্থানে স্থানে মিলাইয়া দেখিলাম, উহা মূলানুযায়ী ও আক্ষরিক হইয়াছে। তবে স্থানে স্থানে আর একটু প্রাঞ্জল হইলে ভাল হইত। স্থানে স্থানে কঠিন বিষয়গুলি বুঝাইবার জন্য ২।৪টী ফুটনোট দিলেও ভাল হইত। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে অনুবাদক মহাশয় এই বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিবেন।

অনুবাদক মহাশয় তাঁহার 'নিবেদনে' বলিয়াছেন যে, তিনি শীঘ্রই ইহার সুবিস্তৃত ব্যাখ্যারূপে যথাসম্ভব সরল বঙ্গভাষায় আধুনিক রুচির অনুরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন। আমরা ইহাতে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছি। আশা করি, উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে এবং উহা পাঠ করিয়া আমাদের মত ন্যায়শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিও উহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং উহার মোটামুটি কতকটা তত্ত্ব জানিয়া উহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব অন্বেষণের দিকে আপনিই আগ্রহ আসিবে। ন্যায় শাস্ত্রের ন্যায় নীরস শুষ্ক বিষয়কে সাধারণের উপাদেয় করিয়া প্রচার করা খুব কঠিন কার্য্য। শ্রীযুত রাজেন্দ্র বাবু তর্কতীর্থ মহাশয় ও তর্কভূষণ মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিতবর্গের সাহায্য পাইয়া এ বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন —আশা করি, পরে আরও অধিক কৃতকার্য্য হইবেন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আমরা কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে সোসাইটী নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করিয়াছে—(১) প্রতি শনিবারে ১টী করিয়া সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে ৪১টী ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা প্রদান, (২) সহরের বিভিন্ন অংশে সভ্যদের বাটীতে প্রতি মাসে ১টী করিয়া ১২টী ধর্ম্মালোচনাসভার

অধিবেশন। (৩) সোসাইটী-গৃহে ৪০টী সাপ্তাহিক ক্লাসে উপনিষদ্, কর্ম্মযোগ ও কথামৃত পাঠ। (৪) শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য পূজা ও বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম ইত্যাদি। (৫) ১৬৬৭ জন রোগীকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা ও ঔষধাদি দান। (৬) উত্তরবঙ্গে বন্যা নিবারণকল্পে ৬২৬ .৫ সংগ্রহ করিয়া রামকৃষ্ণমিশনের সহযোগে নন্দনালী থানায় বস্ত্র ও চাউল বিতরণ। (৭) ৩৫ জন ছাত্রকে মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে ২৫১৲ টাকা এবং ৯ জন ছাত্রকে পরীক্ষা দিবার ও কলেজে ভর্ত্তি হইবার আংশিক 'ফি' হিসাবে ৩৯।০ টাকা দান। (৮) মেম্বরগণের জন্য লাইব্রেরী ও সাধারণের জন্য পাঠাগার স্থাপন। (৯) ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সময়ে কলিকাতা-করপোরেশনের সহযোগে শুশ্রূষা, ঔষধ পথ্যাদি দান। আলোচ্য বর্ষে সোসাইটীর মোট আয় ৪৩০২৸৴০ টাকা এবং মোট ব্যয় ৩১৬৮৸৶৫ ; মজুদ—১১৩৩৸৶১৫ টাকা। সোসাইটীর কার্য্য বর্ত্তমানে ৭৮।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একটী ভাড়া বাড়ী হইতে চলিতেছে। উহাতে স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে—বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থানে- তাঁহার পুণ্য স্মৃতিরক্ষার্থ কোন মন্দির আজও নির্ম্মিত হইল না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাই সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ ইচ্ছা যে ঐ উদ্দেশ্যটী শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হয় এবং ইহার জন্য তাঁহারা দেশবাসীর নিকট আবেদন করিতেছেন। উক্ত গৃহনির্ম্মাণকল্পে বা অন্যান্য কার্য্যে যিনি যাহা দান করিতে চান তাহা শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত, সেক্রেটারী, ১নং লক্ষ্মীদত্ত লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

শ্যামবাজার ১২।১নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে অবস্থিত কলিকাতা অনাথাশ্রমের সপ্তবিংশতি বার্ষিক কার্য্যবিবরণীও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আশ্রমের কার্য্যপ্রণালী অতি সুন্দররূপে চলিতেছে। আলোচ্য বর্ষে অনাথের সংখ্যা বৎসরের প্রারম্ভে ১১৫ জন ছিল। কিন্তু পরে

ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১৪৭ হয়, ইহার মধ্যে ৯০ জন বালক ও ৫৭ জন বালিকা। ইহাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য আশ্রম যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন এবং ৫টী অনাথা বালিকাকে সুযোগ্য পাত্রে পরিণীতা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। অনাথের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় আশ্রমের পরিসর বৃদ্ধির জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ পার্শ্ববর্ত্তী জমী ও বাড়ী ক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

আশ্রমের সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুত চুনীলাল বসু মহাশয় এই দুর্গোৎসবের সময় অনাথ বালকবালিকাগুলির জন্য সাধারণের নিকট নববস্ত্র প্রার্থনা করিতেছেন। নিম্নে বস্ত্রের তালিকা প্রদত্ত হইল।

১০	হাত	ধুতি	৯	সাটি	৪	৭	হাত	ধুতি	১৪	সাটি	৭
৯	”	”	৭	”	১০	৬	”	”	১৯	”	৩
৮	”	”	২১	”	১০	৫	”	”	৭	”	৪

বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে আর্থিক সাহায্যও সাদরে গৃহীত হইবে।

বিগত ৩রা আগষ্ট, ১৯১৯ খৃঃ বাঙ্গালোরস্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ষ্টুডেন্টস্ হোমে'র প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্বামী নির্ম্মলানন্দের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা আহূত হইয়াছিল, সহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালোর মঠ হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ছাত্রাবাস পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। ৯টী ছাত্র লইয়া এই 'হোম' খোলা হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির সমান প্রবেশিকাধিকার রহিয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য।

(বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা)

দেশের অন্নসমস্যা দিন দিন কিরূপ জটিল হইয়া উঠিতেছে তাহা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। দীনহীনের ত কথাই নাই মধ্যবিত্তগণও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। চাল, ডাল, ঘি, নুন, তেল, আটা সবই অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। আজ সর্ব্বত্রই "হা অন্ন" "হা অন্ন" রব। সুতরাং দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত স্থানে লোকদের অবস্থা যে ইহাপেক্ষা শতগুণ খারাপ তাহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না।

বিগত আটমাস ধরিয়া আমরা পাঠকবর্গকে দুর্ভিক্ষের কথা শুনাইয়া আসিতেছি। মনে হইয়াছিল, আশু ধান্য হইলে বুঝি এই দুর্দ্দিন কাটিয়া যাইবে। কিন্তু দেশের অবস্থা দিন দিন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে কোথাও অতিবৃষ্টিতে কোথাও বা অনাবৃষ্টিতে, কোথাও ঝড়ে কোথাও বা বন্যায় সেই আশু ধান্যও নষ্টপ্রায়। তাই দুর্ভিক্ষানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শত সহস্র ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, কঙ্কালসার, কোটরগতচক্ষু পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে আজ পাষাণও গলিয়া যাইতেছে।

আমরা ৭টী জেলায় প্রতি মাসে প্রায় ৮০০।০ মণ চাউল বিতরণ করিতেছি। কিন্তু অভাবের তুলনায় ইহা কিছুই নয় বলিলেও চলে। এই বৃহৎ অনুষ্ঠানে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা দেশবাসীর নিকট হইতে সেরূপ সহানুভূতি পাইতেছি না। দাতাকর্ণ, শিবি, দধীচি, হরিশ্চন্দ্রের দেশে লোকসকল একমুষ্টি অন্নাভাবে না খাইয়া মরিবে? যতদিন না দেশে স্থায়ীভাবে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় আবিষ্কৃত হয় ততদিন কি দেশবাসী তাঁহাদের দুঃস্থ ভ্রাতাভগিনীগণকে দুটী দুটী অন্ন দিয়া বাঁচাইয়া রাখিবেন না? দেশের যে কৃষককুল সারাজীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শস্য

উৎপাদন করিয়া এতদিন তাঁহাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, আজ তাহাদের এই দুর্দ্দিনে তাহাদের সেই নীরব উপকার স্মরণ করিয়া কেহ কি তাহাদের দিকে করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না? আজ গৃহে গৃহে দুর্গোৎসব—সকলেই মহামায়ীর পূজায় রত। তাই আমরা তাঁহাদিগকে উপনিষদের সেই মহতী বাণী স্মরণ করাইয়া জগজ্জননীর নররূপী বিরাট পূজার আহ্বান করিতেছি।

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" ॥

এই মহদনুষ্ঠানে যিনি যাহা দান করিতে চান তাহা (১) ম্যানেজার উদ্বোধন, ১নং মুখার্জ্জী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, অথবা (২) প্রেসিডেন্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া, এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

নিম্নে সংক্ষেপে ২৩ শে জুলাই হইতে ২৭শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক চাউল বিতরণের বিবরণ প্রদত্ত হইল,—

বাগদা (মানভূম)

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
৩৯	৬৩৪	৩২৴৪
৩৯	৬৩৯	৩২।৪
৩৯	৬৫৯	৩৩৸৮
৩৮	৬৭৪	৩৫৴০
৩৮	৬৭১	৩৪।০

ইন্দপুর (বাঁকুড়া)

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
২৬	১৯৯	১০৷৷৫
২৭	১৯৮	১০।২
২৭	১৭৩	৮৸৬
২৬	১৯১	১০৴৫
২৩	১৭৪	৯৴৩

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
	কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া)	
১৯	১৮২	৯৶০
১৯	১৮৭	৯৶৮
১৯	১৬৫	৮৶৪
১৭	১১৯	৬॥৬
১৭	১২৫	৭/২
	গঙ্গাজলঘাটি (বাঁকুড়া)	
১০	১১৬	৬।৮
১০	১২০	৭/১
১২	১৪২	৮/৫
১২	১২৮	৬৶৪
১২	১৩৯	৮/০
	বাকুড়া	
১৫	২০৪	১০॥৬
১৫	১৭৮	৯/১
১৮	৩১২	৭৶৫
	দত্তখোলা (ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ত্রিপুরা)	
৩২	৭৩৩	৩৬/০
৩২	৫৮৮	২৯৶৬।/০
৩৩	৫৬৪	২৮/৮
	বিটঘর (নবিনগর, ত্রিপুরা)	
৯	৮০০	৬৮/০
৯	৬৬৭	৫৬/০
৯	৬৪৩	৫৪।৫
৯	৬১৬	৪৪॥০
৯	৫৭১	৩২।৬

ভারুকাঠি (বরিশাল)

গ্রামের সংখ্যা।	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা।	চাউলের পরিমাণ।
৫	১৩০	৬॥০
৫	১৩০	
৫	১৩০	৬॥০
৫	১৩০	৬॥০

গুঠিয়া (বরিশাল)

গ্রামের সংখ্যা।	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা।	চাউলের পরিমাণ।
১৪	১৯৩	৪৸৫
১৭	১৮৯	৪/৮
১৭	১৮৭	৩/৪
১৬	১৮৭	২৸৭

মিহিজাম (সাঁওতাল পরগণা)

গ্রামের সংখ্যা।	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা।	চাউলের পরিমাণ।
৯	১৫৩	৯/০
১৮	২৯২	১১॥০
২০	৩৪১	১২।৫
২০	৩৪৫	১২॥০
২৩	৩৬৮	১২৸০
২৩	৩৮৫	১২/০

ভুবনেশ্বর (পুরী)

গ্রামের সংখ্যা।	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা।	চাউলের পরিমাণ।
১	১৯	॥৮
২	৪৪	২।৮
৪	১২৭	৮॥০
১৫	২৩৭	১৪॥৩
১৯	১৭৩	১৩/

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সেবাকার্য্য

(ইং ১৯১৮-১৯১৯ খ্রীঃ)

বস্ত্রাভাবমোচন কার্য্য (১৯১৮ আগষ্ট হইতে ১৯১৯ মার্চ্চ)

যুদ্ধের জন্য বস্ত্রের আমদানী কমিয়া যায়, ঐ হেতু এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ বস্ত্রের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তজ্জন্য বঙ্গের সর্ব্বত্রই মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র ব্যক্তিগণ বস্ত্রাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে থাকেন। ঐ অভাব মোচনের জন্য মিশন সহৃদয় সাধারণের নিকট হইতে বস্ত্র এবং অর্থ ভিক্ষা করিয়া বঙ্গ এবং বেহারের ৪৩টী বিভিন্ন স্থান হইতে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে বস্ত্র বিতরণ করেন।

রাজসাহী জেলার বন্যাপ্লাবিত স্থানে সাহায্য কার্য্য।

(ইং ১৯১৮ সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত)

ইং ১৯১৮ সালের আগষ্ট মাসের শেষে রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমা এবং বগুড়া জেলার কতক অংশ আত্রেয়ী নদীর বন্যায় ভাসিয়া যায়। উহাতে উক্ত স্থানসমূহের শতকরা ৮০ জন অধিবাসী গৃহশূন্য হইয়া পড়ে। প্রায় সকলেরই ধানের গোলা, সঞ্চিত খাদ্য শস্য এবং গরুর জন্য রক্ষিত খড় নষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে অধিবাসিগণ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন। রামকৃষ্ণমিশন নওগাঁ মহকুমার সদর এবং রাণীনগর থানায় ৯টী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে চাউল, গরুর খড় দান করেন; এবং যাঁহারা জমীজমা শূন্য হওয়ায় সরকারের নিকট হইতে কৃষিঋণ প্রভৃতি পাইবার অনুপযুক্ত তাহাদিগকে গৃহনির্ম্মাণের জন্য এবং ভানাকুটা করিয়া খাইবার জন্য ধান ক্রয় করিতে অর্থ সাহায্য করেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সেবা।

ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সময় বেনারস জেলায় কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম গত আগষ্ট মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত উক্ত

জেলার বিভিন্ন স্থানে ৫টী কেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক ৩১৩১ জনকে ঔষধ পথ্য এবং শীত নিবারণের জন্য কম্বলাদি দান করিয়া সেবা করেন। এতদ্ব্যতীত বালেশ্বর, ভুবনেশ্বর এবং রামগঞ্জে (নোয়াখালী) মিশনের সেবকগণ যথাক্রমে ৮৫০, ৪৯৭ এবং ৫৬ জন রোগীর সেবা করেন।

মথুরা জেলায় বন্যাকালীন সেবাকার্য্য।

আলোয়ারের একটী বৃহৎ জলাশয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মথুরা জেলার অনেকস্থল প্লাবিত হইয়া যায় এবং ঐ সকল স্থান অনেক দিন ধরিয়া জলমগ্ন থাকে। ফলে ঐ সকল স্থানে নানাবিধ ব্যাধি প্রাদুর্ভূত হয় এবং অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হন। গ্রামবাসীর ঐরূপ অবস্থায় বৃন্দাবন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম সেবাকেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক ঔষধ পথ্য ও কম্বলাদি দিয়া ১০২১ জনকে সেবা করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন।

গঙ্গাসাগর মেলায় সেবাকার্য্য।

গত পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর স্নানের সময় মিশন ৩১ জন সেবককে যাত্রিগণের সেবার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা মেলার তিন দিনে এবং ষ্টীমারে ১১২ জন কলেরা রোগীর সেবা করেন।

উপরোক্ত সেবানুষ্ঠানে যে সকল সহৃদয় দেশবাসী এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ অর্থ দান করিয়া এবং অন্যবিধ উপায়ে মিশনকে সাহায্য করিয়াছেন মিশন তাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ইতপূর্ব্বে 'উদ্বোধনে' এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রাদিতে কোথায় কিভাবে কিরূপ সাহায্য করা হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ ও বস্ত্রাদি সাহায্য পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের নিকটে মিশনের রসিদ পাঠাইয়া উঁহাদের প্রাপ্তিস্বীকার করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের নাম উদ্বোধনে প্রকাশ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ সকল সেবাকার্য্যে মোট কত টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং কি কি বিষয়ে কত খরচ হইয়াছে তাহা পরপৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল।

জমা—

উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত	১০,১৩৫৸৶১০
বেলুড়মঠে প্রাপ্ত	২,৪০৫/০
নওগাঁ বন্যাকষ্ট নিবারণী সমিতির নিকট হইতে প্রাপ্ত	৯৬০৲
বৃন্দাবন সেবাশ্রমে সংগৃহীত	২৬৪৸৵৫
জিনিষপত্রাদি বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত	১০৩৷৵০

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

লস এঞ্জেলিস।
নং ৯২১ ; ২১ নং রাস্তা।
২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯।

প্রিয় নিবেদিতা,

সত্যই আমি চুম্বকতাড়িত চিকিৎসা প্রণালীতে (Magnetic healing) ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠ্‌ছি। মোট কথা, এখন আমি বেশ ভালই আছি। আমার শরীরের কোন যন্ত্র কোন কালেই বিগড়ায় নাই—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও অজীর্ণতাই আমার দেহে যাহা কিছু গোল বাধিয়েছিল।

এখন আমি প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে বা পরে য কোন সময়েই হউক, ক্রোশ ক্রোশ বেড়িয়ে আসি। আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ভালই থাক্‌ব।

এখন চাকা ঘুরে গেছে—মা উহা ঘোরাচ্ছেন। তাঁর কায যতদিন না শেষ হচ্ছে, ততদিন তিনি আমায় যেতে দিচ্ছেন না—এইটীই হচ্ছে আসল ভিতরকার কথা।

দেখ, ইংলণ্ড কেমন উন্নতির দিকে এগুচ্চে। এই রক্তারক্তির পর সেখানকার লোক এই লড়াই, লড়াই, লড়াইয়ের চেয়ে বড় ও উঁচু জিনিষ ভাব্‌বার সময় পাবে। এই আমাদের সুযোগ। আমরা এখন একটু উদ্যমশীল হয়ে দলে দলে ওদের ধোর্‌বো। * * তার পর ভারতীয় কার্য্যটাকেও পুরা দমে চালিয়ে দেব। * * চারিদিকের অবস্থা বেশ

আশাপ্রদ বোধ হচ্ছে অতএব প্রস্তুত হও। চারিটী ভগিনী এবং তুমি আমার ভালবাসা জান্‌বে। ইতি

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

C/o মিস মিড,
৪৪৭, ডগলাস বিল্ডিং,
লস এঞ্জেলিস, কালিফোর্ণিয়া।
১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০০।

প্রিয় নিবেদিতা,

তোমার—তারিখের পত্র আজ প্যাসাডেনায় আমার নিকট পৌঁছিল। দেখ্‌ছি, জো চিকাগোয় গিয়া তথায় তোমায় পায় নাই, তাদের কাছ থেকেও নিউইয়র্ক হতে এপর্য্যন্ত কোন খবর পাই নাই।

ইংলণ্ড থেকে একরাশ ইংরাজী খবরের কাগজ পেলাম—খামের উপর একলাইন লেখা—তাতে আমার প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে ও—সই আছে। অবশ্য উহাদের মধ্যে দরকারি বিশেষ কিছু ছিল না। আমি তাকে একখানা চিঠি লিখ্‌তাম কিন্তু আমি ত ঠিকানা জানি না, আরও ভয় হল, চিঠি লিখ্‌লে তিনি ভয় পেয়ে যাবেন।

* * * আমি মিসেস সে—র কাছে খবর পেলাম যে, নিরঞ্জন কল্‌কেতায় সাংঘাতিক রকমে পীড়িত হয়ে পড়েছেন—জানি না, তাঁর শরীর ছুটে গেছে কিনা। যাই হক্‌, আমি এখন খুব শক্ত হয়েছি—পূর্ব্বাপেক্ষা আমার মানসিক দৃঢ়তা খুব বেড়েচে—আমার হৃদয়টা যেন লোহার পাত দিয়ে বাঁধান হয়ে গেছে। আমি এক্ষণে সন্ন্যাসজীবনের অনেকটা কাছাকাছি যাচ্ছি।

আমি দুই সপ্তাহ যাবৎ সা—র কাছ থেকে কোন খবর পাই নি। তুমি গল্পগুলি পেয়েছ জেনে খুসী হলাম। ভাল বিবেচনা কর ত তুমি নিজে ওগুলিকে আবার নূতন করে লেখ। কোন প্রকাশককে যদি

পাও, তাকে দিয়ে ওগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করে দাও আর যদি বিক্রী করে কিছু লাভ হয়, তোমার কাযের জন্য নাও। আমার দরকার নাই। * * আমি আস্‌ছে হপ্তায় সানফ্রান্সিস্কোয় যাচ্ছি—তথায় সুবিধা কর্‌তে পার্‌ব—আশা করি। * *

ভয় কোরো না, তোমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা আস্‌বে। আস্‌তেই হবে—আর যদি না আসে, তাতেই বা কি আসে যায়? মা জানেন কোন্ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি যে দিক দিয়ে নিয়ে যান, সব রাস্তাই সমান। জানি না, আমি শীঘ্র পূবে * যাচ্ছি কি না। যদি যাবার সুযোগ হয়, তবে ইণ্ডিয়ানায় নিশ্চিত যাবো।

এই আন্তর্জাতিক মেলামেশার মতলবটা খুব ভাল—যে রকমে পার উহাতে যোগ দাও—আর যদি তুমি মাঝে থেকে কতকগুলি ভারতরমণীদের সমিতিকে ঐতে যোগ দেওয়াতে পার তবে আরও ভাল হয়।

* * * *

কুচপরোয়া নেই, আমাদের সব সুবিধা হয়ে যাবে। এই লড়াইটা যেমন শেষ হবে, আমরা অমনি ইংলণ্ডে যাব ও তথায় খুব চুটিয়ে কায কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব—কি বল? স্থিরা মাতাকে লিখ্‌ব কি? যদি তাঁকে লেখা ভাল মনে কর, তাঁর ঠিকানা আমায় পাঠাবে। তিনি কি তার পর তোমায় পত্রাদি লিখেছেন?

ধৈর্য্য ধরে থাক—সবাই ঠিক ঘুরে আস্‌বে। এই যে নানারূপ অভিজ্ঞতা লাভ হচ্ছে তাতে তোমার বেশ শিক্ষা হচ্ছে—আর আমি সেইটুকুই চাই। আমারও শিক্ষা হচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে আমরা উপযুক্ত হব, তখনই আমাদের কাছে টাকা আর লোক উড়ে আস্‌বে। এখন আমার বায়ুপ্রধান ধাত ও তোমার ভাবুকতা মিলে

---

* কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত লস এঞ্জেলিস হইতে স্বামীজি এই পত্র লিখিতেছেন। উহা আমেরিকার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। তথা হইতে পূবে অর্থাৎ নিউইয়র্কের দিকে যাইবার কথা বলিতেছেন। তথায় যাইতে হইলে ইণ্ডিয়ানা নামক স্থান হইয়া যাইতে হয়।

সব গোল হয়ে যেতে পারে। সেই কারণেই মা আমার বায়ু একটু একটু করে আরোগ্য করে দিচ্ছেন আর তোমারও মাথা ঠাণ্ডা করে আন্‌ছেন। তার পর আমরা—যাচ্ছি আর কি। এইবার আর একটু আধটু ছোটখাট নয়, রাশরাশ ভাল কায হবে, নিশ্চিত জেনো। এইবার আমরা প্রাচীন দেশ ইউরোপের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত তোলপাড় করে ফেল্‌বো। * * * আমি ক্রমশঃ ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতি হয়ে আস্‌ছি—যাই ঘটুক না কেন, আমি প্রস্তুত আছি। এইবার যে কাযে লাগা যাবে প্রত্যেক ঘায়ে কায হবে—একটাও বৃথা যাবে না—এই হচ্ছে আমার জীবনের আগামী অধ্যায়। আমার ভালবাসাদি জান্‌বে। ইতি

বিবেকানন্দ।

পুঃ—তোমার বর্ত্তমান ঠিকানা লিখ্‌বে। ইতি

বি—

জীবনসমস্যা ও উহার সমাধান।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

জগতের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা একজন ঈশ্বর আছেন কি না, দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কি না, ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি, আমাদের চরম লক্ষ্য কি—এই সকল বিষয়ের সুমীমাংসা না হইলে চিন্তাশীল জিজ্ঞাসু মানবের জীবনধারণই অসম্ভব হয়। কিন্তু ইহাদের সুমীমাংসা কি সম্ভবপর? কখনও কি মানব ইহাদের নিশ্চিত তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছে অথবা করিতে পারিবে? জগতে কত জ্ঞানী জন্মিলেন, কত গ্রন্থ প্রণীত হইল, কিন্তু বাদ বিবাদ ত মিটিল না। মতমতান্তরে জগৎ আচ্ছন্ন, দার্শনিক ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ে জগৎ ভরা। কোন্‌টী ছাড়িয়া কোন্‌টী ধরিব? সকলেই ত নিজের মত সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে ও পরের মত ভ্রান্ত প্রমাণ করিতে অগ্রসর! যুক্তিতর্ক অবলম্বন করিয়া ত দেখি, কিছুই নির্ণয়

হয় না। যুক্তি সব দিকেই দেওয়া চলে। তুমি যে যুক্তিবলে একটা বিষয় প্রমাণ করিতে যাইতেছ, তাহার ঠিক বিপরীত যুক্তিবলে ঠিক বিপরীত বিষয়টা সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যায়। শাস্ত্রজালে প্রবেশ করিয়া কি সত্য নির্ণয়ের উপায় আছে? শাস্ত্রের নাম শুনিলেই ত আমাদের আতঙ্কের উদয় হয়। কোন্ শাস্ত্র বলিব? হিন্দুশাস্ত্র?—বেদ বেদান্ত দর্শন স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র—সে যে সুবৃহৎ ব্যাপার! চতুর্ব্বেদ,—তার আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদাদি বিভাগ, দর্শন—শুধু ত ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য পাতঞ্জল পূর্ব্ব উত্তর মীমাংসা নয়—মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে আরও কত কত দর্শনের উল্লেখ ও বর্ণনা করিয়াছেন, ঊনবিংশ স্মৃতি, অষ্টাদশ পুরাণ আবার কত উপপুরাণ—অসংখ্য তন্ত্র। এ ছাড়া—শিক্ষা কল্পাদি বেদাঙ্গ, কল্পসূত্র, শ্রৌতসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, গৃহ্যসূত্রাদি—শত শত গ্রন্থ। আবার ইহাদের ভাষ্য, তস্য টীকা, তস্য টিপ্পনী। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য, তস্য টীকা ভামতী, তস্য টীকা কল্পতরু, আবার তার টীকা পরিমল। আবার কোন পণ্ডিত পরিমলেরও বা টীকা করিয়া বসেন!

এ ত হল হিন্দুশাস্ত্র। তার পর হিন্দুসম্প্রদায় আছে কত! স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' পড়িয়া দেখ—কত কত বিচিত্র নানামতাবলম্বী সম্প্রদায়ের পরিচয় পাইবে—তা ছাড়া আধুনিক কালে কত কত নূতন সম্প্রদায় উঠিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এ ছাড়া বৌদ্ধ আছেন, খ্রীষ্টিয়ান আছেন, মুসলমান আছেন, জরথুষ্ট্রমতাবলম্বী আছেন, কুংফুছী আছেন, 'তাও' উপাসক আছেন, ইঁহাদের প্রত্যেকের রাশি রাশি গ্রন্থ, উহাদের টীকা টিপ্পনী প্রভৃতি আছে। কত পড়িবে?

পড়িতে গেলে ভাষার দুর্ভেদ্য দুর্গ অনেক সময় অতিক্রম করা দুঃসাধ্য—তার পর বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের পারিভাষিক শব্দজাল উহাকে আরও দুর্ভেদ্য করিয়াছে—উহাদের ভিতর দন্তস্ফুট করিয়া সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা অনেক সময় বিড়ম্বনা মাত্র।

এই জন্য অনেকে বলেন, শাস্ত্র ছাড়িয়া বরং শিক্ষকের নিকট যাও,

গুরুর নিকট যাও, আচার্য্যের নিকট যাও—তবেই সত্য নির্ণয় হইবে। কিন্তু আমার ন্যায় দুহাত দুপাওয়ালা মানুষ এই সকল গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ করিয়াছে, অনেকেরই এ বিষয়ে বিশ্বাস হওয়া ত কঠিন। তার পর সেরূপ লোক কোথায়? তিব্বতের উচ্চ মালভূমিতে, না, হিমালয়ের গভীর গিরিগহ্বরে? যদি তাহাই হয়, তবে আর তাঁহাদের কাছে জ্ঞান শিক্ষা করিব কিরূপে? লোকালয়ে যদি কেহ থাকেন? কিন্তু কই, সেরূপ ত দেখিতে পাই না। কেহ বলেন, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস কর, কেহ বলেন, আমার কথা বিশ্বাস কর। কিন্তু শাস্ত্রের কথা বা তোমার কথার প্রমাণ কি? তুমি না হয় ধমক দিয়া বলিবে, যদি বিশ্বাস না কর, তোমার ঘোর নরক। কিন্তু নরকই হউক আর যাই হউক, বিশ্বাস না হইলে আর উপায় কি?

যাঁহারা শুধু বিশ্বাস করিতে বলেন বা যাঁহারা কেবল তর্কযুক্তি বিচারে নিযুক্ত ও শিষ্যগণকেও তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, ইঁহাদের হইতে বিভিন্ন আর একদল শিক্ষক আছেন—তাঁহারা বলেন আমরা ঐ সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছি—তোমাদিগকেও উপলব্ধি করিবার পথ দেখাইয়া দিতে পারি। ঐ সকল উপায় অবলম্বনে একদিন তোমরাও আমাদের মত সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন তোমাদিগকে এইটুকু বুঝাইয়া দিতে পারি যে, এই পথ অবলম্বন করিলেই তোমাদের ঐ তত্ত্ব উপলব্ধির সম্ভাবনা। কি উপায়? উপায়—মনের একাগ্রতা সাধন। তুমি ঐ সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিতে পারিতেছ না কেন? কারণ, তুমি মনকে একমুখী, একাগ্র করিতে পার না। মনকে একাগ্র করিবার অভ্যাস করিতে হইবে—তোমাকে আর কোন বিশ্বাস বা কোন কল্পনার আশ্রয় করিতে হইবে না। মনকে স্থির করিয়া সেই মনের সাহায্যে তত্ত্বনির্ণয়ের চেষ্টা কর, তবেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

যদি কখনও আমাদের প্রবন্ধের প্রথমেই উত্থাপিত প্রশ্নগুলির মীমাংসা সম্ভবপর হয়, তবে এই উপায়েই হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

আমাদের মাথায় বালককাল হইতেই কতকগুলি তত্ত্বের বোঝা চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আমরা বাল্যকালে ভূগোল পড়িতে গিয়া এই সকল সিদ্ধান্ত-বাক্য গলাধঃকরণ করি—যথা, পৃথিবী গোল—সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষ গুণ বড়, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে ইত্যাদি। ঐরূপ আমরা যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাই, তাহাতেও কতকগুলি সিদ্ধান্ত গলাধঃকরণ করাইবার চেষ্টা। ইহার ফল বুদ্ধিবৃত্তির অবনতি এবং সমুদয় বিষয়ে ক্রমশঃ অবিশ্বাস। ইহার পরিবর্ত্তে আমাদের জ্ঞানসাধনের যে যন্ত্র—অর্থাৎ মনকে এমন ভাবে তৈয়ারি করিবার চেষ্টা আবশ্যক, যাহাতে সে কি লৌকিক, কি অলৌকিক সমুদয় বিষয়ই নিজের শক্তিতে হৃদয়ঙ্গম ও উপলব্ধি করিতে পারে। নতুবা জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া বৃথা মাত্র।

এখনকার সামান্য বালকে পর্য্যন্ত মুখে 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা' বাক্য আবৃত্তি করিয়া থাকে, কিন্তু উপনিষদাদি গ্রন্থ পড়িয়া আমরা দেখিতে পাই, অত সহজে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ তখনকার কালের ধারা ছিল না। তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখিতে পাই—ভৃগু নিজ পিতা বরুণের নিকট তত্ত্বশিক্ষা করিতে গেলে তিনি তাঁহাকে অতি সংক্ষিপ্ত দুএকটী উপদেশ দিয়া বলিলেন—যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, যাহাতে উহা অবস্থিত আছে ও অন্তে যাহাতে প্রবেশ করিবে, তাহাকে জানিবার চেষ্টা কর। কিরূপে জানিব?—তপস্যা দ্বারা। তপস্যা কি? তপস্যা শব্দটী 'তপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তমোহিমকে সত্ত্বের উত্তাপ সংযোগে গলাইতে হইবে—একাগ্রতাই সেই তপস্যা। যেমন আতসি কাচের সাহায্যে সূর্য্যকিরণকে একত্রিত করিয়া তাহা দ্বারা যে কোন বস্তুকে দগ্ধ করা যাইতে পারে, তদ্রূপ মন বিক্ষিপ্ত বলিয়া তাহার জ্ঞানশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে—একাগ্রতা সাধনসহায়ে উহাকে সূক্ষ্মজ্ঞান-সাধনার যন্ত্রস্বরূপ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, ভৃগু এই একাগ্রতারূপ তপস্যা দ্বারা ক্রমে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও সর্ব্বশেষে আনন্দকে জগতের মূলতত্ত্বরূপে অবগত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিলেন।

ছান্দোগ্যের ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদেও এইরূপ দেখিতে পাই—আচার্য্যের উপদেশ অতি অল্প, একরূপ সাঙ্কেতিক বাক্যমাত্র—কিন্তু জিজ্ঞাসুর মনের পর্দা যেমন যেমন খুলিয়া যাইতেছে, তেমনি তেমনি সে উচ্চ হইতে উচ্চতর তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতেছে।

অতএব বুঝিতে হইবে, আমরা যেমন এই জগৎকে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি বলিয়া ইহার সত্যতায় কোন সংশয় করি না, ঈশ্বর-তত্ত্ব, আত্ম-তত্ত্ব প্রভৃতিও যদি তদ্রূপ নিঃসংশয় প্রত্যক্ষ হয়, তবেই সেই গুলির উপর যথার্থ আস্থা স্থাপন করা হইতে পারে, অন্যথা নহে। শাস্ত্র, যুক্তি আদি গৌণ—এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মুখ্য।

যদি কেহ বলে, এরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভবপর নহে, তবে আন্দাজের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসাধনা বালির উপর সেতুনির্ম্মাণের ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়। যাহারা ধর্ম্মের একটা নিশ্চিত ভিত্তি পাইতে চায়, তাহাদিগকে এই প্রত্যক্ষানুভূতির সম্ভবনীয়তা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রকৃত পক্ষে সকল ধর্ম্মই এরূপ প্রত্যক্ষানুভূতির দাবি করিয়া থাকে। হিন্দুরা বলেন, ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা বা যথাবিহিতসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, বৌদ্ধেরা বলেন, বুদ্ধ কঠোর সাধনার পর সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। এইরূপ যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদেরও শুনা যায়। কিন্তু ইঁহারা ত সাক্ষাৎকার করিলেন কিন্তু পরবর্ত্তী লোককে ইঁহাদের কথা মানিয়া চলিতে হইবে! অনেকেরই মত দেখা যায়, ঋষি যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, নূতন ঋষি আর হইবার সম্ভাবনা নাই! ঈশ্বরের অবতার একমাত্র যীশুখ্রীষ্ট—সুতরাং তাঁহার কথা মানা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই! এইরূপ মত যেমন একদিকের চূড়ান্ত গোঁড়ামত, অপর দিকের গোঁড়ামত তেমনি যে, ধর্ম্ম সাক্ষাৎকারের কোন সম্ভাবনা নাই। সত্য এইটিই বোধ হয় যে, প্রাচীন কালে অনেকে সত্য সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, এখনও অনেকে করিতেছেন এবং আমরাও ইঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিলে একদিন সত্য সাক্ষাৎকার করিতে পারি।

যতদিন না এইরূপ প্রত্যক্ষ নিজে করিতে পারিতেছি, ততদিন

কি করিব? ততদিন তর্কযুক্তি-পরিশোধিত বিশ্বাস ও শাস্ত্র অবলম্বন ব্যতীত আর উপায় কি? যাঁহারা সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহারা যে সর্ব্বদাই সরল সহজ সিধা পথেই ঐ দিকে অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাহার নিশ্চয় কি? কেহ কেহ হয়ত পারেন, কিন্তু যদি নানারূপ ভুল ভ্রান্তির ভিতর দিয়া, নানারূপ গোলমালের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, তাহার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কেবল এইটুকু দেখিতে হইবে যে, ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া, অকপট ভাবে, মনমুখ এক করিয়া যেন আমরা নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হই।

মানুষের যেমন জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক, তেমনি তাহার সুখ-লাভের আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক—জ্ঞানলাভের উপায় যেমন একাগ্রতা, সুখলাভের উপায়ও তদ্রূপ সংযম, তাহাতে কি কিছু সন্দেহ থাকিতে পারে? নিত্য সুখ আছে কি না এই সম্বন্ধেও নিঃসংশয় হইতে গেলে পূর্ব্বোক্ত মত সাধনার প্রয়োজন, কিন্তু এটী নিশ্চিত যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ প্রাণ কিছুতেই মানিতেছে না। এই আনন্দ ও জ্ঞান—নিত্য আনন্দ ও নিত্য জ্ঞান আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য—এ বিষয় নিঃসন্দেহ। আর অনেক প্রাচীন ও আধুনিক ব্যক্তি যখন আমাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, তোমাদের ভিতর ঐ নিত্য জ্ঞান ও আনন্দের খনি রহিয়াছে, তোমরা আমাদের প্রদর্শিত একাগ্রতা সাধনের উপায় অবলম্বন করিয়া গন্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর, তখন আমরা কেন না তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিব ও কেন না তাঁহাদের পথের অনুসরণ করিব?

অনেকে বলেন, বিশ্বাস কর, 'বিশ্বাসে মিলিবে বস্তু, তর্কে বহুদূর', আর এইরূপ সকলেই যদি নিজে নিজে বিচার করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয়ে অগ্রসর হয়, তবে প্রত্যেকে বিভিন্ন মতে উপস্থিত হইয়া সমাজে একরূপ বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিবে, অতএব অবিচারিত-চিত্তে একজনের কথায় বা একটা শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস করিলেই লোকের বেশী কল্যাণ। এ যে তমোগুণ আশ্রয়ের উপদেশ।

যখন আমার ভিতর বিচার শক্তি—ভাল-মন্দ বুঝিবার শক্তি রহিয়াছে, তখন আমি উহা ত্যাগ করিব কেন? তর্ক যুক্তি বিচার দ্বারা সমাজে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করে না, বরং উহাতে বিশ্বাসের ভিত্তি আরও দৃঢ় হইয়া থাকে—শাস্ত্রেই আছে, গুরুকে বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। তাঁহার সঙ্গ করিয়া তাঁহার সমুদয় ব্যবহার তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিয়া যদি দেখা যায়, তাঁহার কোন স্বার্থ নাই, লৌকিক কোন বিষয়ে আমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা নাই, তবে তাঁহার উপর কেন না বিশ্বাস হইবে? যদি তিনি বলেন, আমি কোন অলৌকিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছি আর তুমিও যদি এই এই উপায় অবলম্বন কর, তবে তুমিও সাক্ষাৎকার করিবে, তবে কেন না তাঁহার কথায় অন্ততঃ পরীক্ষা স্বরূপে আমি সেই সাধনায় অগ্রসর হইব?

তর্ক বিচার দুই উদ্দেশ্যে করিতে পারা যায়, এক নিজে বুঝিবার জন্য, দ্বিতীয়—অপরকে বুঝাইবার জন্য। ন্যায়শাস্ত্রকারেরা চরমোদ্দেশ্য লাভের জন্য এই উভয় প্রকার তর্কের প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করিয়া থাকেন। নিজে বুঝিবার জন্য যে বিচার, উহাই মুখ্য; কিন্তু তোমাকে যদি এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করিতে হয়, যাহা তোমার প্রতিকূল, তবে তোমাকে বাধ্য হইয়াই কতকটা পরপক্ষ-নিরাসের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, নতুবা তোমার টেঁকা অসম্ভব হইবে। ন্যায়শাস্ত্রকারেরা বলেন, এই কারণেই ন্যায়শাস্ত্র রচিত হইয়াছে—যাহাতে আমাদের চিন্তাপ্রণালী ও বিচারপ্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। যাহা হউক, আমরা ইঁহাদের কথা আংশিক স্বীকার করিলেও একথা কখনই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই যে, এই মনন প্রণালী আয়ত্ত করিবার জন্য সকলের পক্ষেই পরিভাষাবহুল ন্যায়শাস্ত্র—বিশেষ নব্যন্যায় আয়ত্ত করা আবশ্যক। ইহাতে অধিকাংশ সময়েই মূল লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শব্দজালরূপ মহারণ্যে চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া থাকে। এই তর্ক বিচার করিবার সময় সত্য-নিরূপণের দিকেই যেন আমাদের লক্ষ্য থাকে—আমরা যেন লক্ষ্যকে ভুলিয়া অবান্তর

গোলযোগের ভিতর না গিয়া পড়ি। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করিয়াছেন, এই যুক্তিতর্ক আমাদের অনেকটা পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের মুখ্য উপায়স্বরূপ একাগ্রতা সাধনেই প্রবৃত্ত করে।

এই ধ্যান অভ্যাস করিতে হইলে প্রথম চাই অধিকক্ষণ এক ভাবে বসিয়া থাকিবার অভ্যাস—বেদান্তসূত্রে সেই জন্যই বলিয়াছেন, "আসীনঃ সম্ভবাৎ।" অর্থাৎ ধ্যানাভ্যাস বসিয়াই করিতে হইবে, কারণ, বসিয়াই উহা সম্ভব হয়। শয়ন করিয়া অথবা বেড়াইতে বেড়াইতে উহার চেষ্টা করিলে নিদ্রা চিত্তবিক্ষেপাদি নানা বিঘ্ন আসিয়া ঐ অভ্যাসে প্রবল বাধা উৎপাদন করিবে।

সুতরাং আসন করিয়া বসিয়া কোন একটী বিষয় ক্রমাগত চিন্তার অভ্যাস করিতে হইবে। এই ধ্যানযোগের প্রণালী উপায়াদি গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। বর্ত্তমান দেশকালের পক্ষে সাধারণতঃ কোন উন্নত মহাপুরুষের উপদিষ্ট সিদ্ধ মন্ত্র অবলম্বন করিয়া ধ্যানাভ্যাসের চেষ্টা আশু ফলপ্রদ। যদি আমার অদৃষ্টে তদ্রূপ সদ্‌গুরুর আশ্রয় না মিলে, তবে আমাদের সমাজের সাধারণ নিয়মানুসারে কুলগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া দৃঢ়ভাবে উহার সাধনা করিলে তাহাও নিষ্ফল নহে। মোট কথা, এই অভ্যাস সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শনে যে উপদেশ আছে,

"স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।"

তাহাই খাঁটি কথা। এই অভ্যাস অশ্রদ্ধার সহিত বেগার ঠেলা ভাবে করিলে হইবে না, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অধিকাংশ সময় নিদ্রা ও চিত্তবিক্ষেপকর নানা সদসৎ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সকাল সন্ধ্যায় একটু নিয়ম রক্ষার মত বসিলেও হইবে না, আবার দু চার মাস এরূপ অভ্যাস করিয়া ছাড়িয়া দিলেও হইবে না। উৎসাহের সহিত দীর্ঘ কাল ধরিয়া ইহাতে নিযুক্ত থাকিতে হইবে—তবেই সিদ্ধি একদিন—এমন কি এই জীবনেই একদিন—করতলগতা হইবে।

কিন্তু তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য এইরূপ ধ্যানাভ্যাস যদি ঠিক ঠিক

ভাবে করিয়া কৃতকার্য্যতার আশা করিতে হয়, তবে সমগ্র জীবনটাকে উহার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। জীবনকে এইরূপে প্রস্তুত করার নামই কর্মযোগ। কর্ম্মগুলিকে এরূপ নিয়মিত করিতে হইবে যেন সেগুলি পরিণামে এই ধ্যানযোগের সহায়ক হয়। সাধুসঙ্গ, উপনিষদ্ গীতা ভাগবতাদি সিদ্ধান্তশাস্ত্রচর্চ্চা, পূজা, সেবা, সৎকর্ম্মাদি ইহার অনুকূল। এইগুলি ইহার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান করিয়া ক্রমে ধীরে ধীরে ধ্যানের সময় বৃদ্ধি করিতে হইবে। সদা সর্ব্বদা মনে বিচার রাখিতে হইবে, আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি। সেইটী যদি অন্ততঃ মধ্যে মধ্যেও মনে পড়ে, তবে আমাদের জীবন কখনই উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিবে না। আমরা সকলেই অল্পবিস্তর কর্ম্ম করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য স্থির থাকে না বলিয়া আমাদের শক্তি অনেক সময়ে বৃথা অপচিত হয়। এই শক্তিক্ষয় নিবারণের জন্য জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তদনুসারে কর্ম্মগুলিকে সুনিয়মিত করিতে হইবে।

কেহ কেহ আশঙ্কা করেন, তত্ত্বসাক্ষাৎকার এবং তদুপায় স্বরূপ ধ্যান ধারণাই যদি জীবনের মুখ্য কার্য্য বলিয়া ধারণা হয়, তবে জড়তা ও আলস্য আমাদিগকে প্রবলভাবে আশ্রয় করিবে এবং আমরা এখন যেমন হইয়াছি, ক্রমে সম্পূর্ণ হতশ্রী ও হতবীর্য্য হইয়া পড়িব। কিন্তু এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। মূল লক্ষ্য উহা হইলেও আমাদিগকে অধিকারভেদ স্বীকার করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে—শুদ্ধ সত্ত্বগুণসাধ্য ধ্যানধারণা তমোগুণী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। তমোগুণকে প্রবল রজোগুণের দ্বারা প্রতিহত করিতে না পারিলে এবং ঐ রজোগুণকে ক্রমে সত্ত্বমুখী না করিতে পারিলে কখনও ধ্যানধারণা হইতেই পারে না। রজোগুণের লক্ষণ কর্ম্মশীলতা। কর্ম্মশীলতা ব্যতীত কেহ কখনও নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থার কল্পনাও করিতে পারে না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার স্থান নাই। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ও স্বামিজীর 'কর্ম্ম-যোগ' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে প্রায় সমুদয় আশঙ্কার সমাধান করা হইয়াছে।

হিন্দুর বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে ধর্ম্মসাধনার উদ্দেশ্য ইহাই। হিন্দুর চরমোদ্দেশ্য মুক্তি হইলেও সাধকের পক্ষে—উক্তপথযাত্রী অধিকারীর পক্ষে—উহাতে প্রবল কর্ম্মশীলতার স্থান আছে। কিন্তু কর্ম্মই আমাদের চরম লক্ষ্য নহে—জীবন সমস্যার সমাধানই যদি না হইল, তবে উন্মত্তবৎ কর্ম্মচেষ্টার কি ফল? যাঁহারা এই সমস্যা সমাধানে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, যাঁহারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, ভগবদিচ্ছায় তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার যন্ত্র-স্বরূপ হইয়া তাঁহার লীলার সহায়ক হইয়া জগতে প্রবল সাত্ত্বিক কর্ম্মের উদ্দীপনার যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারেন, কিন্তু অপর সকলকেই এই তত্ত্বসাক্ষাৎকারের জন্য প্রাণ পণ করিতে হইবে এবং জানিতে হইবে, উহার মুখ্য বা অন্তরঙ্গ সাধনা—ধ্যানধারণা ও বহিরঙ্গ বা গৌণসাধনা—কর্ম্ম। অধিকারিবিশেষে বাহুল্যভাবে কাহাকেও কাহাকেও কর্ম্ম, কাহাকেও কাহাকেও বা ধ্যানাদি অনুষ্ঠান করিতে হইবে মাত্র, কিন্তু চেষ্টা সকলেরই থাকিবে ধ্যানধারণা ও তল্লক্ষ্যীভূত তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দিকে।

আমরা এই প্রবন্ধে তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ মূল লক্ষ্যের দিকে একটু বেশী ঝোঁক দিয়াছি বলিয়া কেহ যেন অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে প্রথমাবস্থায় অনিবার্য্য কর্ম্মযোগ বা সেবাধর্ম্মকে আমরা খর্ব্ব করিয়াছি বলিয়া মনে না করেন। আমি যতদিন কোন না কোন আকারে অপরের সেবা লইতেছি, ততদিন আমাকেও রোগীর শুশ্রূষা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নবস্ত্রদান, অশিক্ষিতের ভিতর শিক্ষাবিস্তার, নানারূপ সামাজিক সমস্যার সমাধান প্রভৃতি উপায় দ্বারা সতত নরনারায়ণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু এই কর্ম্ম যেন আমরা যন্ত্রের ন্যায় না করি। কর্ম্মাবসরে আমাদিগকে কিছু কিছু ভাবনাশীল হইতে হইবে কর্ম্মের মূল লক্ষ্য কি, মাঝে মাঝে স্মরণ করিতে হইবে আর মুখে 'নরনারায়ণ' শব্দ কেবল উচ্চারণ না করিয়া যাহাতে আমরা পতিত, দরিদ্র, রোগক্লিষ্ট নরনারীর ভিতর বাস্তবিকই নারায়ণকে দেখিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই কর্ম্মযোগ হইবে। নতুবা উহা যোগ নহে—শুধুই কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে। উহাতেও ফল

আছে। কিন্তু হে অমৃতের সন্তানগণ, তোমরা কি এতটুকু করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে? একাগ্রতা ও ধ্যানধারণার সহায়ে আত্মার ভিতর গূঢ়ভাবে নিহিত অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দকে অভিব্যক্ত করিয়া অপরের ভিতরও তাহার অভিব্যক্তির চেষ্টারূপ উচ্চতর সেবায় দীক্ষিত হইবে না?—কর্ম্মযোগের উচ্চ উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া শেষে ধ্যানযোগের অধিকারী হইয়া উপলব্ধি করিবে না—

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং॥

শঙ্করের জন্ম।

(শ্রীমতী—)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে শিবগুরুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অজ্ঞাননিদ্রাও ভঙ্গ হইল। তিনি চারিদিকেই যেন শিবমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। সকলই যেন শিবময়—সকলই যেন শিবেরই শরীর। সেই শেষ যামিনীর মধুর সমীরণ, সেই অসীম অন্তরীক্ষব্যাপী অরুণকিরণসমুজ্জ্বল মেঘমালা, পর্ব্বত, কানন, চত্বর, দেবমন্দির সকলই যেন শিবের শরীর। শিবগুরু যেন আর সে শিবগুরু নাই, তিনি যেন এখন অন্য ব্যক্তি। ইহা স্বপ্নে প্রকৃত দেবতার দর্শন, ইহা ত সাধারণ স্বপ্নদর্শন নহে। মনঃকল্পিত দেবদর্শন এবং প্রকৃত দেবদর্শনে অনেক প্রভেদ। তাই শিবগুরু আজ সকলই শিবময় দেখিতেছেন। ক্রমে তিনি যেন আর শুধু দেখিয়াই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, তাই জোড়হস্তে জলদগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে

নমঃ, ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ"।

সহসা বিশিষ্টাদেবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শয্যোপরি শিবগুরুকে ঐ ভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

বিশিষ্টাদেবীকে জাগরিত দেখিয়া শিবগুরু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আর্য্যে। চল গৃহে চল, ভগবান্ প্রসন্ন হইয়াছেন। আমরা তাঁহার কৃপায় তাঁহাকেই পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলাম, চল গৃহে চল। আজ আমরা ধন্য হইলাম। বল একবার জয় আশুতোষের জয়, জয় ভগবান্ জ্যোতির্লিঙ্গের জয়"।

শিবগুরুর কথা শুনিয়া বিশিষ্টাদেবী পাগলিনীপ্রায় হইয়া স্বপ্নকথা জানিতে চাহিলেন। শিবগুরু তখন একে একে সমুদয় বলিলেন, কিন্তু পুত্র যে অল্পায়ু হইবেন কেবল তাহাই গোপন রাখিলেন।

স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া বিশিষ্টাদেবী কিয়ৎক্ষণ যেন স্তম্ভিতের ন্যায় হইয়া রহিলেন। তাঁহারও অবস্থা যেন কতকটা শিবগুরুর মত হইয়া পড়িল। তিনি করযোড়ে কখন ভগবান্ শিবের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিতে লাগিলেন, কখন বা শিব শিব বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, আবার কখন বা আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতে থাকিল।

বাস্তবিক তাঁহাদের আনন্দ কি আজ বর্ণনা করা যায়? পুত্রাকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা কত না কষ্ট করিয়াছিলেন, আজি সেই সকল কষ্টের অবসান—জীবনব্যাপী পুত্রকামনা, আজ তাহাই আশুতোষ-কৃপায় সিদ্ধ হইতে চলিল। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা তাঁহাকেই পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছেন। ইহা কি স্বপ্নাতীত, আশাতীত অভাবনীয় ঘটনা নহে?

বিশিষ্টাদেবী ও শিবগুরুর এ ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, প্রভাতালোক তাঁহাদের এই ভাবাশ্রুতে বাধা প্রদান করিল। বিশিষ্টাদেবী বলিলেন, "দেব! আজি আমাদের সম্বৎসরের তপস্যা সার্থক হইল, আজি আমাদের অতি শুভদিন। যাঁহার কৃপায় আমাদের এই ভাগ্যোদয় আজি আমরা তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা করিব এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণসজ্জনকে যথাসাধ্য দান করিব।"

বিশিষ্টার কথা শেষ হইতে না হইতেই শিবগুরু বলিলেন, "আর্য্যে! আমিও এক্ষণে ইহাই ভাবিতেছি। শিবগুরু এই বলিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দেবমন্দিরের রাজপুরোহিতকে আহ্বান করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাত্মন্! আজ আমরা কিঞ্চিৎ বিশেষভাবে ভগবানের পূজা করিব মনে করিতেছি, সম্বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে আমরা অদ্য গৃহে ফিরিব ভাবিতেছি। আপনি পরিচিত কতকগুলি ব্রাহ্মণ সজ্জনকে আনয়ন করুন। আমরা পূজান্তে তাঁহাদের যথাসাধ্য সৎকার করিব"।

শিবগুরুকে প্রফুল্ল দেখিয়া পুরোহিত বুঝিলেন যে তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে; নচেৎ, প্রভাতেই এ ব্যবস্থা কেন? তিনি শিবগুরুকে বিশেষ কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া শিবমাহাত্ম্য স্মরণপূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং অনুচরদিগকে পূজার আয়োজন করিতে বলিয়া দিলেন।

এইরূপে পূজা, পাঠ, হোম, জপ, এবং দানধ্যানে সে দিবস অতিবাহিত করিয়া পরদিন তাঁহারা স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শিবগুরু সম্বৎসর পরে স্বগৃহে আসিয়াছেন শুনিয়া আত্মীয়জন ও বন্ধুবান্ধব অনেকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শিবগুরু যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন।

এ দিকে অন্তঃপুরে বিশিষ্টাদেবীর সকাশে বহু মহিলা সমাগম। যেন বাটীতে কোনও ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত। মহিলাগণ মধ্যে

সধবা, বিধবা, যুবতী, কুমারী, বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া কাহারও অভাব নাই। বিধবা রমণীদের ললাটে ত্রিপুণ্ড্র রেখা, গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা, মস্তকের কেশ চূড়াকারে বদ্ধ। রমণীরা কেহ বা দণ্ডায়মানা, কেহ উপবিষ্টা, কেহ বা শিশু ক্রোড়ে, কেহ বা রোদনরত শিশুকে স্তন্য দিতেছেন, আবার কেহ নিদ্রিত শিশুকে বস্ত্রাঞ্চলে শয়ান করাইয়া নিজেও শিশুর পার্শ্বে অর্দ্ধশয়ানা।

ভামিনীরা এক কথায় তুষ্ট হইবার পাত্র নহেন। তাঁহারা নানা জনে নানা প্রশ্নোত্তরে গৃহ মুখরিত করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "হ্যাঁ ভাই বিশিষ্টা, এতদিন তীর্থস্থানে ছিলে, সেখানে কি কিছু ঠাকুরের আদেশ পাইলে?" বিশিষ্টার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই অপরে কহিলেন, "হ্যাঁ বাছা, দেবতার স্থানে ত সাধু সন্ন্যাসীর অভাব নাই, কোনও ওষুধ বিষুধ কি পেলে না?" তদুত্তরে কেহ বলিলেন, "তা দিদি সেই কপালই যদি হবে তবে ছেলে ছেলে করে এত কষ্ট পায়।" আবার কেহ বলিলেন, "আচ্ছা বিশিষ্টা ঠাকরুণ, স্বপ্ন টপ্ন কিছু পাও নি কি? তাও ত হয়, আমার অমুক স্বপ্নে একেবারে সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছিল, আহা"— বলিয়া তিনি করযোড়ে দেবতার উদ্দেশে প্রণিপাত করিলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী রমণীকে কহিলেন, "তোমার সে কথা মনে পড়ে দিদি?" দিদি তখন সাহ্লাদে কহিলেন, "তা আর মনে নেই বোন, আমারও ত মেয়ের স্বপ্ন হয়েছিল।" ইত্যাদিরূপে যিনি দেবতার স্থান হইতে যেরূপে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, পরস্পরে তাহারই ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; ফলে বিশিষ্টাদেবীরও প্রকৃত কথা প্রকাশ না করিবার জন্য বিশেষ কোনও কষ্ট পাইতে হইল না। তিনি কাহাকেও মাতৃ সম্বোধনে, কাহাকেও বা বাছা, কাহাকেও দিদি, বোন ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে সুমিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন—অভীষ্টসিদ্ধের কথা কাহাকেও বলিলেন না।

সম্বৎসর গৃহে না থাকাতে বিশিষ্টাদেবীর গৃহগুলি বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। কয়েকদিবস পরে তাঁহার গৃহসংসারের সুশৃঙ্খলা স্থাপিত

হইলে, একদিন শিবগুরু বিশিষ্টাদেবীকে বলিলেন, "আর্য্যে! স্বপ্নকথা স্মরণ আছে ত? এ সময় আমাদের অতি পবিত্রভাবে থাকা একান্ত প্রয়োজন। আহার বিহারাদি সকল কর্ম্ম সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোক যেরূপ অনুধ্যান করিবে সন্তানও তদ্রূপ হইবে। পুত্র হইতেই মানুষের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারা যায়, পুত্র দেখিয়াই লোকে পিতামাতার পাপপুণ্যের নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যে ভাবে যে বস্তুর চিন্তায় সময়ক্ষেপ করিবে, পুত্রও সেই ভাবে সেইরূপে গঠিত হইবে। তুমি এ সময় সর্ব্বদা দেবভাবাপন্ন হইয়া না থাকিলে ভগবান্ তোমার গর্ভে কি করিয়া আসিবেন? তুমি যদি এ সময় সর্ব্বদা শিবের ধ্যানে শিবমহিমা চিন্তায় চিত্তকে নিয়োজিত রাখ, তবে তোমার পুত্র ত সাক্ষাৎ শিবই হইবেন। তুমি যদি এ সময় সর্ব্ববিধ দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধাদি নীচপ্রবৃত্তি প্রভৃতি সমূলে পরিত্যাগ করিয়া জীবের কল্যাণকামনায়, সকলের হিতচিন্তায় এবং জগতের দুঃখনাশের চিন্তায় একান্ত নিরত থাক তবেই শিব তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। অবশ্য তিনি যখন স্বপ্ন দিয়াছেন তখন তুমিও তাহাই করিবে এবং তিনিও আসিবেন ইহা আমার বিশ্বাস। তথাপি তোমায় স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। অথবা তিনিই আমায় তোমাকে এই সমস্ত বলিতে প্রবৃত্ত করাইতেছেন। অতএব আমরা এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অনুসারে তদনুমোদিত আচারের অনুষ্ঠান করিব"। পতিব্রতা বিশিষ্টাদেবীকে এ সব কথা বলাই বাহুল্য। তিনি পতির সেই স্বপ্নপ্রদর্শনের দিন হইতেই আর যেন ইহজগতের রমণী ছিলেন না। বিধাতাই তাঁহাকে অজ্ঞাতসারে শঙ্কর-জননীর উপযোগিনী করিয়া তুলিতেছেন। দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণরাশি স্বভাবতঃই বিশিষ্টাদেবীতে পূর্ণমাত্রায় ছিল, এক্ষণে তাহা যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

লীলাময়ের অসীম লীলায় কিছুই অসম্ভব নহে। প্রৌঢ়া

বিশিষ্টাদেবীর দিনে দিনে যেন আবার যৌবন ফিরিয়া আসিল এবং অচিরে তাঁহার দেহে গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল।

তুই তিন মাস অতীত হইতে না হইতেই পল্লীরমণীরা বিশিষ্টা-দেবীকে গর্ভবতী বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাঁহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তখন সকলেই বুঝিলেন যে ইহা বাবা জ্যোতির্লিঙ্গের মাহমা।

ক্রমে ইহা শিবগুরুর কর্ণগোচর হইল। তিনি তৃতীয়মাসে অতি সাবধানে পুংসবন সংস্কার সম্পন্ন করিলেন এবং এখন হইতে পুত্রজন্ম পর্য্যন্ত শিবনামজপরূপ ব্রতগ্রহণ করিলেন। বিশিষ্টাদেবীও নিশ্চিন্ত থাকিলেন না, তিনিও পতির অনুগমন করিতে লাগিলেন। শিবগুরুর সংসার যেন কৈলাসবাসী নন্দীর সংসার হইয়া উঠিল।

বিশিষ্টাদেবীর গৃহে আত্মীয়া স্ত্রীলোক কেহ না থাকায় পল্লীরমণীরা তাঁহাকে যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন। কোন রমণী বা স্বহস্তপ্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য অতি যত্নসহকারে বিশিষ্টাদেবীর জন্য আনয়ন করিতেন।

এইরূপে চতুর্থ মাসে শিবগুরু বিশিষ্টাদেবীর সীমন্তোন্নয়ন এবং পঞ্চমে পঞ্চামৃত সংস্কার করিলেন। বিশিষ্টার বন্ধুগণ দেশীয় রীতি অনুসারে বিশিষ্টাদেবীকে বহু সদনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার আত্মীয় জনের অভাবে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটী হইল না।

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল, বিশিষ্টাদেবীর দেহে অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত হইল। তাঁহার প্রফুটিত কমলের ন্যায় মুখশ্রী, দেহে দিব্য জ্যোতি, সর্ব্বাঙ্গে যেন পদ্মগন্ধ সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট করিত। বিশিষ্টাদেবীকে যেই দেখিত সেই যেন ক্ষণকালের জন্য কেমন একটা শান্তি, আনন্দ ও চিত্তপ্রসাদ অনুভব করিত। হৃদয়ের দ্বেষ, হিংসা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দূর হইয়া মনে যেন এক মহান্ ভাবের উদয় হইত। প্রতিবেশিনীরা পরস্পরে বলিতেন, ব্রাহ্মণীর গর্ভে নিশ্চয়ই কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে; নচেৎ বিশিষ্টার ত কই এরূপ পরিবর্ত্তন কখন দেখি নাই।

ক্রমে নবম মাস উত্তীর্ণ হইয়া দশম মাস সমাগত হইল। রমণীরা এক্ষণে সর্ব্বদাই একটী নব শিশুর আগমন প্রতীক্ষায় উৎসুক হইলেন। শিশুর সম্বর্দ্ধনার জন্য যেন সকলেই ব্যাকুল। তাঁহারা গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন ঐ বুঝি শিবগুরুর গৃহ হইতে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

বৈশাখ মাস। বসন্ত অবসান। বসন্ত অবসান হইলেও বসন্তের স্বভাবসৌন্দর্য্য এখনও কালাতিগ্রাম হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এখনও রুদ্রের রৌদ্রতেজ গ্রামবাসীকে তাপিত করিতে পারে নাই। মলয় সমীরণ এখনও হিল্লোল তুলিয়া পল্লীবাসীকে ঋতুরাজের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বসন্তসখা কোকিল এখনও নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া পঞ্চম তানে গ্রামবাসীকে মুগ্ধ করিতেছে। নবকিশলয়ে সজ্জিত পুষ্পপাদপ পুষ্পসম্ভারে আনতদেহ হইয়া রহিয়াছে। অলিকুল গুণ গুণ রবে পুষ্পমধু আহরণ করিতেছে। চ্যূত মুকুলের সুগন্ধে বৃক্ষতল আমোদিত। পল্লীপ্রান্তবাহিনী চূর্ণানদী যেন গ্রীষ্মের আগমনভয়ে ভীত হইয়াই শীর্ণকায়ে মন্দ গমনে প্রবাহিতা।

আজি অক্ষয় তৃতীয়া। অনেকেরই বাটীতে ব্রত নিয়ম পুণ্যাহ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে। সকলেই আজ নানা কার্য্যে সমধিক ব্যস্ত, পুণ্য দিনে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আজ সকলেরই চিত্ত যেন প্রফুল্লিত, সকলেরই হাস্যবদন, কোথাও বিবাদ কলহ নাই, অশান্তি নাই, যেন সকলেরই চিত্তে শান্তি বিরাজিত। নিরানন্দ মনঃকষ্ট ক্রোধ হিংসা সেদিন যেন জগৎ হইতে অন্তর্হিত। প্রকৃতির মাধুর্য্যে সকলেই যেন বিমোহিত। সকলেরই মনে হইতেছে যেন আজ কত সুখের কত শান্তির দিন।

দিবা দ্বিপ্রহর। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। পল্লীপথ প্রায় নির্জ্জন। জনহীন পল্লীপথে কচিৎ দুই একটী পথিক, ভিক্ষুক, স্নানার্থী, অথবা বিষ্ণুপূজান্তে যজমানগৃহ হইতে প্রত্যাগত পুরোহিত সোপকরণ নৈবেদ্যাদি হস্তে দ্রুতবেগে স্বগৃহে গমন

করিতেছেন। পথিপার্শ্বে অবস্থিত বৃক্ষচ্ছায়ায় রোমন্থনরত সবৎস ধেনু। কোথাও আম্রবৃক্ষতলে দুই একটী বালক আম্রমুকুল সংগ্রহে ব্যস্ত। কোথাও গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষার্থী বুভুক্ষিত কুকুর ও মার্জ্জারকুল আহার্য্যচেষ্টায় গৃহস্থের অঙ্গণে সাগ্রহদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

এমন সময় সহসা শিবগুরুর গৃহস্থিত পরিচারিকাগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল। গৃহকর্ম্মরত প্রতিবেশিনী রমণীগণ এই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে শশব্যস্তে শিবগুরুর গৃহাভিমুখে ধাবিতা হইলেন, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাদের পুত্রকন্যারাও ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, কোনও শিশু গমনে অক্ষম হইয়া সরোদনে মাতাকে আহ্বান করিতে লাগিল—মাতা ততক্ষণে শিবগুরুর গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত, সুতরাং শিশুর রোদনই সার হইল।

সহরে কেহ কাহার সংবাদ বড় রাখে না, কিন্তু পল্লীগ্রামে স্থানের অল্পতাপ্রযুক্ত সকলেই সকলের সংবাদ রাখে; এজন্য পরস্পরে সদ্ভাবও যথেষ্ট থাকে। তাই আজ শিবগুরুর পুত্রভূমিষ্ঠের সংবাদ অচিরে সারাগ্রামে প্রচারিত হইল।

দেখিতে দেখিতে শিবগুরুর গৃহে অনেক লোকের সমাগম হইল। বিশিষ্টাদেবীর সন্তান দর্শনের আশায় রমণীরা সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন। সকলেরই ইচ্ছা সর্ব্বাগ্রে তিনিই নবকুমার দর্শন করিবেন।

ক্রমে একে একে সকলে বিশিষ্টাদেবীর নব কুমারকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিলেন। শিশুর রূপে সূতিকাগৃহ যেন আলোকিত হইয়াছে। কেহ কেহ বিশিষ্টাদেবীর পুত্র-ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কেহ বা সানন্দে শিশুর দীর্ঘায়ু কামনা করিলেন। আবার কেহ বা এ সময় বিদ্যাধরদম্পতীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বিশিষ্টাদেবীর আনন্দের কথা আজ কে বর্ণন করিবে? তিনি পুত্রকে যেন আর পুত্র বলিয়া ভাবিতে পারিতেছেন না, তিনি যেন

সেই সাক্ষাৎ আশুতোষকেই দর্শন করিতেছেন। পূর্ব্ব জন্মের কোন্ সুকৃতিবলে তিনি আজ সাক্ষাৎ শুভঙ্করজননী। কত শত যুগের মহা তপস্যার ফলে তিনি আজ ভগবান্ শঙ্করকে বক্ষে পাইয়াছেন, এ সৌভাগ্য যে তাঁহার অপ্রত্যাশিত।

তিনি ভক্তি ও আনন্দের আবেগে শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া দুনয়নে শতধারা প্রবাহিত করিতেছেন। তিনি যেন তন্ময়চিত্তে সেই শঙ্করকেই অনুধ্যান করিতেছেন।

অন্তঃপুরে যেমন আনন্দ কোলাহল, বহির্দ্দেশেও তেমনি শিবগুরুর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রাতিবেশীবর্গ আসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শিবগুরু সকলকে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক একান্তমনে সেই ভগবান্ শঙ্করকেই স্মরণ করিতে লাগিলেন। শঙ্করের অপূর্ব্বলীলা স্মরণ করিয়া ভক্তিসাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

শিবগুরুর ভবনে সে দিন সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব চলিল। রমণীরা যেন আর নব কুমারটীকে ফেলিয়া স্বগৃহে ফিরিতে পারিতেছেন না। শিশুর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সূতিকাগৃহ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। হইবে নাই বা কেন? এ শিশু ত সাধারণ শিশু নয় এ যে সাক্ষাৎ শঙ্কর। তাই আজ সমস্ত পল্লীতে এত আনন্দের ঘটা—যেন এই শিশুর জন্মগ্রহণে শুধু শিবগুরুরই বংশরক্ষা হইল না, সকলের কুলরক্ষা, বংশরক্ষা হইল।

অতঃপর শিবগুরু জ্যোতির্ব্বিদগণকে আনাইয়া পুত্রের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করাইলেন। জ্যোতির্ব্বিদগণ গ্রহসংস্থান দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন শিশুর জন্ম কর্কট লগ্নে, বৃহস্পতি প্রায় স্বচ্যস্থ, দ্বিতীয়ে মঙ্গল ও কেতু, চতুর্থে শনি উচ্যস্থ, অষ্টমে রাহু, দশমে রবি বুধ শুক্র এবং একাদশে চন্দ্রমা বিরাজমান।

জ্যোতিষীরা শিবগুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্ শিবগুরো! এ পুত্র তোমার সাধারণ মানব নহে। এই পুত্রের

যখন চর লগ্নে জন্ম, বৃহস্পতি শুক্র যখন কেন্দ্রগত, এবং শনি যখন উচ্যস্থ, তখন ইনি কোনও অবতার।" তাঁহারা শিবগুরুকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "তোমার এই পুত্র শাস্ত্রকার হইবে, এই পুত্রের খ্যাতি চন্দ্র সূর্য্য যাবৎ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। দেখ শাস্ত্রে আছে—

কেন্দ্রগৌ সিতদেবেজ্যৌ
স্বোচ্চে কেন্দ্রগতেঽর্কজে,
চরলগ্নে যদা জন্ম
যোগোঽয়মবতারজঃ॥"

('আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ হইতে' গৃহীত)

শিবগুরু বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে সমাদর করিয়া পুত্রের আয়ু সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা শিশু যে অল্পায়ু তাহা বুঝিয়াছিলেন। এজন্য যদি শিবগুরু সে বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করেন এই ভয়ে একটু ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "মহাত্মন্! অদ্য আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি। অন্য একদিন আসিয়া আপনার পুত্রের কোষ্ঠী উত্তমরূপে গণনা করিব।" এই বলিয়া তাঁহারা বিদায় লইলেন।

শিবগুরু দেশের প্রথামত স্নানান্তে আভ্যুদয়িক সমাপনপূর্ব্বক পুত্রের জাতকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। দশমদিনে নামকরণ উপলক্ষে পুত্রের নাম শঙ্কর রাখিলেন। ষোড়শোপচারে ভগবান্ জ্যোতি-র্লিঙ্গের এবং কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রদান করিয়া সপুত্রা বিশিষ্টাদেবীকে গৃহে আনিলেন এবং দীনদরিদ্রকে অন্নবস্ত্র দানে পরিতুষ্ট করিলেন। শঙ্করপ্রসাদে পুত্রের জন্ম হওয়াতে পুত্রের নাম শঙ্কর রাখিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও সেবাধর্ম্ম।

(শ্রী—)

স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন তাঁহার অনন্ত জ্ঞানসম্ভার ও অহেতুকী স্বদেশপ্রীতি লইয়া দীনা বঙ্গমাতার ক্রোড়ে অবতীর্ণ হন তখন ভারতবাসী তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু যেদিন তিনি জলদগম্ভীর স্বরে স্বর্গীয় ভাষায় প্রচার করিলেন—

"ব্রহ্ম হতে কীটপরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

সেই দিন সমগ্র জগৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া প্রেমিকপ্রবরের চরণে আত্মবিক্রয় করিল। জগৎবাসী স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল, কে যেন তাঁহাদের অতি নিকটে গুরুগম্ভীর ভাষায় বলিতেছে—'বিংশ শতাব্দীর ভারতবাসীর মোক্ষলাভ করিতে হইলে পরের সেবায় নিজকে উৎসর্গ করিতে হইবে, আত্মপর ভেদ ভুলিয়া জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে নারায়ণজ্ঞানে সকলকে সেবা করিতে হইবে, শরীরপাত করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে।'

সেবা করা মানুষের জন্মগত সংস্কার। আর্ত্তের উদ্ধার চেষ্টা, প্রবলের অত্যাচার হইতে নিষ্পীড়িতকে রক্ষা করিবার স্পৃহা, তাহার সাহায্যের জন্য স্বকীয় জীবন উৎসর্গ করিবার আকাঙ্ক্ষা মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠতম অলঙ্কার। মানবহৃদয়ে জন্ম হইতেই যে ভালবাসার বীজ নিহিত রহিয়াছে তাহা তাহাকে নিজের আত্মীয় স্বজনের মঙ্গলের চেষ্টায় উৎসাহিত করিতেছে—স্বার্থপরের মত শুধু নিজ জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করিবার জন্য তাহার জন্ম হয় নাই। সকলের

সঙ্গে এক হইয়া অন্যের সুখ দুঃখের সহিত নিজের সুখ দুঃখ মিশ্রিত করিয়া বাস করিতে পারিলেই মানবজন্মের সম্পূর্ণ বিকাশ। এই যে পরস্পর মিলন ও সাহায্যের ভাব ইহাকেই এক কথায় বলা হয় সেবা। এই প্রবৃত্তি যেমন জন্মগত তেমনই ইহা মানবজীবনের মহাসম্পদ্।

ভোগবিলাসিতারূপ জীবনসংগ্রামের এই ঘোর দুর্দ্দিনে জপ, তপ, যোগসাধন, বিবেকবৈরাগ্যাদি সহায়ে জ্ঞানাগ্নিতে আত্মাহুতি দেওয়া কিম্বা ইষ্টচিন্তায় তন্ময়তা আনা বড়ই দুঃসাধ্য বলিয়া স্বামীজী ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরোপকারাদি লৌকিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলিকে সেবাধর্ম্মরূপে পরমার্থসাধনে পরিণত করিয়া কর্ম্মপ্রবণ মুমুক্ষু জীবের মুক্তিলাভের সহজ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর প্রদর্শিত এই সেবাধর্ম্ম ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভালবাসা ভগবৎপ্রেমেরই রূপান্তর মাত্র। লোকহিতসাধন এবং সেবাধর্ম্ম এই উভয়ের অনুষ্ঠান-গুলি এক হইলেও ভাবের তারতম্যানুসারে উভয়ের ফল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একটী কর্ত্তৃত্বাভিমান হেতু অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী, অপরটী উহার অভাব হেতু অদ্বৈতজ্ঞান বিকাশের তপনস্বরূপ। "আমি করিব", "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অভিমান অজ্ঞানপ্রসূত। তুমি আমি জগতের কি উপকার করিব?—ভগবানই একমাত্র জগতের মঙ্গল-বিধায়ী। আমাদের কাজ জীবজগতের সেবা করা। আমরা যখন জ্ঞানাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে কিম্বা ইষ্টচিন্তায় তন্ময় হইতে পারিতেছি না তখন আমাদের পরমার্থসাধনের একমাত্র উপায় জীবসেবা। এই জীবসেবা তাঁহারই সেবা। জীব সেবা করিলে ভগবানেরই সেবা করা হইবে।

অনেকে বলিতে পারেন, ভগবান্‌কে ভালবাসা, তাঁহার সেবা করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ও সম্ভবপর, কিন্তু মানুষে ঐরূপ কিরূপে সম্ভবে? তবে শাস্ত্রে আছে ব্যক্তিবিশেষের সেবা, যেমন গুরুসেবা, করিলে ভগবানেরই সেবা করা হয়—"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ" ইত্যাদি। কিন্তু জীব মাত্রেরই সেবা করিলে যে ভগবানেরই

সেবা করা হইবে ইহা কি বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অবান্তর কথা নহে? —না। পুরাণে আছে ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ স্ফটিকস্তম্ভে সেই প্রেমময় ভগবানের ভাবঘনমূর্ত্তি সন্দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে এইরূপ আরও শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার সেদিনও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রস্তরময়ী ভবতারিণীর সেবা করিতে করিতে সেই অদ্বৈতরূপিণী মা আনন্দময়ীর সাক্ষাৎলাভে মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। যদি মৃত্তিকা, প্রস্তর বা দারুমূর্ত্তির সেবা করিয়া ব্রহ্মোপলব্ধি হয় তবে এই জীবন্ত বিগ্রহের সেবা করিয়া উহাতে সেই প্রেমময় ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইবে না কেন? শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—"তোর ভিতরে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখ্‌তে পাচ্ছি।" আবার বলিতেন—"স্ত্রীমাত্রেই, এমন কি ঘৃণ্য বেশ্যাতে পর্য্যন্ত, সচ্চিদানন্দরূপিণী সেই জগজ্জননীকে দেখ্‌তে পাই।" জ্ঞানোন্মীলিত নয়নসমক্ষেই ভগবান্ এইরূপে প্রকাশিত হন। আমরা অজ্ঞ—অজ্ঞতাবশতঃই আমরা জগতের সহিত ভগবানের নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বুঝিতে পারি না। "মূঢোঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্"। ব্রহ্ম হইতে নীরয় কীট পর্য্যন্ত সকলের ভিতরেই সেই প্রেমময় ভগবান্ ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন। "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব"। "বশ্বময় বিশ্বনাথে", "জগৎ ভরা জগন্নাথে"। ভিতরে, বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে, দূরে, নিকটে সর্ব্বত্রই জগন্নাথ। সুতরাং মানবমাত্রেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের প্রকট বিগ্রহ। এই জীবসেবা করিলে ভগবানেরই সেবা করা হইবে—ইহা সত্য, অতি সত্য। কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া কেবল চাই ঠিক্ ঠিক্ ভাবে সেবা করিবার চেষ্টা—শিবজ্ঞানে জীবসেবা। এইরূপে সেবা করিতে করিতে সেই অদ্বৈতজ্ঞানের চরম পরিণতি বিশ্বপ্রেমের আনন্দধারা শতধারে প্রবাহিত হইবে—তখন নিজেও ভাসিবে অপরকেও ভাসাইয়া সেই ব্রহ্মসাগরে লইয়া যাইবে।

স্বামীজী শিখাইলেন, শুধু এক পরিবারভুক্ত আত্মীয় স্বজনের

সেবায় দেশের ও দশের কল্যাণ হইবে না। কারণ, তাহার মূল ভিত্তি মায়া। দেশের কল্যাণসাধন করিতে হইলে আত্মপরভেদ ভুলিয়া সকলকেই সেবা করিতে হইবে। এ সেবার অধিকারী শুধু উচ্চ বর্ণের লোকেরাই নয়, এ সেবার অধিকারী সকলেই। সকলেই তোমার ভাই—কাজেই, সকলেই সমভাবে ইহার অধিকারী। তাই তিনি ভারতবাসীকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন—"হে ভারত, ভুলিও না নীচজাতি—মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচী, মেথর—তোমার রক্ত, তোমার ভাই।" স্বামীজীর এই মহাবাণী দিবারাত্র আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হউক!

এখন দেখা যাক কি প্রকারে এই সেবাধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই এই জীবরূপী ভগবানের মায়া-রূপগুলি তিন প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে। দরিদ্র নারায়ণ, অজ্ঞ বা মূর্খ নারায়ণ এবং অবিদ্যামোহগ্রস্ত নারায়ণ। এই ত্রিবিধ নররূপী নারায়ণের সেবার প্রণালীও ত্রিবিধ হইবে। কিন্তু এই দরিদ্রনারায়ণ সেবায় পুষ্প বিল্বপত্র ধূপ দীপাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসাটুকু অকাতরে ঢালিয়া দিয়া শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুখশান্তির বিধানই এই নররূপী নারায়ণের পূজার একমাত্র অনুষ্ঠান। শক্তি-পূজার উপচারে বিষ্ণুপূজা চলে না, আবার বিষ্ণুপূজার উপকরণে শক্তিপূজা হয় না। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর পূজায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন উপচারের প্রয়োজন সেইরূপ প্রকৃতি বা প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নর-নারায়ণ সেবায়ও বিভিন্ন প্রকার উপকরণের প্রয়োজন। দৈহিক অভাবগ্রস্ত নারায়ণকে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধপথ্যাদি, মানসিক অভাবগ্রস্ত অজ্ঞ নারায়ণকে বিদ্যাশিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক অভাবগ্রস্ত-নারায়ণকে পরমার্থ-জ্ঞান-দানরূপ উপকরণে পূজা করিতে হইবে।

দারিদ্র্যের লীলাভূমি ভারতবর্ষে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের অভাব নাই। প্রতিবৎসর কতশত লোক যে চিকিৎসাভাবে ও অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সময় ব্যাধি-

গ্রস্তদের ঔষধ পথ্যাদি প্রদান করিয়া ও দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের অন্নবস্ত্র সাহায্য করিয়া প্রাণরক্ষা করা দেশবাসীমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

রোগীর সেবা ও ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদানের ন্যায় শিক্ষাদানের প্রতিও স্বামীজীর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। দেশের দরিদ্রকুলকে তুলিতে—তাহাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইতে শিক্ষাদান করিতে হইবে। এজন্য যাহারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে, তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্ন প্রদান করিবে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবে, এবং যাহারা পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাচারে পশুপদবীতে উপনীত হইয়াছে তাহাদের মানুষ করিবার জন্য আমরণ চেষ্টা করিবে—স্বামীজী এরূপ একটী নিঃস্বার্থ যুবকসম্প্রদায় গঠন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জাতীয় জীবনে উন্নতি লাভ করিতে হইলে আমাদের দরিদ্র নীচজাতিদের ভিতর শিক্ষাদানের একান্ত প্রয়োজন। জাতীয়তা হিসাবে আমরা যে বালক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট তাহার প্রধান কারণ এই যে আমাদের নীচজাতি মোটেই উন্নত নয়—শিক্ষার আলোক তাহারা মোটেই পায় নাই। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন—

"আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্ত্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে, এই সংসারে তোমরাও মানুষ, তোমরাও চেষ্টা করিলে আপনাদের সব রকম উন্নতি বিধান করিতে পার। এখন তাহারা এই ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। পুরোহিতগণ ও বিদেশীয় রাজগণ তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া পদদলিত করিয়াছে। অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ।"..."প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত।"..."যদি পুনরায় আমাদের উঠিতে হয় তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া।"

সুতরাং আমাদিগকে এখন শিক্ষা বিস্তার করিয়া দরিদ্র নারায়ণদের সেবা করিতে হইবে। শিক্ষা দ্বারা তাহাদের শক্তি

জাগ্রত করিয়া দিতে পারিলে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেশ ছাড়িয়া পালাইবে।

এই সেবাব্রত বর্ণ, আশ্রম কোন কিছুরই অপেক্ষা করে না। যখন যে অবস্থায়ই থাক না কেন, সর্ব্বত্রই সকলের জীবনে এই সাধনার সুযোগ রহিয়াছে। তবে কাহারও পক্ষে ঐরূপ সেবাই মুখ্য সাধনা, কাহারও পক্ষে বা উহা গৌণ। রোগ শোক দারিদ্র্য-যন্ত্রণায় প্রপীড়িত নরনারীরূপে ভগবান্ তোমার সেবা গ্রহণ করিতে সর্ব্বত্রই তোমার দ্বারস্থ! হে সাধক, এই সেবামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানের প্রকট বিগ্রহ মানব মানবীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া পারলৌকিক কল্যাণসাধনে তৎপর হও। আজ এই সেবা ব্রতটী মহান্ আদর্শরূপে তোমার সাধন পথে গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিক। এই সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তোমার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মই ভগবানের পূজা বলিয়া মনে হইতে থাকিবে এবং ভক্তের ইষ্টচিন্তায় তন্ময়তার ন্যায় তোমারও ভগবানে তন্ময়তা আনিয়া দিবে। তখন মানুষ আর মানুষ বলিয়া বোধ হইবে না, তখন দেখিতে পাইবে সেই প্রেমময় ভগবান্‌ই একমাত্র সর্ব্বত্র বিরাজিত।

ভগবৎজ্ঞানে জীবসেবায় শুধু যে পারলৌকিক কল্যাণই সংসাধিত হয় তাহা নহে, ইহাতে প্রকারান্তরে জাগতিক কল্যাণও সংসাধিত হইয়া থাকে। হিংসা, দ্বেষ, জিঘাংসা প্রভৃতি প্রবৃত্তি-নিচয়, রাজদণ্ডের ভয়প্রদর্শন, সামাজিক কঠোর শাসন এবং নীতিবাদাদি উপায় অবলম্বনে সমূলে বিনষ্ট করিয়া অনেকেই শান্তি স্থাপনে যত্নবান্; কিন্তু উহার ফলে অধিকাংশ স্থলই শান্তি স্থাপনের পরিবর্ত্তে দ্বন্দ্ব কোলাহল মিথ্যা শঠতা হিংসা দ্বেষ প্রভৃতির পৈশাচিক লীলাভূমিতে পরিণত হইয়া থাকে। জীবসেবা—নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবার ভাব—যতদিন না হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া মানব নির্ম্মল ও পবিত্র হইতে পারিবে ততদিন জগতে শান্তিলাভের আশা আকাশকুসুমের ন্যায় সুদূরপরাহত।

ঐরূপে সেবাভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারিলেই ভালবাসা ও পবিত্রতার উজ্জ্বল আলোকে হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতারূপ অজ্ঞানান্ধকার অদৃশ্য হইয়া যাইবে এবং তখনই এই জগৎ শান্তিময় স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—হে মানব, ওঠ জাগ, সেই মহাপুরুষের প্রদর্শিত সেবাধর্ম্মরূপ মহান্ আদর্শে জীবন গড়িয়া ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণসাধনে সমস্ত দুঃখকষ্টের অবসান কর। যে স্বামীজী দেশের সেবায় নিজের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন—যে স্বামীজী বিলাসের উপবন ঐশ্বর্য্যের অমরাবতী সুদূর আমেরিকায় অবস্থান কালেও দেশের দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ করিয়া মনের দুঃখে অসহনীয় যাতনায় দুগ্ধফেননিভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া পাপোষের উপর শয়ন করিয়া সমস্ত রাত্রি আরাধ্যদেবতার চরণে দেশের উন্নতির জন্য বেদনাতুর হৃদয়ের করুণ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, ঐ শুন তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"আমি এমন একদল যুবক চাই যাহাদের আদর্শ ত্যাগ, যাহারা পরের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে সততই প্রস্তুত, জগতের কল্যাণ করা—আচণ্ডালের কল্যাণ করাই যাহাদের ব্রত—তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে, যাহাদের মূল মন্ত্র 'পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ', যাহারা নিজের মুক্তি ইচ্ছা করে না, পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করাটাই যাহাদের মোক্ষ, যাহাদের শরীরের পেশী সমূহ লোহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্ম্মিত ও যাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন বাস করে যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত।"
* * "কতকগুলি চেলা চাই—fiery young men, বুঝ্‌তে পার্‌লে? intelligent and brave—যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝ্‌লে?"

আজ দেশের এই দুর্দ্দিনে স্বামীজীর অভীপ্সিত সেই যুবক-সম্প্রদায় কোথায়? তাহার এই প্রেমের ডাক কি তাঁহাদের কর্ণে পৌঁছিতেছে না?

দরিদ্র নারায়ণদের সেবা করিতে হইলে—তাহাদের ভিতর শিক্ষা প্রচার করিতে হইলে—আমাদের আদর্শ ত্যাগী হইতে হইবে। এমন জীবন গঠন করিতে হইবে যে, সমস্ত জগৎ তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া আমাদের পথ অনুসরণ করিবে। এক মহাপ্রেমের ভাবে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে—সমস্ত বিদ্বেষ হিংসা বিদূরিত করিতে হইবে—জাত্যভিমানের সামান্য বীজটুকুও হৃদয় হইতে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। যেখানে দুঃখ, যেখানে দারিদ্র্য, যেখানে অজ্ঞান, তাহা দূর করিবার জন্য আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। স্বদেশ বিদেশ স্বজাতি বিজাতি এই বৈষম্যজ্ঞান থাকিবে না—সকলের প্রতি সমভাবে প্রেমবারি বর্ষিত হইবে। সর্ব্বোপরি আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে। আসুন, আমরা উপসংহারে স্বামীজীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মা জগদম্বার শ্রীচরণে মনুষ্যত্ব ভিক্ষা করি—

"হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমার দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা দূর কর—আমায় মানুষ কর।

আমাদের পল্লীগ্রামের অবস্থা ও তাহার প্রতিকারের উপায়।

(শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এস্-সি)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পল্লীগ্রামে ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনের অভাবও বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। যদিও অনেক গ্রামে হরিসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই, তথাপি যথার্থ ভাব, ভক্তি, সরলতা, পবিত্রতা সেখানে কচিৎ দৃষ্ট হয়।

দলাদলি, মোকদ্দমা, পরস্পর হিংসা, স্বার্থপরতা, ব্রহ্মচর্য্যহীনতা, এমন কি, ব্যভিচার প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ধর্ম্ম ও নীতিবিরুদ্ধ আচরণ পল্লীগ্রামের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, এক শ্রেণীর পাণ্ডিত্যাভিমানী লোক সনাতন ধর্ম্মকে নিরক্ষর পল্লীবাসীর নিকট অতি বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ করিয়া উপস্থিত করিতেছেন। পল্লীবাসীদিগের মধ্যে অনেকেরই ধারণা, যে ব্রাহ্মণ শিখা ধারণ করিয়া দুই একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণীই যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ। তাঁহারা জানেন না যে, পাণ্ডিত্যে ও যথার্থ আধ্যাত্মিকতায় কতদূর প্রভেদ। শ্রুতি এ বিষয়ে বলিতেছেন—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।"

অর্থাৎ অবিবেকরূপ অবিদ্যার অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়াও যাহারা আপনাদিগকে ধীর এবং পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই বক্রগতি মূঢ়গণ অন্ধপরিচালিত অন্ধের ন্যায় বিপথে (নানালোকে) পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।"

অনেক পল্লীগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত দেবালয় সমূহে নিত্যপূজা হওয়া ত দূরের কথা, উহারা অশ্বত্থ বট ও সরীসৃপাদির আশ্রয়স্থল হইয়াছে। যেখানে এখনও নিত্যপূজা চলিতেছে সেখানকার দেবালয় ও পূজার অবস্থা দেখিলে মনে হয় অধিকাংশস্থলে বিগ্রহ গলগ্রহে পরিণত হইয়াছে।

অবশ্য দুই একটি গ্রামে দুই একজন যথার্থ ভক্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু সাধারণতঃ এই অবস্থা। যে বাড়ীতে বিগ্রহ আছেন সেখানে রমণীগণের যত্নে ঠাকুরঘরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলেও পূজা যথাযথ হইয়া উঠা এক প্রকার অসম্ভব, কারণ, পূজারী ব্রাহ্মণের হৃদয় যে কারণেই হউক শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া

যায় যে, পুরোহিত ব্রাহ্মণ কোনও কারণে যজমানের বাটীতে যাইতে অক্ষম হইলে যে কোনও মন্ত্রানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বালক বা যুবককে যজমানের ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দেন। এমন কি, অনেক সময়ে ঠোঁট নাড়িতে, মাঝে মাঝে জল ছিটাইতে ও যথেচ্ছা পুষ্পচন্দনের ব্যবহার করিতে শিখাইয়া দিয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ যজমানকে প্রতারণা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কোথায় তাঁহারা যজমানদিগকে সকাম উপাসনা ছাড়াইয়া নিষ্কাম উপাসনার দিকে লইয়া যাইবেন, তা না হইয়া তাঁহারা কেবল চালকলা বাঁধিবার জন্য ব্যস্ত!

পল্লীগ্রামে আর এক শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়া যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন তাঁহারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর ব্যক্তি অধিকাংশই নাস্তিক বা অল্প বিশ্বাসী। "বালক স্কুলে গেল, সে প্রথম শিখিল তাহার বাপ একটা মূর্খ, দ্বিতীয়তঃ, তাহার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ, প্রাচীন আর্য্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না' এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়।" পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তিগুলি বর্ণে বর্ণে এই শ্রেণীর অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে সত্য।

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য, অর্থ, ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনের অভাব সম্বন্ধে স্থূল ভাবে আলোচনা করা হইল। আমরা দেখিয়াছি যে ইচ্ছা করিলেই অধিকাংশ অভাব মোচন করিতে পারি, তথাপি কেন আমাদের এইরূপ শুভেচ্ছা হয় না?

ধর্ম্মই আমাদের জীবনীশক্তি। আমরা যতই ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছি ততই আমাদের জীবনীশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, আমরা জড়বৎ হইয়া পড়িতেছি। সেই জন্যই কোন কার্য্য বিশেষ কল্যাণকর বলিয়া প্রতীত হইলেও আমরা ঐ কার্য্যে আমাদের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে পারি না। আমরা বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় সকল বিষয় বুঝিয়াও অঙ্গসঞ্চালনে অক্ষম হইয়া পড়িতেছি।

অনেকে বলেন যে, শিক্ষার অভাবই পল্লীগ্রামের দুরবস্থার প্রধান

কারণ। কিন্তু এ শিক্ষা কোন্ শিক্ষা? যে শিক্ষার দ্বারা আমরা নাস্তিক-কল্প ও মেরুদণ্ডবিহীন হইয়া পড়িয়াছি সেই শিক্ষার প্রচলনেই কি পল্লীসমাজের যথার্থ উন্নতি সাধিত হইতে পারে? যতক্ষণ ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত না হইবে, ততক্ষণ যতই আমরা জ্ঞানলাভ করি না কেন আমাদের জ্ঞান কিছুতেই কার্য্যকরী হইবে না। বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও লৌকিক বিদ্যাশিক্ষার অভাব আমাদের দুরবস্থার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ ধর্ম্মভাবের অভাব।

ধর্ম্মহীন হওয়ায় জড়তা, নৈরাশ্য, বিকৃতরুচি, পরনির্ভরশীলতা, পরানুকরণপ্রিয়তা, অকপটতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মানসিক ব্যাধি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। পল্লীগ্রামে ইতরসাধারণের মধ্যে মাদক দ্রব্যের বহুল ব্যবহার, শিক্ষিত পল্লীবাসী কর্ত্তৃক অভিনীত বাৎসরিক থিয়েটার, ঝুমের নাচ প্রভৃতি আমাদের বিকৃত রুচির জলন্ত দৃষ্টান্ত। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কেহ কেহ শারীরিক পরিশ্রম সাপেক্ষ যাবতীয় কার্য্যকেই হেয় বলিয়া মনে করেন। নিজের ছোট খাট মোট বহন করিতে, নিজের বাটীতে কোন কার্য্য উপলক্ষে কাটারি বা কোদাল স্পর্শ করিতে দ্বিধা বোধ করেন। ইহাও আমাদের বিকৃত রুচির পরিচায়ক। কোন প্রকার শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে এরূপ আশা আমরা সহজে করিতে পারি না—ইহা হইতে আমাদের নৈরাশ্যের গভীরতা বুঝিতে পারা যায়। স্বাধীন কৃষি বাণিজ্যাদি ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সামান্য চাকরীর জন্য ধনীর পদলেহন, পরান্নভোজন, অদৃষ্টের দোহাই দিয়া কুড়েমির প্রশ্রয় দেওয়া প্রভৃতি দ্বারা আমাদের শ্রদ্ধাহীনতা বা নিজের উপর অবিশ্বাস সূচিত হয়। আর আহার বিহার সাজ সজ্জায় আমরা এতদূর পরানুকরণ করিতেছি যে, মহামান্য জষ্টীস্ উড্রফের ন্যায় নিরপেক্ষ পাশ্চাত্যবাসীও আমাদিগকে জাতীয় আচার রক্ষা করিবার নিমিত্ত সতর্ক করিতে বাধ্য হইতেছেন।

যাহা হউক, আমাদের পল্লীসমাজের অবস্থা যতই শোচনীয় হউক উহার সম্পূর্ণ প্রতিকারের ব্যবস্থা আমাদের সাধ্যাতীত

নহে। আমাদের কর্ম্মহীনতা ও তন্নিবন্ধন নানাবিধ মানসিক ব্যাধি যতই ক্ষীণ হইবে ততই আমরা শুভকর্ম্মের প্রেরণা অনুভব করিব এবং আমাদের কার্য্যকরী শক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে। সৎসঙ্গ, সৎচিন্তা, ও সৎকর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মহীনতার হ্রাস সাধন করা যায়। সৎসঙ্গ ও সৎচিন্তা দ্বারা সাধু ইচ্ছা জাগ্রত হয় এবং সৎকর্ম্মের দ্বারা ঐ ইচ্ছা ফলবতী হইয়া আমাদের চিত্তশুদ্ধি বিধান করিয়া থাকে। নিঃস্বার্থ সেবাই সৎকর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা আমরা ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক রাজ্যের অতি উচ্চস্থান লাভ করিবার অধিকারী হইতে পারি। আমরা যদি পল্লীগ্রামে নিঃস্বার্থ সেবা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণসাধনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের চিত্তশুদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে আমাদের পল্লীসমস্যা সমাহিত হইবার অনেক সম্ভাবনা।

কিরূপে পল্লীসেবার অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে একটি বিষয় জানিতে হইবে। আমাদের জানিতে হইবে যে, যে কারণেই হউক আমাদের ক্রমোন্নতির একটি যুগ আবির্ভূত হইয়াছে। এই কথাটি অন্ধের ন্যায় বিশ্বাস করিতে হইবে না—চতুর্দ্দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেই এই বাক্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমাদের দেশের ধর্ম্মাচার্য্য বৈদেশিক বিদ্বৎ-মণ্ডলীর সমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে আমাদের বেদান্তের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। এ যাবৎ যাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, হিন্দুসমাজ পৌত্তলিক এবং বর্ব্বর—এ যাবৎ যাঁহাদের অভিমান ছিল যে তাঁহারাই জগতে সভ্যতা এবং জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন এই ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহাদের ধারণা আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের কবি জগতের সাহিত্যিক সভায় সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন। আমাদের বৈজ্ঞানিক চৈতন্যতত্ত্বের অদ্ভুত বিস্তার দেখাইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের শিল্প ব্যবসায়ী সুবৃহৎ কারখানা স্থাপন ও পরিচালন করিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত বহুমুখী শক্তির পরিচয় দিতেছেন। আজ ভারতের নানা স্থানে অনাথাশ্রম,

সেবাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া দীন দুঃখী অনাথের দুঃখনিবারণ করিতেছে, আজ হিন্দু ব্রাহ্ম বৈষ্ণব আর্য্যসমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনার সময়ে প্রাণ দিয়া দেশের সেবা করিতেছেন। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সমাজে এরূপ আশাপ্রদ কোনও লক্ষণ বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। আজকাল আমাদের যুবকদের মধ্যে স্বার্থশূন্য শুভকর্ম্মের প্রবল প্রেরণা পরিলক্ষিত হইতেছে। আমাদের মাননীয় গভর্ণর লর্ড রোনাল্‌ডসে মহোদয় দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য ২৪শ পরগণা, যশোহর ও নদীয়ায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং বক্রকীট ব্যাধি নিরাকরণের নিমিত্ত যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন। ইহাতে কি মনে হয় না সত্যই ভগবান্ আজ এই দেশের উন্নতি সাধনের ইচ্ছা করিয়াছেন? দুই একটি নিঃস্বার্থ ব্যক্তির আন্তরিক চেষ্টায় কাশীর সেবাশ্রমের ন্যায় সুবৃহৎ অনুষ্ঠানের ক্রমবিকাশ হইতে পারে, এই কথা স্মরণ রাখিলে মনে হয় যেন এ পতিত জাতির উপর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে —ভারতের সুপ্ত সমষ্টিচৈতন্য জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই কার্য্য করিবার শুভ অবসর। মহাপুরুষ "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" বলিয়া আমাদের আহ্বান করিয়াছেন, আমাদিগকে সে আহ্বান শুনিতেই হইবে।

এক্ষণে আমাদিগকে কি ভাবে কার্য্য করিতে হইবে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। যদি কোন পল্লীগ্রামে একজন ব্যক্তিও আত্মবিশ্বাস ও ভগবৎকৃপার বলে বলীয়ান্ হইয়া স্বীয় জড়তা ও নৈরাশ্য দূর করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই গ্রামের অবস্থা পরিবর্ত্তন করা তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া পড়িবে। অগ্নি হইতে যেরূপ অগ্নি সংগৃহীত হয়, সেইরূপ একব্যক্তি উদ্বুদ্ধ হইলে তাঁহার সঙ্গলাভে বহু ব্যক্তি উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে গ্রামের মধ্যে একদল স্বার্থশূন্য সেবকের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যথার্থ মহাপুরুষ ব্যতীত অন্য কাহারও বাক্যমাত্র শ্রবণ করিয়া কাহারও জড়তার লোপ হওয়া অসম্ভব।

সুতরাং যে ব্যক্তির জড়তা কিঞ্চিৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি বৃথা বাক্যব্যয় দ্বারা স্বীয় শক্তির অপচয় না করিয়া তাঁহার সাধ্যানুযায়ী কোন শুভকার্য্যে ব্রতী হইবেন—অপর কাহারও সাহায্যের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবেন না। তিনি নিজে যদি যথার্থ অকপট হন তবে এইরূপ অনুষ্ঠানের ফলে তাঁহার নিজেরও ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হইয়া উঠিবে এবং তাঁহার কার্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়া অপরাপর ব্যক্তিগণও একে একে তাঁহার সহযোগী হইয়া দাঁড়াইবেন। অবশ্য প্রথমে বহুপ্রকার বাধা বিঘ্ন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, কিন্তু এইগুলিকে নিজের কর্ম্মক্ষমতার পরীক্ষা মাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে অবিচলিত ভাবে নিষ্ঠার সহিত স্বীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তিনি যদি এইরূপে তাঁহার স্বার্থশূন্যতা ও সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ কামনা স্বীয় ব্যবহারের দ্বারা ধীরে ধীরে জনসাধারণকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনতিবিলম্বে সমস্ত পল্লীবাসীর বিশ্বাসভাজন হইয়া তাঁহাদের সহানুভূতি পাইতে থাকিবেন। আমরা এখন অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় থাকিলেও যথার্থ আধ্যাত্মিকতার সম্মান করিতে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হই নাই। ধর্ম্মহীন বা অবিশ্বাসী হইলেও যথার্থ নিঃস্বার্থ কর্ম্মের প্রভাবে আমাদের হৃদয় এখনও স্পন্দিত হয়, কারণ, আমাদের হৃদয়ের নিম্নস্তরে সংস্কারগত ধর্ম্মভাব এখনও বিদ্যমান। শুধু আমাদের কেন, মনুষ্য মাত্রেরই মানসিক গঠন অনেকটা এইরূপ—যথার্থ নিঃস্বার্থ শুভকর্ম্ম দেখিলে, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক প্রায় সকলেই ঐ কর্ম্মে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তবে ধর্ম্মহীনতার গভীরতা অনুযায়ী আমাদের সহানুভূতি জাগ্রত হইতে বিলম্ব হয়। এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া উপস্থিত কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া শুভানুষ্ঠানটি নিষ্ঠার সহিত পরিচালন করিয়া যাইতে হইবে—যাঁহার যখন সময় হইবে তিনি তখন স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় সাহায্যদানে অগ্রসর হইবেন।

প্রথমে এমন একটি কার্য্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে যাহা বহু-ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীতও অনুষ্ঠিত হইতে পারে, অথচ যাহা দ্বারা

সর্ব্বসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় এই প্রকারের একটি অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। খুব সামান্য অর্থ সংগ্রহ (৮।১০৲ টাকা) করিলেই এই অনুষ্ঠানটি স্থাপন করা যায়, এবং ইহার পরিচালনা করিতেও মাসিক ব্যয় খুব সামান্যই, ২।১৲ টাকা মাত্র। ইতিপূর্ব্বে দারিদ্র্যের বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কালে আমরা দেখিয়াছি যে পল্লীগ্রামে অধিকাংশ ব্যক্তিই দীনমধ্যবিত্ত বা শ্রমজীবী এবং তাহাদের রোগের চিকিৎসা করাইবার অর্থ নাই। সুতরাং পল্লীগ্রামে দাতব্য ঔষধালয়ের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণকেও এই ঔষধালয় হইতে সাহায্য দান করা যাইতে পারে। এইরূপ করিলে তাঁহাদের সহানুভূতি অতি সত্বরই এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু এই কথাটি আমাদের বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রথমেই চাঁদার খাতা খুলিয়া গ্রামবাসিগণের দ্বারে দ্বারে অর্থ সংগ্রহ করিতে গেলে পণ্ডশ্রম হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমরা জানি, কোন একটী গণ্ডগ্রামে কয়েকটি মাত্র যুবক নিজেদের মধ্যে মাত্র দুই টাকা বার আনা সংগ্রহ করিয়া "দাতব্য ঔষধালয়" স্থাপন করেন। আর এক বৎসরের মধ্যেই গ্রামস্থ অনেক মধ্যবিত্ত বা দীন ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাসিক চাঁদা দান করিতে আরম্ভ করেন। ঔষধালয়টির মাসিক চাঁদা ৩।৪ টাকা হইয়া পড়ে। ইহাই এইরূপ ঔষধালয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

এই অনুষ্ঠানটিতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে সেবকদিগকে একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহাদিগকে এই কার্য্যটি অতি নিষ্ঠার সহিত করিয়া যাইতে হইবে। আমাদের অধিকাংশ কার্য্যই যে স্থায়ী হয় না তাহার এ প্রধান কারণ এই নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব। এই সময়ে সেবকগণ তাহাদের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। যথাসময়ে নিয়মিত ভাবে ঔষধালয়ের কার্য্য করা, কাহারও নিকট কিছু প্রতিশ্রুতি করিলে তাহা

ঠিক ঠিক পালন করা, রোগীর নাম, ধাম, রোগ ও ঔষধের নাম নিয়মিত ভাবে লিখিয়া রাখা এবং জমা খরচের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখা প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা সেবকদিগের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, কর্ম্মতৎপরতা, স্বার্থশূন্যতা প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় সদ্‌গুণাবলী ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইবে এবং এই সকল গুণ যতই তাঁহাদের পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে ততই তাঁহারা সাধারণের বিশ্বাসভাজন হইতে থাকিবেন এবং সেবকদিগের দলও পুষ্ট হইতে থাকিবে। এইস্থানে একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক—এইরূপ একটি ঔষধালয় একজন মাত্র সেবক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং বহুদিন পরিচালিত হইতে পারে, এবং ক্রমশঃ সাধারণের চিত্তাকর্ষণ হইতে হইতে দলপুষ্টি হইয়া এই সামান্য অনুষ্ঠানটি বৃহদনুষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

বিদ্বৎসন্ন্যাস।

(পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শঙ্কা)—যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে আত্মজ্ঞান সম্যক্ পরিপক হইলে তাহার সেই অবস্থান্তরকেই মুনিত্ব বলে, অতএব আত্মজ্ঞান দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত (অর্থাৎ বিবিদিষা) সন্ন্যাস হইতে মুনিত্ব-রূপ এই ফল (লাভ করা গিয়া থাকে)—

(সমাধান)—তবে আমরা বলি, ভালই, আমরা তাহা স্বীকার করি এবং সেই হেতু বলি যে সেই সাধনরূপ সন্ন্যাস হইতে এই ফলরূপ সন্ন্যাস ভিন্ন। যেরূপ বিবিদিষা সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক তত্ত্বজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত শ্রবণাদি সম্পাদন করা কর্ত্তব্য সেইরূপ বিদ্বৎসন্ন্যাসী কর্ত্তৃক জীবন্মুক্তিলাভের নিমিত্ত মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সম্পাদন করা

কর্ত্তব্য। ইহা অগ্রে সবিস্তর বর্ণনা করিব। এই দুই সন্ন্যাসের মধ্যে অবান্তর ভেদ থাকিলেও পরমহংসস্বরূপে উভয়কেই এক ধরিয়া স্মৃতিশাস্ত্র সমূহে "চতুর্বিধা ভিক্ষবঃ" * এই চারিটি মাত্র সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বিবিদিষা সন্ন্যাসী এবং শেষোক্ত বিদ্বৎ সন্ন্যাসী উভয়কেই পরমহংস বলে, একথা জাবালশ্রুতি (জাবালোপনিষৎ, ৪,৫) হইতে জানা যায়। তথায় (পাওয়া যায়), জনক সন্ন্যাস সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে যাজ্ঞবল্ক্য (আশ্রমভেদে) বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া এবং পর পর যে যে প্রকার (কর্ম্মাদির) অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহাও নির্দ্দেশপূর্ব্বক বিবিদিষা সন্ন্যাসের কথা বলিলেন, এবং তাহার পর অত্রি যজ্ঞোপবীতরহিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে দোষ ধরিলে পর যাজ্ঞবল্ক্য "আত্মজ্ঞানই তাঁহার যজ্ঞোপবীত" এই বলিয়া সমাধান করিলেন। এইহেতু বাহ্যোপবীতের অভাব দেখিয়া (বিবিদিষা সন্ন্যাসের) পরমহংসত্ব নিশ্চিত হইল। এবং অপর (ষষ্ঠ) কণ্ডিকায় "পরমহংসগণ" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা আরম্ভ করিয়া সম্বর্ত্তক, আরুণি প্রভৃতি অনেক ব্রহ্মবিদ্ জীবন্মুক্তের উদাহরণ দিয়া "অব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তঃ"—তাঁহারা অব্যক্তলিঙ্গ (আশ্রমবিশেষের চিহ্নাদিশূন্য), অব্যক্তাচার (সর্ব্বপ্রকার আচার বর্জ্জিত), অনুন্মত্ত (উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহারে রত) এই বলিয়া বিদ্বৎসন্ন্যাসিগণের অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। আর "ত্রিকাণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যং পাত্রং জলপবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতং চেত্যেতৎ সর্ব্বং ভূঃ স্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাঽঽত্মানমন্বিচ্ছেৎ"—ত্রিকাণ্ড (ত্রিদণ্ড), কমণ্ডলু, শিক্য শিকা, পাত্র, জলপবিত্র, (জল ছাঁকনি), শিখা, যজ্ঞোপবীত ইত্যাদি বস্তু সমূহ 'ভূঃ স্বাহা' এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক জলে পরিত্যাগ

* পারাশর-মাধবীয়ে হারীতবচনঃ—

"চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবস্তু প্রোক্তাঃ সামান্যলিঙ্গিনঃ

* * *

কুটীচকো বহূদকো হংসশ্চৈব তৃতীয়কঃ।
চতুর্থঃ পরমোহংসঃ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥"

করিয়া আত্মার অন্বেষণ করিবেক। এইরূপে যিনি ত্রিদণ্ড ছিলেন তাঁহার পক্ষে একদণ্ড চিহ্নিত বিবিদিষা সন্ন্যাস বিধান করিয়া সেই বিবিদিষা সন্ন্যাসের ফলস্বরূপ বিদ্বৎসন্ন্যাস নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"যথাজাতরূপধরো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহস্তত্ত্ব-ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ সম্পন্ন শুদ্ধমানসঃ প্রাণসংধারণার্থং যথোক্তকালে বিমুক্তো ভৈক্ষ্যমাচরন্নুদরপাত্রেণ লাভালাভৌ সমৌ কৃত্বা শূন্যাগার-দেবতাগৃহ-তৃণকুট-বল্মীক-বৃক্ষমূল-কুলালশালাগ্নিহোত্র-নদীপুলিন-গিরি-কুহর-কন্দর-কোটর-নির্ঝর-স্থণ্ডিলেষ্বনিকেতবাস্যপ্রযত্নো নির্ম্মমঃ শুক্লধ্যানপরায়ণোঽধ্যাত্মনিষ্ঠঃ শুভাশুভকর্ম্মনির্ম্মূলনপরঃ সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং করোতি স এব পরমহংসো নাম।"

যিনি সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের দ্বারা অবিকৃতচিত্ত এবং পরিগ্রহশূন্য (সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিবিহীন) থাকিয়া ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ নিরত, ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া প্রাণধারণের নিমিত্ত যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বাধীনভাবে উদরপাত্রের দ্বারা (ভোজন পাত্র শূন্য হইয়া) ভিক্ষাচরণ করেন এবং লাভ অলাভকে সমান জ্ঞান করেন এবং অনির্দ্দিষ্টাশ্রয় হইয়া শূন্যভবন, দেবালয়, তৃণকুটীর, বল্মীক, বৃক্ষমূল, কুম্ভকারের কর্ম্মশালা (পোয়ান), অগ্নিহোত্র (হবন গৃহ), নদীপুলিন, গিরিগহ্বর, কন্দর, কোটর, নির্ঝর (সন্নিহিত) যজ্ঞভূমি (প্রভৃতি) স্থানে (বাস করেন) এবং নিশ্চেষ্ট নির্ম্মম হইয়া শুক্লধ্যাননিরত, অধ্যাত্মনিষ্ঠ শুভাশুভ কর্ম্মক্ষয়পরায়ণ হইয়া সন্ন্যাসের দ্বারা দেহত্যাগ করেন তিনিই নিশ্চয় পরমহংস। সেইহেতু এই উভয়ের (বিবিদিষা ও বিদ্বৎ সন্ন্যাসের) পরমহংসত্ব সিদ্ধ হইল। উক্ত উভয় প্রকার সন্ন্যাসের পরমহংসত্ব তুল্যরূপে সিদ্ধ হইলেও তাহারা পরস্পর বিপরীত স্বভাবের বলিয়া তাহাদের মধ্যে অবান্তরভেদও (অবশ্যই) স্বীকার করিতে হইবে। এই দুই সন্ন্যাস যে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত তাহা 'আরুণি' উপনিষদ্ ও 'পরমহংস' উপনিষদের পর্য্যালোচনায় জানা যায়। "কেন ভগবন্ কর্ম্মাণ্যশেষতো বিসৃজামি" (আরুণিকোপনিষদ্ ১)—

"হে ভগবন্, কোন্ উপায় দ্বারা আমি নিঃশেষরূপে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারি" এই বাক্যের দ্বারা শিষ্য আরুণি গুরু প্রজাপতিকে শিখা, যজ্ঞোপবীত, স্বাধ্যায়, গায়ত্রীজপাদি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মত্যাগরূপ বিবিদিষা সন্ন্যাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু প্রজাপতি (প্রথমে) "শিখাং যজ্ঞোপবীতং" (শিখা যজ্ঞোপবীত) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সর্ব্বত্যাগের কথা বলিলেন, (পরে) "দণ্ডমাচ্ছাদনং কৌপীনং চ পরিগ্রহেৎ"—দণ্ড, আচ্ছাদন (বহির্বাস গাত্রবস্ত্র) ও কৌপীন গ্রহণ করিবে। এই বাক্যের দ্বারা দণ্ডাদিগ্রহণ বিধান করিলেন, এবং "ত্রিসন্ধ্যাদৌ স্নানমাচরেৎ। সন্ধিং সমাধাবাত্মন্যাচরেৎ সর্ব্বেষু বেদেষারণ্যকমাবর্ত্তয়েৎ। উপনিষদমাবর্ত্তয়েৎ।" (আরুণিকোপনিষদ্ ২)—তিনবার সন্ধ্যা করিবার পূর্ব্বে স্নান করিবে, সমাধিতে আত্মার সহিত সন্ধি (সংযোগ অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান) অভ্যাস করিবে, বেদ সমূহের মধ্যে "আরণ্যক" (অংশের) আবৃত্তি করিবে, উপনিষদের আবৃত্তি করিবে। এই বাক্যের দ্বারা আত্মজ্ঞানের হেতু স্বরূপ যে আশ্রমধর্ম্ম সমূহ, তাহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান করিলেন। আর (পরমহংসোপনিষদে) "অথ যোগিনাং পরমহংসানাং কোঽয়ং মার্গঃ"—"পরমহংস যোগীদিগের পথ কিরূপ?" নারদ এই প্রশ্নের দ্বারা গুরু ভগবান্ প্রজাপতিকে বিদ্বৎসন্ন্যাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি "স্বপুত্র মিত্র" * ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্যাগের কথা বলিলেন, এবং "নিজের শরীরের উপভোগের নিমিত্ত এবং লোকের উপকারের নিমিত্ত, কৌপীন, দণ্ড ও আচ্ছাদন গ্রহণ করিবে" এই বলিয়া দণ্ডাদিগ্রহণ লোকাচার মাত্র ইহা দেখাইয়া "এবং তাহা মুখ্য নহে" এই কথা বলিয়া দণ্ডাদি গ্রহণ যে শাস্ত্রীয় (অর্থাৎ একান্ত

---

* অসৌ স্বপুত্রমিত্রকলত্রবন্ধ্বাদীন্ শিখাং যজ্ঞোপবীতং যাগং সত্রং স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্য ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরভোগার্থায় লোকস্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ, তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি, কোঽয়ং মুখ্য ইতি চেদয়ং মুখ্যঃ ন দণ্ডং ন কমণ্ডলুং ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং ন চাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ ন শীতং ন চোষ্ণং ন সুখং * * * * আশাম্বরো (আকাশাম্বরো) ন নমস্কারঃ * * *"

কর্ত্তব্য) নহে তাহা বুঝাইলেন। পরে "তবে মুখ্য কি ?" এই আশঙ্কা উঠাইলে বলিলেন—"ইহাই মুখ্য যে পরমহংস দণ্ড, শিখা, যজ্ঞোপবীত এবং আচ্ছাদন (গাত্রবস্ত্র) ব্যবহার করেন না"; (এবং ইহা দ্বারা) দণ্ডাদি চিহ্ন রহিত হওয়াই শাস্ত্রানুমোদিত ইহা (বুঝাইয়া) "না শীত না গ্রীষ্ম" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা এবং "দিগম্বর নমস্কারশূন্য" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা (পরমহংস) যে লোকব্যবহারের অতীত তাহা বুঝাইলেন, এবং পরিশেষে "যে ব্রহ্ম পূর্ণ, আনন্দ, এক এবং বোধস্বরূপ তাহাই আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কৃতকৃত্য হয়েন" * এই পর্য্যন্ত বাক্যের দ্বারা পরমহংসের (সকল কর্ত্তব্য) ব্রহ্মানুভবমাত্রে পর্য্যবসিত হয় ইহাই বিশেষরূপে বুঝাইলেন। অতএব বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎ-সন্ন্যাস পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য প্রদর্শিত সঙ্কেত অনুসারে স্মৃতিশাস্ত্র সমূহ হইতে দেখিয়া লইতে হইবে। (স্মৃতিতে আছে) পারাশর-মাধবীয় স্মৃতি অঙ্গিরা বচন—

"সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ॥
প্রবৃত্তিলক্ষণো যোগো জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্।
তস্মাজ্‌জ্ঞানং পুরস্কৃত্য সন্ন্যসেদিহ বুদ্ধিমান্॥"

—সংসারকে একেবারে সারশূন্য জানিয়া এবং তাহার সারদর্শন করিবার অভিলাষে (কেহ কেহ) বিবাহ না করিয়া পরবৈরাগ্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। প্রবৃত্তিই যোগের (কর্ম্মের) লক্ষণ এবং সন্ন্যাসই জ্ঞানের লক্ষণ। সেইহেতু এই সংসারে যিনি বুদ্ধিমান্ (বিবেকী) তিনি জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন। ইত্যাদি বিবিদিষা সন্ন্যাসের (কথা)।

"যদা তু বিদিতং তত্ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনং।
তদৈকদণ্ডং সংগৃহ্য সোপবীতশিখাং ত্যজেৎ॥
জ্ঞাত্বা সম্যক্ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বং ত্যক্ত্বা পরিব্রজেৎ॥"

* "যৎপূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্‌ ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি"।

—কিন্তু যখন তত্ত্ব জানা যাইবে অর্থাৎ সনাতন পরব্রহ্ম বিদিত হইবেন তখন একটি দণ্ড সংগ্রহ করিয়া উপবীতের সহিত শিখা পরিত্যাগ করিবেন। পরব্রহ্মকে সম্যক্ প্রকারে জানিয়া সব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে।

ইত্যাদি বিদ্বৎসন্ন্যাসের (কথা)।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, লোকের যেমন কেবল ঔৎসুক্যবশতঃ (চিত্রাঙ্কনাদি) কলাবিদ্যা জানিতে প্রবৃত্তি হয়, (ব্রহ্মবিদ্যা) জানিবারও ত' কখনও সেইরূপ ইচ্ছা হইতে পারে; এবং এইরূপে যে ব্যক্তি পল্লবগ্রাহীমাত্র (অর্থাৎ অল্পজ্ঞ) এবং যিনি আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন (কিন্তু যাঁহার প্রকৃত পাণ্ডিত্য নাই) সেইরূপ ব্যক্তিগণেরও বিদ্বত্তা বা ব্রহ্মজ্ঞান দেখা যায় কিন্তু তাহাদের ত' সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে দেখা যায় না। অতএব বিবিদিষা (জিজ্ঞাসা) ও বিদ্বত্তা (জ্ঞান) এই শব্দ-দ্বয়ের কিরূপ অর্থ অভিপ্রেত (তাহা জানা আবশ্যক)।

(সমাধান)—বলিতেছি। যেমন তীব্র ক্ষুধা উৎপন্ন হইলে ভোজন ভিন্ন অন্য কার্য্যে রুচি হয় না, এবং ভোজনেরও বিলম্ব সহ্য হয় না, সেইরূপ যে সকল কর্ম্ম জন্মলাভের হেতু, সেই সকল কর্ম্মে অত্যন্ত অরুচি এবং জ্ঞানলাভের হেতু যে শ্রবণাদি তাহাতে অত্যন্ত ত্বরা জন্মে। সেই প্রকার বিবিদিষাই (জানিবার ইচ্ছাই) সন্ন্যাসের হেতু।

বিদ্বত্তার (জ্ঞানের) সীমা "উপদেশ-সাহস্রী"তে (এইরূপ) কথিত হইয়াছে :—

"দেহাত্মজ্ঞানবজ্‌জ্ঞানং দেহাত্মজ্ঞানবাধকং।
আত্মন্যেব ভবেদ্যস্য স নেচ্ছন্নপি মুচ্যতে॥"

—দেহের প্রতি লোকের যেমন 'আমি' বুদ্ধি আছে যখন আত্মার প্রতি সেইরূপ 'আমি' বুদ্ধি হইবে (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ যে আত্মার কথা শুনা যায় 'সেই আত্মাই আমি', এইরূপ জ্ঞান জন্মিবে) তখন শেষোক্ত বুদ্ধির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দেহাত্ম-বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। তখন সেই ব্যক্তি মুক্তির ইচ্ছা না করিলেও মুক্ত হইয়া যায়।

শ্রুতিতে আছে (মুণ্ডক, ২।২।৯)—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে।"

যিনি সেই পরাবরকে দর্শন করেন, তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাদি সংস্কার) বিনষ্ট হইয়া যায়; তাঁহার সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাঁহার (প্রারব্ধভিন্ন) কর্ম্ম সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

পরাবর—'পর' শব্দে হিরণ্যগর্ভাদির পদ বুঝায়। তাহা 'অবর' অর্থাৎ নিকৃষ্ট যাঁহা হইতে, তিনি পরাবর অর্থাৎ পরব্রহ্ম।

হৃদয়গ্রন্থি—হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে যে (চিৎস্বরূপ) সাক্ষীর তাদাত্ম্যাধ্যাস অর্থাৎ আমিই বুদ্ধি এই প্রকার ভ্রমজ্ঞান, তাহা অনাদি কালের অবিদ্যা দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া গ্রন্থির ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে, সেই হেতু তাহা গ্রন্থি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

সংশয়—সংশয়সকল এইরূপ, যথা—আত্মা সাক্ষী অথবা কর্ত্তা, তাঁহার সাক্ষিত্ব সিদ্ধ হইলেও তিনি ব্রহ্ম কি না, তাঁহার ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইলেও তাঁহাকে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় কি না, বুদ্ধির দ্বারা জানা গেলেও তাঁহাকে জানিবামাত্রই মুক্তি হয় কি না ইত্যাদি।

কর্ম্মসমূহ—যে সকল কর্ম্ম এখনও ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করে নাই, অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম আগামী জন্মের কারণ। এই হৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতি তিনটি বস্তু অবিদ্যা-নির্ম্মিত বলিয়া আত্মদর্শনের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

স্মৃতিতেও এই কথা পাওয়া যায়, যথা, (ভগবদ্গীতা, ১৮।১৭)—

"যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।

হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥"

—যাঁহার ভাব অহঙ্কৃত নহে, যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত (অর্থাৎ সংশয় প্রাপ্ত) হয় না, তিনি এই (দৃশ্যমান্) লোকসমূহের হত্যা করিয়াও হত্যা করেন না এবং (তদ্দ্বারা) বদ্ধপ্রাপ্ত হয়েন না।

যাঁহার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মবিদের সত্তা বা স্বভাব অর্থাৎ আত্মা।

অহঙ্কৃত নহে—অহঙ্কারের দ্বারা তাদাত্ম্যাধ্যাস বশতঃ ভিতরে আচ্ছাদিত নহে। অর্থাৎ আমিই কর্ত্তা এইরূপ বুদ্ধি নাই। বুদ্ধি লিপ্ত হয় না—'বুদ্ধির লেপ' বলিতে সংশয় বুঝিতে হইবে।

এই (দুইটির) অভাববশতঃ, তিনি ত্রৈলোক্য বধ করিয়াও বন্ধ প্রাপ্ত হয়েন না। অন্য কোনও কর্ম্মের দ্বারা যে বন্ধ প্রাপ্ত হয়েন না তাহা আর বলিতে হইবে না।

(শঙ্কা)- আচ্ছা, যদি এরূপ হইল তাহা হইলে বিবিদিষা সন্ন্যাসের ফল যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা দ্বারাই ত আগামী জন্ম নিবারিত হইল এবং বর্ত্তমান জন্মের যে অবশেষ আছে তাহার ভোগবিনা ক্ষয় করিবার কাহারও সাধ্য নাই। অতএব বিদ্বৎসন্ন্যাসের প্রয়াসের ফল কি?

(সমাধান)—এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। কেন না বিদ্বৎসন্ন্যাসের ফল জীবন্মুক্তি; সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যেমন বিবিদিষা-সন্ন্যাস-সম্পাদন আবশ্যক সেইরূপ জীবন্মুক্তিলাভের নিমিত্ত বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের সম্পাদন আবশ্যক।

ইতি বিদ্বৎসন্ন্যাস।

জ্ঞান ও ভক্তি সমন্বয়।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার)

১। জ্ঞানী ও ভক্ত।

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞানী ভক্ত নহেন। কিন্তু অজ্ঞানেও ভক্তি থাকিতে পারে না; যেহেতু অজ্ঞানী তমোগুণাচ্ছন্ন। তমোগুণী লোক মূঢ় অর্থাৎ পশুবৎ, সুতরাং জ্ঞানহীনের ভক্তিলাভ অসম্ভব।

জ্ঞানার্থে তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে হইবে। তত্ত্ব শব্দে ভগবৎতত্ত্ব বুঝায়। অতএব যিনি ভগবৎতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাকেই

জ্ঞানী বলে। ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে আর সমুদায়ই অজ্ঞান। গীতায় শ্রীভগবান্ ভক্তের চারিপ্রকার বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥" (৭।১৬)

হে অর্জ্জুন, রোগাদিতে অভিভূত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থাকাঙ্ক্ষী এবং জ্ঞানবান্ এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন। এই শ্লোকে ভগবান্ কেবল মাত্র চারিপ্রকার ভক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার অধিক আর ভক্ত থাকিতে পারে না। এই চারিপ্রকারের মধ্যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই তিন প্রকার ভক্তই হৈতুক অর্থাৎ সকাম; কেবল জ্ঞানীই নিষ্কাম অর্থাৎ অহৈতুক ভক্ত। যেহেতু জ্ঞানীর ভগবৎতত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা ব্যতিরেকে অন্য কোনও কামনা নাই। অতএব কেবল জ্ঞানী ব্যতীত প্রকৃত অহৈতুকী পরাভক্তি লাভের আর কেহই অধিকারী নহেন। শ্রীভগবান্ পুনরায় জ্ঞানী ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন :—

"উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥" (গীতা—৭।৬)

ইঁহারা সকলেই মহান্; কিন্তু আমার মতে জ্ঞানী আমারই স্বরূপ, যেহেতু মদেকচিত্ত সেই জ্ঞানী সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। এথানে ভগবানের অভিপ্রায় এই যে অপর তিনটি ভক্তও শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু জ্ঞানী তাঁহারই স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানী ও তিনি এক। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি কিরূপে অভক্ত হইবেন?

আবার কেহ বা জ্ঞানীকে শুষ্ক ও কর্কশ এবং প্রেমহীন বলিতেও সঙ্কুচিত হন না। এই শ্রেণীর লোকেরা জ্ঞান শব্দের কি অর্থ করেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই স্থানে জ্ঞানীভক্ত "কবীরের" একটি দোঁহা মনে পড়িল।

"পানিমে রহতু মীন্ পিয়াসিরে
শুনতু শুনতু লাগে হাঁসিরে।"

অর্থাৎ সাগর জলে মৎস্য ডুবিয়া থাকিয়াও যে তাহার জল পিপাসা মিটে না একথা শুনিলে হাসি পায়। বাস্তবিকই কি ইহা হাসিবার কথা নহে? যে ব্যক্তি প্রেমার্ণব, সচ্চিদানন্দ ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি কিরূপে কর্কশ ও প্রেমভক্তিহীন হইবেন, এ বড় বিচিত্র কথা সুতরাং অশ্রদ্ধেয়। আবার কোন কোন ভক্ত বলেন যে, ভক্তই কেবল ভক্তির অধিকারী অপর কেহই নহেন; অর্থাৎ "জ্ঞানী" বা "যোগীর" ভক্তিতে অধিকার নাই। এখন দেখা যাক্ যে, জ্ঞানী ও যোগী কাহার সাধনা করেন? ভক্তেরা বলেন, যে "জ্ঞানী" পরব্রহ্মের উপাসক; আর "যোগী' পরমাত্মার সাধক। কেবল ভক্তই শ্রীভগবানের ভজনা করেন। তাহা হইলে "পরব্রহ্ম", "পরমাত্মা," ও "ভগবান্" তিনটি স্বতন্ত্র পদার্থ হইতেছেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন:—

> "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
> অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥" (১০।২০)

হে অর্জ্জুন, আমিই ভূতগণের অন্তরে অবস্থিত পরমাত্মা এবং আমিই ভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্ত। এই শ্লোকের মর্ম্মানুসারে তাহা হইলে পরমাত্মায় ও শ্রীভগবানে আর পার্থক্য রহিল না। সুতরাং "যোগী" পরমাত্মারূপে সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানেরই উপাসনা করেন ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। নিম্নে শ্রেষ্ঠভক্তিগ্রন্থ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম:—

> "অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ।
> ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥
> জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনে বশে;
> ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এইরূপ বুঝা যায় যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্ব। অর্থাৎ অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান্ই শ্রীকৃষ্ণ। ভাগবৎ বলিয়াছেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই তিন প্রকার সাধনায়, সেই অদ্বিতীয়, গুণাতীত পরব্রহ্মই ব্রহ্ম,

আত্মা ও ভগবান্ এই তিনরূপে প্রকাশিত হন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, "জ্ঞানী" ও "যোগী" ইঁহারা উভয়েই সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানেরই উপাসক। জ্ঞান, যোগ, ও ভক্তি, তিনটী স্বতন্ত্র পথ মাত্র কিন্তু গন্তব্য স্থান তিনেরই এক। "জ্ঞানী" ও "যোগী" যদি ভগবানের উপাসকই হইলেন তবে তাঁহারা ভক্তিহীন হইবেন কিরূপে? কারণ, যিনি যে পথই অবলম্বন করুন, ভক্তিশূন্য ভগবৎ উপাসনা কখনই হইতে পারে না। যদি কেহ "সোনার পাথরবাটী" বলিতেও কুণ্ঠিত না হন তত্রাচ ভক্তিহীনের ভগবৎ সাধনা কথনই সম্ভব নহে—ইহা সকল প্রকার যুক্তি ও তর্কের বহির্ভূত। শ্রীভগবান্ গীতায় যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন :—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানীভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥" (৬।৪৬)

যোগী তপঃপরায়ণগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞানবান্‌দিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, (ইষ্টপূর্ত্তাদি) কর্ম্মপরায়ণ জনগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার অভিমত; অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। এ শ্লোকে ভগবান্ যোগীর স্থান সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু যোগী মাত্রেই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা নহে, এই হেতু যোগীদিগের মধ্যে আবার কে শ্রেষ্ঠ তাহা বলিতেছেন—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" (৬।৪৭)

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাতে অর্পিত চিত্ত দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, তিনি সকল যোগীর মধ্যে যুক্ততম অর্থাৎ অতি শ্রেষ্ঠ যোগী, ইহা আমার অভিমত। অতএব ভক্তিহীন যোগী শ্রেষ্ঠ নহেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবান্ গীতায় ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। আবার এখানে "ভক্তযোগীকে"ও শ্রেষ্ঠ বলিলেন, সুতরাং প্রকৃত ভক্ত হইতে হইলে "যোগী" ও "জ্ঞানী" উভয়ই হইতে হইবে। কারণ, কর্ম্মযোগই জ্ঞানার্জ্জনের সোপান এবং জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত পরাভক্তি লাভ হওয়া সম্পূর্ণ দুর্ল্লভ। যোগ বলিলে কেহ যেন

একটা কিম্ভূতকিমাকার জটিল কর্ম্ম বলিয়া বুঝিবেন না। "যোগ" শব্দের অর্থ একটিতে আর একটি যোজনা করা মাত্র। মনকে সম্পূর্ণ-রূপে কেবলমাত্র ভগবচ্চিন্তায় আবিষ্ট করার নাম যোগ। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥" (২।৫০)

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানযোগী ইহজন্মেই সুকৃত ও দুষ্কৃত ত্যাগ করেন; অতএব তুমি তৎসাধনার্থ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ যোগে যুক্ত হও। নিষ্কাম-কর্ম্মে কুশলতাই যোগ। এক্ষণে দেখা গেল যে, জ্ঞানী ও যোগী উভয়েই শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

(২) জীব ও ব্রহ্ম।

যে সকল ভক্ত্যাভিমানী ব্যক্তি জ্ঞানীকে অভক্ত বলেন, তাঁহারা জ্ঞানার্থে বোধ হয় "সোহহং" জ্ঞান বুঝেন। কিন্তু "সোহহং" জ্ঞান নহে। জ্ঞানের পরাবস্থা, তখন জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা কেহই থাকে না, যেমন "নুনের পুতুল সমুদ্র মাপিতে গিয়া আর ফিরিল না" তদ্রূপ। তাঁহারা আরও বলেন যে জীব কখনই ব্রহ্ম হইতে পারে না, একথা বলিলেও অপরাধ হয়। কারণ জীব চিরকালই জীব থাকিবে, জীব ও ব্রহ্মে একত্ব সম্পূর্ণ অসম্ভব। একথা কতকটা সত্য। যেহেতু জীবাবস্থা অবশ্যই ব্রহ্ম নহেন এবং হইতেও পারেন না। "ব্রহ্মই" নিজ মায়াবশে আপনাকে প্রকটিত করিয়া জীব উপাধি ধারণ করেন। গুটিপোকা যেমন নিজ লীলায় আবৃত হইয়া নিজেই বদ্ধ হয়, সেইরূপ মায়াতীত ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় জীব সাজেন মাত্র, নতুবা জীব বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" শাস্ত্রেও আছে, "মায়ামুগ্ধ জীব মায়ামুক্ত শিব"। যথা—

"তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবাত্তু তণ্ডুলঃ।
মায়াবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ মায়ামুক্তো সদাশিবঃ ॥"

বেদান্ত বলেন, মায়াবৃত ব্রহ্মই জীব, আবার মায়ামুক্ত হইলেই স্বস্বভাবে

অবস্থিত হন। তখন তিনি নিজেই বলেন "সোঽহম্"—আমি সেই। অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম—মায়াবশে যাহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম এখন তাহাই জ্ঞাত হইয়াছি অতএব "সোঽহম্"। সুতরাং সোঽহম্ শব্দে জীব ব্রহ্ম হয় ইহা বুঝায় না। যেমন "রজ্জুসর্প ভ্রম"। ভ্রমবশতঃ রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু ভ্রম দূর হইলে রজ্জু রজ্জুই থাকে, সর্প অবশ্যই রজ্জুতে পরিণত হয় না। সেইরূপ "শুক্তিতে রজত ভ্রম" অর্থাৎ ভ্রমান্তে যে শুক্তি সেই শুক্তিই থাকে। রজত কখনই শুক্তি হয় না; সুতরাং জীবভাবে ব্রহ্মত্ব নাই।

কেহ কেহ বলেন জীব অনাদি; কিন্তু যাহার আদি নাই তাহার উৎপত্তিও নাই এবং যাহার উৎপত্তি নাই তাহার বিনাশও নাই। কিন্তু জীবের উৎপত্তি ও নাশ অপরিহার্য্য। যথা—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" (২।২৭)

যেহেতু জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত, এবং মৃতের জন্ম নিশ্চিত।

গীতায় শ্রীভগবান্ জীবের উৎপত্তির ক্রম এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥" (৩।১৪-১৫)

ভূত সকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, অন্ন মেঘ হইতে, মেঘ যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে, কর্ম্ম বেদ হইতে ও বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, এবং সেই সর্ব্বগত ব্রহ্ম সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখন উপর হইতে পর্য্যায় ক্রমে দেখিলে দেখা যায় যে ব্রহ্ম হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি হয়। সুতরাং সমুদয় উৎপন্ন বা সৃষ্ট বস্তুর আদি বা মূল কারণ একমাত্র সেই "পরব্রহ্ম" ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব জীবের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই সেই অদ্বিতীয় গুণাতীত ব্রহ্ম। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ভূত সকল অনাদি বা নিত্যবস্তু নহে. তবে তাহার

উৎপত্তিস্থান অনাদি ও নিত্য বটে। কিন্তু যে কোন কালে বা যে কোনও রূপেই হউক, জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া ব্রহ্মত্ব অনিবার্য্য। অতএব "সোঽহং" বাক্যে অপরাধ নাই। যেহেতু জীবকে ব্রহ্ম বলা হইতেছে না।

(৩) "ব্রহ্ম" জ্যোতি মাত্র নহেন।

এক শ্রেণীর ভক্তদিগের "ব্রহ্ম" শব্দের বুৎপত্তি অতি অপূর্ব্ব। তাঁহারা বলেন যে "ব্রহ্ম বস্তুটি" ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি বা জ্যোতি মাত্র; সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্তেরাও তাহাই বলেন। তবেই ত ঘোর বিপদ! এইখানেই "নিগুর্ণ ব্রহ্ম" লোপ হইলেন। এখন দেখা যাক্ যে তাঁহারা এই "অঙ্গকান্তি" কোথায় পাইলেন? প্রভুপাদ কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁহার "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থে ব্রহ্মসংহিতা হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই নিম্নে পুনরুদ্ধার করিলাম। যথা—

> "যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
> কোটিষশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
> তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
> গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

> "কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডেতে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
> সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥
> সে গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি।
> তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি॥"

যদিও গোস্বামী ঠাকুরের এ ব্যাখ্যাও অসঙ্গত নহে, কিন্তু "ব্রহ্ম" গোবিন্দের অঙ্গকান্তি মাত্রই হইলে, তাঁহার নিগুর্ণত্ব লোপ হয় অর্থাৎ "নিগুর্ণ ব্রহ্ম" বলিয়া আর কিছুই থাকে না; কিন্তু নিম্নলিখিত মত ব্যাখ্যা করিলে বোধ হয় সে দোষ থাকে না। যথা—"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার প্রভা হইতে প্রাদুর্ভূত এবং অশেষকোটি বসুধাদি পৃথক্

পৃথক্ বিভূতিরূপে যিনি অধিষ্ঠিত সেই অনন্ত ও অশেষভূত নিষ্কল ব্রহ্ম আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" এখানে "নিষ্কল ব্রহ্মই" আদিপুরুষ গোবিন্দ বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের ব্যাখ্যার "ব্রহ্ম" ও "গোবিন্দ' দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ এবং ব্রহ্ম বস্তুটি গোবিন্দ অপেক্ষা হীন বুঝাইতেছে। এখন দেখা যাক্, শাস্ত্র সকল ব্রহ্মকে কি বলিয়া নমস্কার করিতেছেন —

"অচিন্ত্যচিন্ত্যরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

যিনি চিন্তাতীত এবং চিন্তায় বিষয়ীভূত উভয়ই বটে, নির্গুণও বটে, সগুণও বটে এবং সমস্ত জগতের আধারস্বরূপ মূর্ত্তি সেই ব্রহ্মকে নমস্কার। ব্রহ্ম যদি চিন্তাতীত বা গুণাতীত হন তাহা হইলে তিনি কখনই "অঙ্গকান্তি" বা "জ্যোতি মাত্র" হইতে পারেন না। "জ্যোতি" বা "কান্তি" উভয় পদার্থ ই সগুণ, সুতরাং চিন্তা বা ধারণার বিষয়ীভূত, অতএব ব্রহ্ম অচিন্ত্য বা নির্গুণ নহেন। অঙ্গকান্তি বা রূপ হ্রাস-বৃদ্ধিযুক্ত নশ্বর পদার্থ মাত্র ; তাহা হইলে আর তিনি অবাঙ্মনসগোচর নিত্যবস্তু নহেন। ব্রহ্মের স্বরূপ যে কি তাহা আমি আর বুঝাইতে চেষ্টা করিব না যেহেতু আমাদের সর্ব্বশাস্ত্রেই তাঁহার বর্ণনা আছে। তবে বৈষ্ণব ভক্তেরা "জ্যোতি বা অঙ্গকান্তিকে" কিরূপে যে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই একটু বিচার্য্য। এই স্থানে "ব্রহ্মস্তোত্রম্" হইতে দুইছত্র উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

"যোগিনো যং হৃদাকাশে প্রণিধানেন নিষ্কলং।
জ্যোতিরূপং প্রপশ্যন্তি তস্মৈ শ্রীব্রহ্মণে নমঃ॥"

অর্থাৎ যোগিগণ হৃদাকাশে যাঁহাকে নিষ্কল জ্যোতিস্বরূপে প্রণিধান (উপলব্ধি) করেন সেই শ্রীব্রহ্মকে আমি নমস্কার করি। ইহাতে জ্যোতিই যে "ব্রহ্ম" তাহা বুঝাইতেছে না, ব্রহ্মের জ্যোতিই বুঝায়। অতএব গুণাতীত "ব্রহ্ম" যে কেবল "অঙ্গকান্তি" বা "জ্যোতি" মাত্র নহেন তাহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসক তাঁহাদিগেরও ধ্যেয় বস্তু আবশ্যক কিন্তু নিরাকারের ধ্যান সম্ভব নহে,

অথচ তাঁহারা স্থূল মূর্ত্তিরও ধ্যান করিবেন না। সুতরাং তাঁহারা স্থূলও নহে এবং একেবারে ধারণার বহির্ভূত নহে, এমন কোন সূক্ষ্ম পদার্থকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন, তাই বোধ হয় "জ্যোতি"-ধ্যান ব্যবস্থা আছে। অনুমান হয়, সম্ভবতঃ যোগীদিগের এই জ্যোতিধ্যানকেই বৈষ্ণবেরা ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নিরূপণ করিয়া "ব্রহ্মকে" একটা অকিঞ্চিৎকর পদার্থে পরিণত করিয়াছেন সুতরাং এরূপ "ব্রহ্ম" যে শ্রীগোবিন্দ হইতে অনেক হীন পদার্থ তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

(৪) সমন্বয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় দেখান মাত্র, দ্বন্দ্ব নহে। শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহেন। পৃথক্ করিলে তাঁহার পূর্ণতা থাকে না। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ পূর্ণ নহেন, যেহেতু ঐশ্বর্য্য মাত্রই সগুণ পদার্থ। সুতরাং হ্রাসবৃদ্ধি ও ক্ষয়যুক্ত। কিন্তু ব্রহ্ম অক্ষয় বলিয়াই তিনি পরিপূর্ণ; অতএব ব্রহ্ম ব্যতীত সকল গুণশালী উপাধিই অপূর্ণ। শ্রীভগবান্ সগুণও বটেন আবার নির্গুণও বটেন —তাঁহার দুই অংশ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। সগুণ পদার্থ মাত্রই তাঁহার ব্যক্তাবস্থা আর অব্যক্তাবস্থাই তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ। তাহাই গীতায় বলিয়াছেন—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" (৭।৪-৬)

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আমার প্রকৃতি এই অষ্টরূপে বিভক্ত। হে মহাবাহো, ইহা কিন্তু অপরা (অর্থাৎ জড় বলিয়া নিকৃষ্টা), ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য একটী জীবস্বরূপ অর্থাৎ চেতনাময়ী আমার প্রকৃতি অবগত হও, যে প্রকৃতি এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে। পুনরায় বলিয়াছেন যে—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥" (১০।৪২)

অথবা হে অর্জ্জুন, এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ বহুজ্ঞানে তোমার আবশ্যক কি? আমি সমস্ত জগৎ আমার একাংশ মাত্র দ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি। সুতরাং ভগবান্ ও ব্রহ্মে কিছুমাত্র তারতম্য নাই। কেবল অবস্থাভেদ মাত্র। অতএব ব্রহ্ম, ভগবান্ ও পরমাত্মা তিনই এক বস্তু এবং জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত একেরই উপাসক। উপাসক মাত্রই ভক্ত। এইরূপ জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিতেও কোন বিরোধ দেখা যায় না। যেহেতু কর্ম্মযোগে জ্ঞান, জ্ঞানে ভক্তি এবং ভক্তিতেই মুক্তি লাভ হয়। পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি একই অবস্থা। যিনি প্রকৃত ভক্ত তিনিই "জ্ঞানী", আবার যিনি জ্ঞানী তিনিই "ভক্ত"।

সমালোচনা।

তত্ত্বজ্ঞানামৃত।

তত্ত্বজ্ঞানামৃত নামক বৃহৎ দার্শনিক গ্রন্থখানি চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীকরালপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাণপুর নিবাসী। গ্রন্থখানি অদ্বৈত মতাবলম্বী সাধক ও পাঠকবর্গের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করিবে এবং তাঁহাদিগের মতের পরিপোষকরূপে সাধারণতঃ ব্যবহারে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। এরূপ বৃহৎ আয়তনে ও ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকে শাস্ত্রীয় অনেক প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইবার অবসর পাইয়াছে এবং অনেক স্থলেই নানা জটিল যুক্তি ও তর্ক সম্বলিত হইয়া পুস্তকখানি অদ্বৈত "একদেশদণ্ডী" মতের একখানি বিশদ আলোচনাগ্রন্থের রূপ ধারণ করিয়াছে। গ্রন্থকারের বৈদিকশাস্ত্রজ্ঞান প্রচারে এবং

ব্যাখ্যানে এরূপ অসাধারণ উদ্যম ও কৃতিত্ব সহজেই পাঠকের মনকে অভিভূত করে এবং তজ্জন্য তিনি যথার্থই সকলের ধন্যবাদার্হ। ভারতবর্ষ এককালে যেমন নানা দর্শন ও জ্ঞানের আলোচনার অধিষ্ঠানভূমি ছিল, এখন তেমনি নানারূপ অবস্থা ও ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে তাহাকে তাহার সেই প্রাচীন জ্ঞানানুশীলন হইতে বিরত ও পরাঙ্মুখ থাকিতে হইয়াছে। নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এখনও যে ক্বচিৎ কোনও বহুদর্শী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞানদর্শনাদির চর্চ্চা করিতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বতন দেবপ্রতিম ঋষি ও জ্ঞানিগণের বহুপুণ্যের ফলস্বরূপই বুঝিতে হয়। আমরা আজ শ্রীযুক্ত করালপ্রসন্ন বাবুকে ভারতীয় সেই সনাতন সদ্ধর্ম্মের রক্ষণ-কল্পে লেখনীচালন করিতে দেখিয়া বাস্তবিকই আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতেছি। সনাতন উচ্চচিন্তা ও ভাব হইতে বিশ্লিষ্ট নানা ভ্রান্তিসঙ্কুল মতের বিলাসলীলায় মুহ্যমান আমাদের বর্ত্তমান দেশবাসিগণকে করালপ্রসন্ন বাবুর এই প্রীতি ও ভক্তির দান বড়ই মূল্যবান্ ও বড়ই সময়োচিত হইয়াছে। প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির বিশদ সমালোচনা করিবার স্থান ও অবসরের অভাব সুতরাং এই পুস্তকে কোন্ কোন্ বিষয় মুখ্যতঃ আলোচিত হইয়াছে তাহার অল্প পরিচয় দিয়া আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

পুস্তকের প্রথম খণ্ডের প্রথম পাদে বিদ্যার ভেদ বর্ণনাপূর্ব্বক অষ্টাদশ প্রস্থানের তথা ষট্ নাস্তিক দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপরে ন্যায়শাস্ত্রঘটিত সুবৃহৎ প্রবন্ধ, তন্মধ্যে দুই খানি ন্যায়ের পুস্তক হইতে বহুল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। চিদ্ঘনানন্দ কৃত 'ন্যায়প্রকাশ' এবং নিশ্চল দাসকৃত 'বৃত্তিপ্রভাকর' নামক দুইখানি জটিল পুস্তকের সারাংশ ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট। সংস্কৃতানভিজ্ঞ অথচ শাস্ত্রীয় যুক্তিবিচারের স্বরূপনির্ণয়প্রয়াসী কৌতূহলী পাঠকবর্গ ইহার মধ্যে অনেক ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয় পাইবেন। তবে ইহার যুক্তিতর্ক যথাযথ অনুসরণ করিতে হইলে যে পরিমাণ

বুদ্ধিবত্তার প্রয়োজন হইবে তাহা বোধ হয় বিশেষজ্ঞ পাঠক ব্যতীত সাধারণ পাঠকের না থাকিতে পারে। গ্রন্থকার ইহার মধ্যে ন্যায় ও বেদান্ত মতের বৈলক্ষণ্য দেখাইয়া বেদান্তমতে অনুমানের প্রয়োজন কি তাহা বুঝাইয়াছেন। এই স্থলে তিনি সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ অনুমান প্রমাণের যে সুন্দর বিবরণটি আছে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনেক স্থলেই কোনও একটি বিচার যুক্তি ও তর্ক সহায়ে নিষ্পন্ন করিবার পর গ্রন্থকার তৎপরিশেষে একটি করিয়া উপসংহার লিখিয়া দিয়াছেন। এই উপসংহারগুলি বিচারে প্রতিপন্ন জিনিষগুলি বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইয়াছে। ন্যায়োক্ত করণ লক্ষণের বেদান্তমতে বিচার এবং চতুর্থ পাদে বেদান্ত-সিদ্ধান্তানুসারে অজ্ঞান, ঈশ্বর, মোক্ষ প্রভৃতির স্বরূপ-নিরূপণে গ্রন্থকার যেরূপ প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা দর্শনামোদী পাঠকবর্গের স্থিরভাবে পর্য্যালোচনার যোগ্য। তবে গ্রন্থকারের ভাষা বড়ই সংস্কৃতবহুল। যেখানে তিনি অপরাপর লেখক কর্ত্তৃক অনুবাদ ও টীকা টিপ্পনি প্রভৃতির সাহায্য লইয়াছেন সেখানে অবশ্যই নাচার কিন্তু তিনি স্বয়ং যেখানে বুঝাইয়াছেন সে সকল স্থলেও তাঁহার ভাষা অনেকস্থলেই অতি দুর্ব্বোধ্য ও জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে ন্যায়দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদাদিতে বর্ত্তমান ভাব ও ভাষার প্রয়োগ তত সুসিদ্ধ নহে কিন্তু তাই বলিয়া পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষাতে যে তাহাদের মর্ম্মোদ্ঘাটন একেবারেই অসম্ভব এ কথা কেহ স্বীকার করিবেন না। প্রথম খণ্ডের উপসংহার ভাগে মোক্ষের স্বরূপ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদিগণের যে সকল বিপ্রতিপত্তি আছে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পাদে গ্রন্থকার পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্রাদির খণ্ডন করিয়াছেন। তন্মধ্যে মূর্ত্তিখণ্ডন, অবতারের ঈশ্বরত্ব বা ঈশ্বরের অবতারত্ব প্রভৃতি খণ্ডিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে পঞ্চ আস্তিক দর্শনের মত খণ্ডন, তৃতীয় পাদে বৌদ্ধ, জৈন, চার্ব্বাক প্রভৃতির মত নিরসন

করিয়াছেন। অবশ্য বলা বাহুল্য যে এই সকল খণ্ডনাদি তিনি অদ্বৈত বেদান্তমতের সাহায্যেই করিয়াছেন—যেখানে পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞান বিরাজমান সেখানে কোনওরূপ অংশ, কলা বা ইতর মনোবৃত্তি অথবা আংশিক সুখ ও দুঃখময় লোক প্রভৃতিরও স্থান নাই। কিন্তু অদ্বৈতবাদীও যে সাধনার এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপর সকলগুলিকেও স্বীকার করিয়া লইতে পারেন গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকের ৩য় খণ্ডে তদ্বিষয়ক ইঙ্গিতও করিয়াছেন। পক্ষ আস্তিকদর্শনের মত খণ্ডন বিভাগে গ্রন্থকার এমন বিশেষ কোনও আভাস দেন নাই যদ্দারা ঐগুলির একটা যুক্তিসম্মত শ্রেণীবিধান ও পারম্পর্য্য বুঝিবার সহায়তা হইতে পারে। বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনের বহুত্ববাদ এবং ঈশ্বরবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় দর্শন ও সাধনা যে উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তপ্রোক্ত জীবও সৃষ্টির একত্বরূপ পরমার্থতত্ত্বে আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে ভারতীয় চিন্তাসমন্বয়ের ক্ষেত্রে তাহাও যে একটি অনুধাবনযোগ্য বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তদ্বিষয়ে আলোকপাতও করিয়া গিয়াছেন। মনীষী বিজ্ঞানভিক্ষু তন্মধ্যে একজন। ২য় ভাগের চতুর্থপাদে গ্রন্থকার মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান, আর্য্যসমাজী, ব্রাহ্ম ও থিয়সফিষ্টগণের ধর্ম্মমতাদি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। এই স্থলে একটি জিনিষ সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা এই যে বহু বিবদমান তথ্যের একত্র সমাবেশে গ্রন্থকার আত্মবিস্মৃত হইয়া কোথাও অপরের উপর অযথা গালিবর্ষণ করেন নাই—ইহা এযুগের লেখকদেরও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই খণ্ড পাঠ করিলে অদ্বৈত বেদান্তমত কতদূর যুক্তিবিচারসম্পন্ন বা Rationalistic তাহারও প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ করা যায়। ৩য় খণ্ডে গ্রন্থকার কতকটা ২য় খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির সহিত সামঞ্জস্য করিতে গিয়াছেন, যেহেতু ইহাতে পরস্পর বিরোধী মতগুলির মধ্যে একটা সাধনসূচক ঐক্যসূত্রের আবিষ্কারের চেষ্টা দেখা যায়। ইহাতে প্রথমপাদে মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে পুরাণাদি শাস্ত্রের বিরোধ ভঞ্জন পূর্ব্বক কারণব্রহ্মের উপাসনা বিষয়ে মূর্ত্তি প্রতিপাদনের তাৎপর্য্য, উপাসনার

জন্য প্রতীকাদি অবলম্বন এবং অবতারদির তাৎপর্য্যও আনুষঙ্গিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বেদান্ত মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং পূর্ব্বপক্ষের আক্ষেপ ও তৎপরিহার প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে। ৩য় পাদে গুরুশিষ্য-সংবাদচ্ছলে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারী ভেদে অদ্বৈতবাদ বর্ণনে ইনি বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। চতুর্থপাদে বেদের প্রামাণ্যাদি সম্বন্ধে বিচার। কিন্তু এই সকল বিশদ বর্ণনার পরেও আমাদের এক এক সময়ে মনে হয় যে গ্রন্থকার যেন কি একটা বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে গিয়াও সমর্থ হইয়া উঠিলেন না—সেটা বোধ হয় যে প্রথাবলম্বনে তিনি এই পুস্তকখানির রচনা করিয়াছেন তাহারই অসম্পূর্ণতাবিধায় ঘটিয়াছে। আমরা অনেক সময়ে মুখে সমন্বয়বাদী হইলেও অন্তরে অন্তরে ঘোর বৈশিষ্ট্যবাদী। সাধনার প্রথম সোপানে তাহাই ইষ্টানিষ্টসূচক বলিয়া ধর্ত্তব্য—কিন্তু তাই বলিয়া অপরের ধর্ম্মমত ভ্রান্ত অথবা ভ্রান্ত না হইলেও তাহা অধম ও নিম্ন শ্রেণীর এরূপ সরাসর রায় প্রকাশ একান্ত অবিহিত ও প্রকৃত ধর্ম্মসাধনার বিরুদ্ধ। যুক্তিতর্কের প্রয়োগস্থলে তিনি যেমন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন এক্ষেত্রেও সেইরূপ করা অনেকটা বাঞ্ছনীয় ছিল, সন্দেহ নাই। গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে জীবের সংসারগতি, জীবন্মুক্ত প্রসঙ্গ, গুরুশিষ্যের লক্ষণ ও গুরুভক্তি প্রভৃতি বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পাদের উপসংহারে গ্রন্থকার সকল প্রকার সাধনা ও মতবাদাদি যে, হয় পরোক্ষ অথবা অপরোক্ষভাবে জীবকে সেই বেদান্তস্বীকৃত নির্ব্বাণমুক্তির দিকেই লইয়া যাইতেছে এবং সম্পূর্ণভাবে আত্মসংস্থ হওয়া ও আত্মজ্ঞান লাভ করাই যে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও পরম পুরুষার্থ সে কথা সবিস্তারে বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এইরূপে গ্রন্থখানির আদ্যন্ত লেখকের পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিশেষ পরিচায়ক। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানি নানাস্থানে মুদ্রিত হওয়ার গোলমালে এবং অন্যান্য কারণে ইহাতে অনেক বানান সম্পর্কীয় ভুল রহিয়া গিয়াছে। কোনও ভবিষ্যৎ সংস্করণে সেগুলি

শোধিত হইবার সম্ভাবনা। আমাদের প্রার্থনা এই যে ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচারকল্পে করালপ্রসন্ন বাবুর উদ্যম ও কৃতিত্ব আরও বিস্তৃত আকার লাভ করুক এবং তিনি যেন এইরূপে নিজে আচার্য্য শঙ্কর প্রদর্শিত অদ্বৈত মার্গের সাধক হইয়া অপরকেও তদ্ভাবভাবুক হইয়া তদবলম্বনে উৎসাহিত করিতে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য।

গত আগষ্ট মাসের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইবার পর ভগবানের ইচ্ছায় মানভূম ও বাঁকুড়া জেলায় শস্যের অবস্থা অনেকটা ভাল হইয়াছে। আশুধান্য পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কিছু কিছু ঘরেও উঠিতেছে। বরিশাল জেলার অবস্থাও অপেক্ষাকৃত ভাল। তাই আমরা বাগদা, ইন্দপুর, কোয়ালপাড়া, গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া, ভারুকাঠি, গুঠিয়া, কুণ্ডা এবং দেওঘরের কেন্দ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছি। অন্যান্য কেন্দ্র হইতে চাউল বিতরণ কার্য্য চলিতেছে। নিম্নলিখিত কেন্দ্র সমূহে ২৮ শে আগষ্ট হইতে ২৪ শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বিতরিত চাউলের পরিমাণ দেওয়া গেল।

কেন্দ্রের নাম	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
বাগদা	৯৭০	১৯০৸৫
ইন্দপুর	১৮৪	৩৫/৬
কোয়ালপাড়া	১৩৯	১২৸৬
গঙ্গাজলঘাটি	১৪৪	২১৷৭
দত্তখোলা	৪৬৪	৪৭৷৷৯
বিটঘর	৪২৮	৪২/৬
ভারুকাঠি	১৩০	১৯৷৷০
মিহিজাম	৪৯৮	৫৭৸০
ভুবনেশ্বর	১৬৬	৪৪৷৷৬

ঝটিকাপ্রপীড়িত লোকগণের সাহায্যার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্য।

বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে পূর্ব্ববঙ্গে যে ভীষণ লোক-ক্ষয়কারী ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহার বিস্তারিত সংবাদ এখানে পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতে আমরা খুলনার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ২৮শে তারিখে একখানি টেলিগ্রাম পাই—উহাতে তিনি আমাদিগকে ঐ অঞ্চলে সেবাকার্য্য আরম্ভ করিবার নিমিত্ত সেবক পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং উক্ত কার্য্যের জন্য খরচপত্র ও অন্যান্য সাহায্য তাঁহারাই দিবেন এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্ব হইতেই অন্যত্র দুর্ভিক্ষ ও বন্যানিবারণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও বর্ত্তমান কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া ৩০শে সেপ্টেম্বর খুলনায় সেবক প্রেরণ করি। কিন্তু আমাদের সেবক চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, আমাদের হাতে খরচপত্রের ভার দেওয়া হইবে না; তবে আমরা ইচ্ছা করিলে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীনে কার্য্য করিতে পারি। আর যদি আমরা পৃথকভাবে কাজ করিতে চাই তবে বাগেরহাট সবডিভিসনে গিযা কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি। তাঁহার কথামত আমাদের সেবক তথায় গমন করিয়া স্থানীয় সবডিভিসন্যাল অফিসারের সহিত দেখা করিতে তিনি বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট ঐ অঞ্চলে সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং বাহিরের কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই। অগত্যা আমাদের সেবক ৩রা অক্টোবর তারিখে ফিরিয়া আসেন।

কিন্তু তাঁহার মুখে ঐ সব স্থানের ভয়ানক অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া আমরা অবিলম্বে অপর কোন ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে সেবক পাঠাইবার সঙ্কল্প করি এবং ৬ই রাত্রে এক দল ঢাকায় ও আর

এক দল বরিশালে—এই দুই দল সেবক পাঠান হয়। বরিশালের সেবকগণ সংবাদ পাঠান যে উক্ত জেলার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই—কেবল বানরিপাড়া থানার কতকাংশ নষ্ট হওয়ায় তাঁহারা সেখানে বাগ্‌ধা নামক স্থানে একটী কেন্দ্র খুলিয়াছেন। এই কেন্দ্রটী ভালরূপে চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়া এই সেবকদল ফরিদপুরে রওনা হইবেন। কারণ, যে সকল জেলা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ফরিদপুর তাহাদের অন্যতম। জনসাধারণের নিকট হইতে কার্য্য আরম্ভ করিবার মত অর্থ সাহায্য পাইলেই তাঁহারা তথায় কেন্দ্র খুলিবেন।

অন্য যে দলটী ঢাকায় গিয়াছিলেন তাঁহারা তথায় ইতিমধ্যেই কলমা, লতপদী, বজ্রযোগিনী ও কামারখাড়া নামক স্থানে চারিটী কেন্দ্র খুলিয়াছেন। এই চারিটী কেন্দ্রই বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত।

এতদ্ব্যতীত ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন এবং নারাণগঞ্জ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ঝড়ের পরদিন হইতেই সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ঢাকা মিশন গরীব লোকদের গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং যাহাতে সাধারণের স্বাস্থ্যহানি না হয় তজ্জন্য যে সকল হতভাগ্য লোক জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে তাহাদের মৃতদেহের সৎকার করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা ৪২৫টী মৃতদেহ দাহ অথবা কবরস্থ করিয়াছেন। নারাণগঞ্জ সেবাশ্রম ১০টী কেন্দ্র খুলিয়া ক্রয়মূল্যে চাউল বিক্রয় করিতেছেন।

আমরা আমাদের সেবকগণের নিকট হইতে এবং অন্য নানা ভাবে যে সকল সংবাদ পাইতেছি তাহাতে এই একই কথা জানিতে পারিতেছি যে লোকের কষ্টের অবধি নাই। ঝড় যে যে স্থানের উপর দিয়া গিয়াছে সেই সেই স্থানের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উড়াইয়া সকলকেই গৃহহীন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কি গৃহস্থ, কি ব্যবসায়ী যাহার যাহা কিছু সঞ্চিত চাউল ছিল সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভয়ানক অন্নকষ্ট

উপস্থিত। স্থানীয় বাজারে এখনও যে সামান্য পরিমাণ চাউল রহিয়াছে তাহা এরূপ অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে যে গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকদের তাহা ক্রয় করা সাধ্যাতীত। যদি শীঘ্রই এই সকল অঞ্চলে চাউল আমদানী করিয়া সস্তাদরে বিক্রয় করা না হয় তবে লোকেরা নিশ্চয়ই অনাহারে মরিয়া যাইবে!

এরূপক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে লোকদের দুটী দুটী খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। সেইজন্য আমরা স্থির করিয়াছি যে, প্রথমতঃ চাউলের দোকান খুলিয়া ক্রয়মূল্যে উহা বিক্রয় করিব এবং যাহাদের তাহাও ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই সেই সকল গরীব লোকদের বিনামূল্যে চাউল বিতরণ করিব। এই সকল করিয়া যদি হাতে টাকা থাকে তবে আমরা যথার্থ গরীব লোকদিগকে গৃহনির্ম্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য করিবার চেষ্টা করিব।

আমরা এই লক্ষ লক্ষ অন্ন-বস্ত্র-গৃহহীন দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য সহৃদয় দেশবাসীর নিকট আবেদন করিতেছি। তাঁহাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা ইতিপূর্ব্বে যত বার নর-নারায়ণ সেবা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি ততবারই তাঁহারা মুক্ত-হস্ততার পরিচয় দিয়া তাহা উদ্‌যাপিত করিয়াছেন। আশা করি, এবারও তাঁহারা এই মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে:—

(১) সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন, ১নং মুখার্জ্জির লেন, বাগবাজার কলিকাতা।

(২) প্রেসিডেন্ট রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়, হাওড়া।

কলিকাতা,
১৭ই অক্টোবর, ১৯১৯। } (সাঃ) সারদানন্দ।
সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে প্রাপ্তি-স্বীকার।

২রা মে হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত বেলুড়মঠে প্রাপ্ত।

দুঃখিনী ভগিনী, ভাগলপুর, ৫৲
মাঃ হীরালাল দাস, মেকিনসন ৫২৲
শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটী, রেঙ্গুন, ২১০০৲
শ্রীযুত মনোমোহন মুখার্জ্জি, আরামবাগ, ৫৲
,, অনিরুদ্ধ নারায়ণ সিংহ, চিরিয়াকোট, ৫৲
এস. সেকনা, ববাবাঁকী ২৲
শ্রী ভি, কে, এস্, আয়ার, সান্দুর, ১০৶০
,, হরলাল দাস গুপ্ত, ভাগলপুর, ৩৲
,, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মূলকুণ্ডি, ৷০
,, ভবনাথ মুখার্জ্জি, ভাগলপুর, ২৲
,, শচীন্দ্র নাথ মিত্র, গোপালগঞ্জ ১৲
শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটী, সুন্দবদি, ২৲
,, এম, বি, দত্ত, দার্জ্জিলিং, ৩১৲
,, সুরেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত, রাঁচি, ৩৲
,, রোহিণী পালিত, কলিকাতা ১০৲
,, এস, ভি, কালি, জালগাঁও, ২৫৲
শ্রীমতী নিরুপমা দাসী, কলিকাতা ২৲
শ্রীযুত বি, এন, মুখার্জ্জি, ভবানীপুর, ৩৲
,, নন্দলাল ভট্টাচার্য্য, মতিহারী, ৩৲
মাঃ কেদার নাথ গুহ, গোলকণ্ডা ৪৲
শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর রায়, আচলিতা, ১০
ইন্দাস হাই ইংলিশ স্কুল, ১৫৲
শ্রীত্রিগুণাচরণ গুহ, ময়মনসিংহ ৷৶০
,, পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, বরিশাল, ৩৲
,, জে, সি, রায়, বৈতালাবাগ, ৪৲
ভ্রাতৃদ্বয়, কলিকাতা, ২০৲
মাঃ এম, বি, দত্ত, দার্জ্জিলিং ১
টি, দাস, মোরাদাবাদ, ৫৲
,, এ, এল, এম, ডি, মিন্‌স্, সারনাথ ৫
,, জি. সেঠ, জামসেদপুর, ১০৲
,, নকুর চন্দ্র ব্যানার্জ্জি, ভদ্রখালি, ৷০
,, সুরেন্দ্র নাথ দে, ,, ১৲
,, সুরেন্দ্র মোহন ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা, ৷০
,, সত্যচরণ দাস, ,, ৫৲
,, পরেশ নাথ মজুমদার, বকবাণ্ড, ২৲
,, ডি, এন, মুখার্জ্জি, মেসোপটেমিয়া, ৬২৷/০
,, বি, এল, গুপ্ত, বস্‌রা, ১৭১৷০
,, কুমুদ দত্ত, ২৲
,, মিসেস্ এ, বি, ব্যানার্জ্জি, রেঙ্গুন, ১০
,, সুবোধ চন্দ্র গুপ্ত, সালকিয়া, ২৲
,, মোক্ষদা দেবী, কলিকাতা, ২০৲
,, দেবেন্দ্র নাথ সামন্ত, সিরিমলিয়ান ৩৲
মাঃ অমূল্য কুমার চ্যাটার্জ্জি, শান্তিপুর, ৯৷/০
শ্রীচারুচন্দ্র দাস, কলিকাতা, ২৲
,, অশ্বিনী কুমার ঘোষ, পেণ্ড, ১০
,, চণ্ডী চরণ মুখার্জ্জি, কলিকাতা, ১০
,, এইচ, এইচ, মৈত্র হালিখিয়া ২৲
,, রমেন্দ্র নাথ দে, কলিকাতা, ১
,, পান্নালাল সিংহ, ধপ, ১০৲
,, রমেশচন্দ্র বসু, রেহাবাড়ী, ১০৲
,, অন্নদা প্রসাদ মুখার্জ্জি মজিল, ১৩৶০
,, মণীন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি, ঝরিয়া, ৫০৲
,, এন এম মুখার্জ্জি ও তাঁহার বন্ধু, মান্দয়, ৮৲
,, নন্দলাল রাজমাই, ২৲
,, রাখাল চন্দ্র কেলে, জোরহাট, ৫৲

অগ্রহায়ণ, ২১শ বর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত।)

১৭১৯, টার্ক ষ্ট্রীট,
সান্‌ফ্রান্সিস্কো।
২৮শে মার্চ্চ, ১৯০০।

প্রিয় নিবেদিতা,

আমি তোমার সৌভাগ্যে খুব আনন্দিত হলাম। আমরা যদি লেগে পড়ে থাকি, তবে অবস্থাচক্র ফিরবেই ফিরবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার যত টাকার দরকার তা এখানে বা ইংলণ্ডে পাবে।

আমি খুব খাট্‌ছি আর যত বেশী খাট্‌ছি, ততই ভাল বোধ কচ্ছি। শরীর অসুস্থ হয়ে আমার একটা বিশেষ উপকার করেছে, নিশ্চিত বুঝ্‌তে পারছি। আমি এখন ঠিক ঠিক বুঝ্‌তে পারছি অনাসক্তি মানে কি, আর আমার আশা—অতি শীঘ্রই আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হব।

আমরা আমাদের সমুদয় শক্তি একদিকে প্রয়োগ করে একটা বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ি—এই ব্যাপারেরই অপর দিক্‌টা উহারই মত কঠিন, যদিও উহা নেতি-ভাবাত্মক—সেটার দিকে আমরা খুব কম মনোযোগই দিয়ে থাকি—সেটা হচ্ছে—মুহূর্ত্তের মধ্যে কোন বিষয় থেকে অনাসক্ত হবার—তা থেকে নিজেকে আলগা করে নেবার—শক্তি।

এই আসক্তি ও অনাসক্তি—উভয় শক্তিই যখন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠে, তখনই মানুষ মহৎ ও সুখী হতে পারে।

আমি —র দানের সংবাদ পেয়ে যে কি সুখী হলাম, তা কি বল্‌বো। * * সবুর কর, তাঁর ভিতর দিয়ে যা কার্য্য হবার, সেইটা এখন প্রকাশ হচ্ছে। তিনি জান্‌তে পারুন বা নাই পারুন, রামকৃষ্ণের কার্য্যে তাঁকে এক মহৎ অংশ অভিনয় কর্ত্তে হবে।

তুমি অধ্যাপক —র যে বিবরণ লিখেছ, তা পড়ে খুব আনন্দ পেলাম, জোও একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন (Clairvoyant) লোকের সম্বন্ধে বড় মজার বিবরণ লিখেছে।

সব বিষয় এক্ষণে আমাদের অনুকূল হতে আরম্ভ হয়েছে।

আমার বোধ হয়, এ পত্রখানি তুমি চিকাগোয় পাবে। মিস —র বিশেষ বন্ধু সুইস যুবক ম্যাক্স—র কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছি। মিস —ও আমায় তাঁর ভালবাসা জানিয়েছেন আর তাঁরা আমার কাছে জান্‌তে চেয়েছেন, আমি কবে ইংলণ্ডে যাচ্চি। তাঁরা লিখ্‌ছেন, সেখানে অনেকে ঐ বিষয়ে খবর নিচ্ছে।

সব জিনিষ ঘুরে আস্‌বে। বীজ থেকে গাছ হতে গেলে তাকে মাটির নীচে কিছুদিন থেকে পচ্‌তে হবে। গত দু বছর এইরূপ মাটির নীচে বীজ পচ্‌ছিল। মৃত্যুর করালগ্রাসে পড়ে যখনই আমি ছটফট্‌ করেছি, তখনই তার পরেই সমগ্র জীবনটা যেন প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এইরূপ একবারের ঘটনায় আমায় রামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে এল, আর একবারের ঘটনায় আমাকে যুক্তরাজ্যে নিয়ে এল। এইটাই হয়েছে অন্য সবগুলির মধ্যে বড় ব্যাপার। উহা এখন চলে গেছে—আমি এখন এমন স্থির শান্ত হয়ে গেছি যে, আমার সময়ে সময়ে নিজেরই আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমি এখন সকাল সন্ধ্যা খুব খাটি, যখন যা খুসি খাই, রাত্রি বারটায় শুই, আর কি তোফা নিদ্রা। পূর্ব্বে আর কখনও এমন ঘুমোবার শক্তি লাভ করি নি। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জান্‌বে। ইতি

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত।)

সান্‌ফ্রান্সিস্কো।

৬ই এপ্রিল, ১৯০০।

প্রিয় নিবেদিতা,

শুনে সুখী হলাম, তুমি ফিরেছ—আরও সুখী হলাম তুমি প্যারিসে যাচ্ছ শুনে। আমি অবশ্য প্যারিসে যাব, তবে কবে যাব জানি না।

মিসেস—বল্‌ছেন, আমার এখনই রওনা হওয়া উচিত ও ফরাসী ভাষা শিখ্‌তে লেগে যাওয়া উচিত। আমি বলি, যা হবার হবে, তুমিও তাই কর।

তোমার বইখানা শেষ করে ফেল ও তারপর প্যারিসের কাযটা। * * কেমন আছে? তাকে আমার ভালবাসা জানাবে। আমার এখানকার কায শেষ হয়ে গেছে। আমি দিন পনেরর ভিতর চিকাগোয় যাচ্ছি, যদি সেথায় থাকে। * * ইতি

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত।)

প্লেস দে এতাত ইউনিস, প্যারিস,

২৫শে আগষ্ট, ১৯০০।

প্রিয়—

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম—আমার প্রতি সহৃদয় বাক্যসমূহ প্রয়োগের জন্য তোমাকে বহু ধন্যবাদ জানাচ্ছি। * *

এখন আমি স্বাধীন, আর কোন বাঁধাবাঁধির ভিতর নেই, কারণ, আমি রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যে আর আমার কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব বা পদ রাখি নি। আমি উহার সভাপতির পদও ত্যাগ করেছি।

এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া রামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যদের

হাতে গেল। ব্রহ্মানন্দ এখন সভাপতি হলেন, তার পর উহা প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর ক্রমে ক্রমে পড়্‌বে।

এখন এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, আমার মাথা থেকে এক মস্ত বোঝা নেমে গেল। আমি এখন নিজেকে বিশেষ সুখী বোধ কচ্ছি।

আমি এখন বিশ বৎসর ধরে রামকৃষ্ণের সেবা কল্লাম—তা ভুল করেই হ'ক বা সফলতার ভিতর দিয়েই হ'ক—এখন আমি কার্য্য থেকে অবসর নিলাম।

আমি এখন আর কাহারও প্রতিনিধি নহি বা কাহারও নিকট দায়ী নই। আমার এতদিন আমার বন্ধুদের কাছে একটা বাধ্যবাধকতা বোধ ছিল—ও ভাবটা যেন দীর্ঘস্থায়ী ব্যারামের মত আমায় আঁকড়ে ধরেছিল। এখন আমি বেশ করে ভেবে চিন্তে দেখ্‌লাম—আমি কারুর কিছু ধার ধারি নি। আমি ত দেখ্‌ছি, আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করে তাদের উপকারের চেষ্টা করেছি, কিন্তু তার প্রতিদানস্বরূপ তারা আমায় গালমন্দ করেছে, আমার অনিষ্টচেষ্টা করেছে, আবার বিরক্ত ও জ্বালাতন করেছে। * *

তোমার চিঠি পড়ে মনে হলো, তুমি মনে করেছ যে, তোমার নূতন বন্ধুদের উপর আমার ঈর্ষা হয়েছে। আমি কিন্তু তোমাকে চিরদিনের জন্য জানিয়ে রাখ্‌ছি—আমার অন্য যে কোন দোষ থাক্ না কেন, আমার জন্ম থেকেই আমার ভিতর ঈর্ষা, লোভ বা কর্ত্তৃত্বের ভাব নেই।

আমি পূর্ব্বেও তোমাকে কোন আদেশ করি নি। এখন ত কাযের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই—এখন আর কি আদেশ দেবো? কেবল এই পর্য্যন্ত আমি জানি যে, যতদিন তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে মায়ের সেবা কর্ব্বে, ততদিন তিনিই তোমাকে ঠিক পথে চালিয়ে নেবেন।

তুমি যে কোন বন্ধু করেছ, কারো সম্বন্ধে আমার কখন ঈর্ষা

হয় নি। কোন বিষয়ে মেশ্বার জন্য আমি কখনও আমার ভাইদের সমালোচনা করি নি। তবে আমি এটা দৃঢ়বিশ্বাস করি যে, পাশ্চাত্য জাতিদের একটা বিশেষত্ব এই আছে যে, তারা নিজেরা যেটা ভাল মনে করে, সেটা অপরের উপর জোর করে চাপাবার চেষ্টা করে, ভুলে যায় যে, একজনের পক্ষে যেটা ভাল, অপরের পক্ষে সেটা ভাল নাও হতে পারে। আমার ভয় হোতো যে, তোমার নূতন বন্ধুদের সঙ্গে মেশার ফলে তোমার মন যে দিকে ঝুঁক্‌বে, তুমি অপরের ভিতর জোর করে সেই ভাব দেবার চেষ্টা কর্‌বে। কেবল এই কারণেই আমি কখন কখন কোন বিশেষ লোকের প্রভাব থেকে তোমায় তফাত রাখ্‌বার চেষ্টা করেছিলাম, এর অন্য কোন কারণ নেই। তুমি ত স্বাধীন, তোমার নিজের যা পছন্দ তাই কর, নিজের কায বেছে নাও। * *

আমি এইবার সম্পূর্ণ অবসর নিতে ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, মায়ের ইচ্ছা,—আমি আমার আত্মীয়বর্গের জন্য কিছু করি। ভাল, বিশ বছর পূর্ব্বে আমি যা ত্যাগ করেছিলাম, তা আমি আনন্দের সহিত আবার ঘাড়ে নিলাম। বন্ধুই হোক, শত্রুই হোক, সকলেই তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে সুখ বা দুঃখের ভিতর দিয়ে আমাদের কর্ম্মক্ষয় করবার সাহায্য কর্‌ছে। সুতরাং মা তাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমার ভালবাসা আশীর্ব্বাদাদি জান্‌বে। ইতি

তোমার চিরস্নেহাবদ্ধ,
বিবেকানন্দ।

জাতীয় জীবনে কর্ম্ম ও বৈরাগ্য। *

(শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার)

সাহিত্যে সময় সময় অনেক অদ্ভুত রকমের মতবাদের প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকিলেও, ইতিহাসের সাক্ষ্য সমর্থন না করিলেও, সাধু ভাষার ছটায় ও ভাবের সৌন্দর্য্যে অনেক সময় কাল্পনিক সৃষ্টিও ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রচারিত হয়। সাহিত্য বাস্তবজীবনের হুবহু নকল নয়। বাস্তবজীবনের সম্ভাবিত ছায়াও সাহিত্যের একমাত্র উপাদান নয়। তাহার অন্তরালে যে ছায়াময় একটা কল্পনার জগৎ রহিয়াছে—সাহিত্য সেই অব্যক্ত জগতের সত্যঃসৃষ্টিও বটে। কল্পনার জগতে মানুষের গতিবিধি সহজভাবে সম্পন্ন হয়। কঠোরমূর্ত্তি সত্য সেখানে পুলিশের সাজ পোষাক লইয়া তাহার স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দেয় না। কাজেই সাহিত্যে নানা রকমের অদ্ভুত মত গঠন সহজ হয়। কিন্তু অতীত কিংবা বর্ত্তমানের বাস্তবজীবন সম্বন্ধে কোন মতবাদ গঠন করিয়া তাহাকে যদি কঠিন সত্যের নিগড়ে আবদ্ধ করা না হয়—ইতিহাসের সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না করিয়া যদি শুধু ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া প্রচার করা হয়—তবে সত্যের অপলাপ হয়।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ অনেক মতবাদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। একটী মতবাদ আমাদের জাতীয় জীবনের স্বরূপ ও ইতিহাস লইয়া গঠিত। এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের মত এই যে আমাদের জাতীয় জীবন কর্ম্মবিমুখ বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈরাগ্য জাতীয় জীবনের কর্ম্মবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া তাহার বিকাশের পথরোধ করিয়াছে। আমরা চিরকাল বৈরাগ্য অবলম্বন

* বিবেকানন্দ সোসাইটীর মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

করিয়া পরকালের ভাবনায় জর্জ্জরিত রহিয়াছি। বাস্তবজীবনের প্রতি—ইহকালের কর্ম্মজগতের প্রতি যথেষ্ট আস্থা প্রদর্শন করি নাই। তাই আজ আমরা জগতে অতি হীন দুর্ব্বল অশক্ত ও অক্ষম জাতি। এই বৈরাগ্যরূপ অন্তঃশত্রুই আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতনের মূল কারণ এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিপন্থী।

বর্ত্তমান জগতে আমরা যে অধঃপতিত জাতি, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের কাছে এখন এই সত্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই শোচনীয় অধঃপতনের একটা জবাবদিহি করা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া দাড়াইয়াছে। অন্ততঃ আর কোন কারণে না হউক, নিজের মনকে প্রবোধ দিবার জন্যও এরূপ জবাবদিহির বিশেষ আবশ্যকতা ও সার্থকতা আছে। জবাবদিহির চেষ্টাও একপক্ষেত্রে স্বাভাবিক। বর্ত্তমান অতীতেরই ফল। অতীতের দোষেই বর্ত্তমানের অধঃপতন। অতীত জীবনের কোন্ অমার্জ্জনীয় দোষে বর্ত্তমানের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহারই অনুসন্ধান ও আবিষ্কার আবশ্যক।

যে অসংখ্য কার্য্যকারণপরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাতে আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি, বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা সেই দুর্ভেদ্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিবার অনুরূপ সত্যনিষ্ঠা, সামর্থ্য ও সাধনা আমাদের নাই। ঐতিহাসিক বিচারে আমাদের রুচি নাই। জাতীয় জীবনের প্রকৃত ইতিহাস আমরা পাই নাই বলিয়া, তাহার অভিব্যক্তির পূর্ণ মূর্ত্তিটী আমাদের মানস-দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রকৃতি ও গতি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণা গঠন করিবার আমরা অবসর পাই নাই। বুদ্ধির কণ্টকাকীর্ণ কুটিল পথে না চলিয়া—আমরা কল্পনার ঋজুপথ অবলম্বন করিয়াছি। কল্পনা-উদ্ভাসিত মানসপটে যার যার পছন্দ মত জাতীয় জীবনের ছবি আঁকিয়া আমরা তাহার দোষাবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আলোচ্য মতবাদ এইরূপ আবিষ্কারের ফল। ছবি যেমন আমাদের কল্পিত দোষও তেমনই কল্পিত। জাতীয় জীবনের বৈরাগ্যের উপর

অধঃপতনের দোষ চাপাইয়া দিয়া আমরা জবাবদিহির দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ফলে আমাদের সহজবুদ্ধি এত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে আমরা কিছুই সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। সহজ বিষয়ও মস্ত মস্ত মতবাদের সাহায্য ভিন্ন আমাদের বোধগম্য হয় না। সাধারণ বিষয়েও আমরা এমন সব গম্ভীর তত্ত্বের অবতারণা করি—কোনমতে মিল বা স্পেন্সারের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এমন জটিলতার সৃষ্টি করি কিংবা সাংখ্য ও বেদান্তের ঝড় তুলিয়া আমাদের চিত্তকে এমনই অভিভূত করিয়া দিই যে, আমাদের স্বাভাবিক সহজবুদ্ধি ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে আলোচনায় আমাদের এই দার্শনিকতার অভ্যাসটী আরও বিশেষ করিয়া প্রবল হয়। আলোচ্য মতবাদও এইরূপ দার্শনিকতারই ফল। আমাদের সহজবুদ্ধি আমাদের জীবনে বৈরাগ্যের অনুচিত প্রভাব দেখিতে পায় না।

কাল্পনিকতার প্রভাবে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ না করিয়াও দুই চারিটী তথ্য জানিয়াই আমরা দার্শনিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে ব্যস্ত হই। নব্যবাঙ্গালার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভেই এইরূপ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমবাবু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—পাশ্চাত্যেরা চিরকাল ইহকালকে চাহিয়াছে, তাঁহারা তাহা পাইয়াছে। আমরা চিরকাল চাহিয়াছি "পরলোক"—কিছুই পাই নাই। সেই অবধি কথাটা বাঙ্গালা সাহিত্যের ধুয়া হইয়া রহিয়াছে। সাহিত্যিকগণের তথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে ইহা অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর বঙ্কিমবাবুর প্রভাব অসাধারণ। তাঁহার ন্যায় একজন শক্তিশালী সাহিত্যিকের গম্ভীর ভাবপূর্ণ উক্তিটী যে শাখাপল্লবিত হইয়া বিপুল আকারে আমাদের আলোচ্য মতবাদে পরিণত হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ইহা দার্শনিক স্বরূপ বিশ্লেষণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ধর্ম্ম বা

কর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতায় কোনও জাতিবিশেষের একাধিকার থাকিতে পারে না—ন্যূনাধিক্যবশতঃ বিশিষ্টতা থাকিতে পারে। বিশিষ্টতা একটা জাতির স্বরূপের অংশ মাত্র। ধর্ম্ম থাকিলেই যে কর্ম্ম থাকিবে না কিংবা কর্ম্ম থাকিলেই যে ধর্ম্ম থাকিবে না এরূপ প্রমাণ ত মানুষের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

ইতিহাসও আমাদের সহজ বুদ্ধিরই সমর্থন করে। জাতীয় জীবনের অধঃপতনের প্রারম্ভ হইয়াছে বাঙ্গালা দেশ হইতে। বৈরাগ্যই যদি অধঃপতনের কারণ হয় তবে বাঙ্গালার ইতিহাসে বৈরাগ্যের অনুচিত প্রভাবের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবার কথা। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসে আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, কর্ম্মবিমুখ বৈরাগ্য কখনই বাঙ্গালার মাটিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালাদেশে সন্ন্যাস নাই। বাঙ্গালার শৈব শাক্ত বৈষ্ণব কেহই বৈরাগ্যবাদী নয়। বাঙ্গালার বাউল, ফকির, দরবেশ, তথাকথিত "বৈরাগী"—সকলেই গৃহী। বৌদ্ধধর্ম্ম বৈরাগ্যের ধুয়া ধরিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই ইহা সুনিশ্চিত। প্রেম ও সেবা লইয়াই বাঙ্গালায় অধিষ্ঠান করিয়াছিল। বাঙ্গালাদেশ—বাঙ্গালার সাহিত্য—কর্ম্মবাদী, সেবাবাদী ও ভক্তিবাদী। মোক্ষ-মুক্তি—নির্ব্বাণ বাঙ্গালীর আবিষ্কার নয়। বাঙ্গালার মাটিতে বুদ্ধ ও শঙ্করের জন্ম কল্পনা করা যায় না। বঙ্গমাতা প্রসব করিয়াছেন চৈতন্যদেব। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও চৈতন্যদেব নির্ম্মমভাবে গৃহের সম্বন্ধ ছিন্ন করেন নাই। মাতাপত্নীর তত্ত্ব লইতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দেন নাই। নব্য বাঙ্গালার রামকৃষ্ণমিশনের সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ও বাঙ্গালার এই কর্ম্মবাদ ও সেবাবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এইখানেই বাঙ্গালা দেশের প্রাণ। ইহাকে আর যা কিছু বলিতে পার, কর্ম্মহীন বৈরাগ্য বলিলে সত্যের অপলাপ হয়।

প্রাদেশিক বিশিষ্টতা ছাড়িয়া সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ধরা যাউক। ভারতবর্ষের ইতিহাসেই আমরা কি দেখিতে পাই? জাতীয় জীবনের যে কোন অবস্থায় বা যে কোন সময়ে কর্ম্মশৈথিল্যের বা কর্ম্মবিমুখ

বৈরাগ্যের নিদর্শন পাই কি? রামায়ণ ও মহাভারত কর্ম্মমুখর প্রাচীন ভারতের কর্ম্মচাঞ্চল্যের জীবন্ত ছবি ও অকাট্য প্রমাণ। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের ভারতসাম্রাজ্য স্থাপন বৈরাগ্যের ফল নয়। বৌদ্ধ ভারতের কর্ম্মকাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসের একটী বিশিষ্ট অধ্যায়—তাহার অপলাপ অসম্ভব। কোন কোন মনীষীর মত এই যে, বৌদ্ধযুগের শেষভাগে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির দিনে সমাজে বৈরাগ্যের প্রভাব প্রবল হইয়া সমাজশরীরকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। তাহারই ফলে ভারতবর্ষ ইসলামের করতলগত হয়। এরূপ ধারণা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। পৃথিবীর ইতিহাস এরূপ মতের সমর্থন করে না। পৃথিবীর ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, ইসলামের দৃপ্ত-অসি অত্যল্প সময়ের মধ্যে ইউরোপ বিধ্বস্ত করিয়া অপ্রতিহতগতিতে একটা বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। একমাত্র ভারতবর্ষই ইসলামের গতিরোধ করে। পাঁচশত বৎসরেও ইসলাম ভারতবর্ষ জয় করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ, ইসলাম ভারতবর্ষে পরাজিত হইয়া স্বীয় সাধনার অনুযায়ী স্থান গ্রহণ করিয়াছে। প্রাগ্ বৃটিশ যুগের ইতিহাসও যাঁহারা সহৃদয়তার সহিত পাঠ করিয়াছেন—উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে নিয়তির শেষ আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়াছেন—তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, প্রাগ্ বৃটিশযুগেও জীবনসমরে ক্লান্ত ও অবসন্ন হিন্দুজাতি নিদ্রিত ছিল না। তাহারই কর্ম্মকাহিনী এই যুগের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৈরাগ্যের প্রতিধ্বনি নাই।

ভারতবর্ষের সাহিত্যেই কি কর্ম্মবিমুখতার প্রশ্রয় আছে? ভগবদ্গীতার কর্ম্মের আহ্বান—কর্ত্তব্যের বজ্রকঠোর আহ্বান কে না শুনিয়াছে! পৃথিবীর আর কোন্ জাতি কর্ম্মের এরূপ উচ্চ-আদর্শ গঠন করিতে পারিয়াছে? বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি কোথাও কার্য্যের অবমাননা নাই, কর্ম্মহীন বৈরাগ্যের উপদেশ নাই। যুগযুগান্তরের ভূয়োদর্শন ও সাধনার ফলে ভারতবর্ষ মানবজীবনের সমগ্রতার, পূর্ণতার ও অনন্ত

সম্প্রসারণতার এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শ গঠন করিয়াছে যাহাতে তাহার পক্ষে একদেশদর্শী হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। সঙ্কীর্ণতা, একদেশদর্শিতা ভারতীয় সাহিত্যের কোন বিভাগেই স্থান পায় নাই। ভারতীয় সাহিত্যে যে বৈরাগ্যের আদর্শ আছে তাহা মানবত্বের শ্রেষ্ঠ সাধনার উচ্চতম বিকাশ। ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে তাহার বিরোধ নাই। বস্তুতঃ, কর্ম্মজগতের প্রতি আস্থা না থাকিলে হিন্দুজাতি কবেই উৎসন্ন হইয়া যাইত! হিন্দুজাতির জ্ঞান কখনই এরূপ সাংঘাতিক ভাবে বিপর্য্যস্ত হয় নাই। তবে ব্যবহারিক জগৎ, ভোগের জগৎ, কর্ম্মের জগৎ তার কাছে চরম সত্য নয়,—মানব-জীবন সম্বন্ধে শেষ কথা নয়।

অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর এই তথাকথিত বৈরাগ্যের বোঝা চাপাইয়া দিতেছেন,—ইহা নিতান্তই অনুচিত। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে এদেশে আলোচনা একবারেই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বৈরাগ্যের বিভীষিকা মনে রাখিলে বৌদ্ধধর্ম্মকে বোঝা যাইবে না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণ বৈরাগ্যে নয়—বৌদ্ধধর্ম্মের গতি কর্ম্মে। কর্ম্মগুণেই বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীতে আদরণীয় হইয়াছিল। তাহার কর্ম্মকাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসের বিশিষ্ট কথা। সম্রাট্ অশোক কর্ম্মবাদীই ছিলেন। কর্ম্মের গৌরবেই বৌদ্ধভারত সমুজ্জ্বল।

আলোচ্য মতবাদের সহিত বাস্তবজীবনের কোনই সম্বন্ধ নাই। আমাদের সহজবুদ্ধি যেমন ইহার অনুমোদন করে না, ইতিহাসের সাক্ষ্যও তেমন ইহার সমর্থন করে না। বস্তুতঃ, ইহা আমাদের কাল্পনিকতার, দার্শনিকতার ফল। বর্ত্তমান অধঃপতনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে কল্পনার চেষ্টা মাত্র। ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনের দার্শনিক স্বরূপ বিশ্লেষণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই বৈরাগ্যরূপী শত্রু যেমন সাহিত্যিক সৃষ্টি, তাহার সঙ্গে সংগ্রামও তেমনি সাহিত্যিক। এরূপ বিকৃত সাহিত্য মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে পারে—জাতীয় জীবনের বিকলাঙ্গ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারে—কিন্তু ইহা আমাদিগকে

আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে না, আমাদের সত্যবোধকে জাগ্রত করিয়া তোলে না।

এইরূপ মিথ্যা মতবাদ গঠনের কারণও নব্য বাঙ্গালার জীবনে যথেষ্ট রহিয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষী ভারতীয় সাহিত্যের ধর্ম্মগ্রন্থাদির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছেন, ভারতবর্ষের অত্যধিক প্রশংসাও করিয়াছেন। কেহ বা হিন্দুজাতিকে দার্শনিকের জাতি বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। আমরা তাঁহাদের উদারতায় ও সত্যনিষ্ঠায় বিশ্বাস করিয়াছি, তাঁহাদের প্রশংসা বাণী গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে গৌরব বোধ করিয়াছি। জাতীয় জীবনের আধ্যাত্মিকতার ভাগ—জ্ঞানের ভাগ আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে পাইয়াছি; কিন্তু জাতীয় জীবনের কর্ম্মকথা সম্বন্ধে তাঁহারা নির্ব্বাক্! এই অধঃপতিত জাতির কর্ম্মকাহিনী প্রচার করিবার তাঁহাদের কোনই আবশ্যক নাই, বরং কর্ম্মহীনতার ভাব জাগরূক রাখিতে প্রয়াসী থাকাই স্বাভাবিক। কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারা কিছুতেই আত্মবোধ খর্ব্ব করিতে পারেন না। তাঁহারা এই দার্শনিক জাতির কর্ম্মগুরু। এই নব কর্ম্মদীক্ষায় আমাদের দার্শনিকতা ভিন্ন নিজস্ব আর কিছুই রহিল না। গুরুর হাত হইতে না পাইলে আমাদের কিছুই পাওয়া হয় না—কিছুই আমাদের মুখরোচক হয় না। কাজেই আমরা দেখিলাম জাতীয় জীবনের কর্ম্মের ঘরে বিশাল শূন্যতা। সে দিকে একটা মস্ত ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়া যখন দৃষ্টিপাত করিলাম সেখানে বিকৃত বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

বৃটিশ যুগের প্রারম্ভে বাঙ্গালী জীবন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবসংঘর্ষে সে মূর্চ্ছিত। তাহার স্বাতন্ত্র্যের গৌরব নাই—আত্মস্থ থাকার গৌরব নাই। পাশ্চাত্য যখন বর্দ্ধিত কর্ম্মশক্তি লইয়া নব্য বাঙ্গালার সম্মুখে উপস্থিত হইল, পাশ্চাত্যশিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার দিকে স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না। শিক্ষিত বাঙ্গালীর চক্ষু ঝলসিয়া গেল। তাহার আত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘুরিতে লাগিল তাহার গুরুর দেশের—তাহার কল্পনার স্বর্গের—

চতুর্দ্দিকে। সে দেখিল ফ্রান্সের কর্ম্ম-উন্মত্ততা, আমেরিকার কর্ম্ম-সফলতা, আর ইংলণ্ডের কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মনৈপুণ্য। কর্ম্মের একটী বিরাট্ আদর্শ তাহার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া রহিল। এই মানস-আদর্শ বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের উপর ফেলিয়া যখন সে তুলনা করিল, তখন সে কর্ম্মের প্রতি একটা নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না। জাতীয় জীবন তাহার নিকট কর্ম্মহীন বৈরাগ্যের ছায়াস্বরূপে প্রতিভাত হইল। যে খৃষ্টজগতের বর্ত্তমান কর্ম্মশক্তি দেখিয়া এইরূপ দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিল, সেই খৃষ্টজগতে ও খৃষ্টধর্ম্মেও যে বৈরাগ্যের প্রভাব কম ছিল না, সে দিকে তাহার দৃষ্টি করিবার অবসর রহিল না!

এই বৈরাগ্যের অপবাদ কেবল হিন্দুজাতির প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক ভারত ত শুধু হিন্দুর নয়। হিন্দুধর্ম্মই ভারতের একমাত্র ধর্ম্ম নয়। অন্যান্য জাতির লোকসংখ্যাও ভারতে কম নয়। তাঁহারাও ত উন্নতি করিতে পারিতেছেন না—হিন্দুর উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারিতেছেন না। ইস্লামে বৈরাগ্য নাই। পৃথিবীর অন্যত্র ইস্লাম অধঃপতিত কেন? জাপানের যে ধর্ম্ম চীনেরও সেই ধর্ম্ম। জাপান উন্নত হইল, চীন এখনও অধঃপতিত কেন? সংক্ষেপে, আইরিস জাতি পতিত হইয়াছে কি বৈরাগ্যের প্রভাবে?

বৈরাগ্যের অপবাদ একটা মিথ্যা কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালায় বিদ্যা, বুদ্ধি, মনীষা নাই, এমন নয়। সঙ্গে সঙ্গে কাল্পনিকতা ও বাক্যাড়ম্বরের প্রাদুর্ভাবও অতিমাত্রায় বর্ত্তমান। লেখায়, বক্তৃতায়, কংগ্রেসে, সাহিত্য-পরিষদে, আইন আদালতে আমাদের কৃতিত্ব আছে। জাতীয় জীবনের ভাবের দিক্‌টা—জ্ঞানের দিক্‌টা আমরা বুঝিয়া লইয়াছি। কর্ম্মকঠোর জীবন বাঙ্গালার আদর্শ নয়। জাতীয় জীবনের কর্ম্মের দিক্‌টা আমরা দেখিতে পাই নাই। বর্ত্তমান জীবনের বিফলতা আমাদের কাছে এখন ভীষণ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা কল্পনার উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়া আমরা লজ্জানিবারণ করিতে চাই। অতীতের নামে কলঙ্ক আরোপিত

করিয়া নিজেকে প্রতারিত করিতে চাই। ইহাতে আমাদের বর্ত্তমান আত্মাভিমান বৃত্তির তৃপ্তি হইতে পারে কিন্তু সত্যের অপলাপ হয়। দেশের কর্ত্তব্যবুদ্ধির ও আদর্শের হ্যান হয়।

শিক্ষিত বাঙ্গালী জাতীয় অধঃপতনের কারণ খুঁজিয়াছে তাহার ধর্ম্মে, তাহার সমাজে ও পরিবারে—সর্ব্বশেষে তাহার প্রকৃতিতে, তাহার মনে, তাহার অতীন্দ্রিয় সত্তায়, আত্মার দার্শনিক স্বরূপে। মানুষের রাজ্যে নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক কিছু নাই। সমাজজীবনে দোষ অসম্পূর্ণতা চিরকালই রহিয়াছে ও থাকিবেও। এই সকল অসম্পূর্ণতা আবিষ্কার করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী এতদিন বক্তৃতার ছটায় বাঙ্গালা দেশ মুখরিত করিয়াছে। দৈববাণীর ন্যায় সে সব বক্তৃতা শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আন্দোলনের স্রোত কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া মরুভূমিতে অন্তর্হিত হইয়াছে—সমাজের প্রাণ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই, সমাজের হৃদয়দেশ আলোড়িত করিতে পারে নাই। কারণ, তাহাতে সত্যের স্বাভাবিক তেজ নাই—ইতিহাসের সাক্ষ্যের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা নাই। অধঃপতনের মূল কারণ সেখানে নয়। কাজেই তাহা জাতীয় জীবনের আত্মবোধকে জাগ্রত করিতে পারে নাই।

বর্ত্তমান অধঃপতনের কারণ জাতীয় জীবনের ধর্ম্মেও নাই, সমাজেও নাই, বৈরাগ্যেও নাই। জাতীয় জীবনের স্বরূপে সেই কারণের অন্বেষণ বৃথা। শুধু আমাদের মনের মধ্যে খুঁজিলেই চলিবে না। অনুসন্ধান করিতে হইবে অন্যত্র—বহির্জগতে। তাহাকে দেখিতে হইবে বাহিরের আবেষ্টনে—পৃথিবীর ইতিহাসে—মানবজাতির জীবন-সংগ্রামে। যে জাগতিক বিধানে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা—এক কথায় প্রাচীন পৃথিবী—অধঃপতিত সেই জাগতিক বিধানে আমাদের পতনের কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে। বিশ্বের ইতিহাসে জাতীয় ইতিহাসের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে। শুধু জাতীয় জীবনের স্বরূপে তাহাকে পাওয়া যাইবে না। বর্ত্তমান পৃথিবীর ইতিহাস যে ভীষণ সত্যের ইঙ্গিত করিতেছে তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে।

পৃথিবীতে যে নূতন শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে।

আমাদের কর্ম্মশক্তি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কর্ম্মের পথ দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ইহার কারণ আমাদের বৈরাগ্যপ্রবণতা নয়—আমাদের ভোগবিমুখতা নয়—যথার্থ কারণ আমাদের সম্প্রসারণের স্থানাভাব। আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই বাধাবিঘ্নের দুর্ভেদ্য প্রাচীর কর্ম্মের পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমরা জটিল ব্যূহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছি। নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না—ব্যূহভেদের মন্ত্র জানি না। সর্ব্ববিষয়ে স্বকর্তৃত্ব হারাইয়া জীবনে কর্তৃত্বশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। কর্ম্মের কেন্দ্র হস্তান্তর করিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়াছি। সামাজিক আচার ব্যবহারে পর্য্যন্ত আমরা স্বালবম্বন ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া বহিঃশক্তির দাস হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের মধ্যে যাঁরা মোল্লা তাঁদের দৌড়ও ঐ বহিঃশক্তির মসজিদ পর্য্যন্ত। এই আত্মবিসর্জ্জনের প্রারম্ভ স্বাবলম্বন ও স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ—বাঙ্গালা দেশ হইতে। কিন্তু মস্তিষ্কের জোরে বাঙ্গালী এই কঠিন সত্যকে কাব্য ও কল্পনা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। যতদিন আমরা এই সত্য গ্রহণ না করি—আমাদের সুস্থ ও সবল আত্মা ফিরিয়া না পাই—ততদিন আমরা অধঃপতনের কারণ বুঝিতে পারিব না।

শঙ্করের শৈশব।

(শ্রীমতী—)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শিশু শঙ্করের পদার্পণে নিঃসন্তান শিবগুরুর নিরানন্দ পুরী এক্ষণে আনন্দ-নিকেতন। পুত্রবিহনে যে গৃহ এতদিন নির্জ্জন কারাগারস্বরূপ বোধ হইত, সে গৃহ আজ স্বর্গের নন্দন কানন। শিশুর হাস্যকোলাহল যেন তথাকার পিকরব—শিশুর হস্তপদ-সঞ্চালন যেন ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য, শিশুর অঙ্গসৌরভ যেন পারিজাত গন্ধ—শিশুর সহাস্য বদনকমল যেন তাহার প্রস্ফুটিত কুসুমদাম।

নবনীতকোমল মধুরকান্তি সুকুমার শিশু অঙ্কে নব প্রসূতি বিশিষ্টাদেবীর সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি অনিমেষ নেত্রে পুত্রের অনিন্দ্যসুন্দর মুখপানে কখন চাহিয়া রহিয়াছেন, কখন বা সাদরে পুত্রকে বক্ষঃসুধা পান করাইতেছেন। স্নেহাবেগে তাঁহার পীনপয়োধরে সুধাধারা যেন শতধারে ক্ষরিত হইতেছে। বিশিষ্টাদেবী যেন আজ মাতৃভাব মূর্ত্তিমতী। জননীগর্ব্বে তাঁহার পবিত্র আননে এক অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শিবগুরু পত্নীর এই মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া জগন্মাতার মাতৃমূর্ত্তি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। আজ তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন, নিঃসন্তান সংসারী ব্যক্তির পক্ষে এই মাতৃমূর্ত্তি দর্শন কেন দুর্ল্লভ, পুত্র না হইলে মানব কেন পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় না। সংসারী ব্যক্তিকে রমণীর এই জননীমূর্ত্তি দেখাইয়া মুক্তিপথের পথিক করিবার জন্যই বুঝি ভগবান্ জীবগণকে এইরূপ পুত্ররত্ন দান করিয়া থাকেন।

কিন্তু মহামায়ার মায়াতে ত্রিজগৎ মুগ্ধ—বিশ্ববাসী সকলেই আবদ্ধ। মায়ার বন্ধনে মানব নিয়তই জড়িত হয়, গুটীপোকার

ন্যায় আপনার নালে আপনিই আবদ্ধ হইয়া থাকে। পণ্ডিত শিবগুরু ও বিশিষ্টাদেবী আজি মায়ামুগ্ধ হইয়া স্বপ্ন কথা বিস্মৃত হইলেন। ভগবান্ শঙ্করই যে পুত্ররূপে তাঁহাদের গৃহে অবতীর্ণ, একথা তাঁহাদের চিত্তপট হইতে তিরোহিত হইল। শঙ্কর যতদিন গর্ভে ছিলেন, যতদিন তাঁহারা পুত্রমুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করেন নাই, ততদিন তাঁহারা তন্ময়চিত্তে নিয়ত শিবেরই অনুধ্যান করিয়াছিলেন। পুত্রচিন্তার উদয় হইলে প্রথমে ভগবান্ শিবকেই পুত্ররূপে কল্পনা করিতেন। কিন্তু মায়ার কি মোহিনী শক্তি! পুত্র জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সে ভাব অন্তর্হিত হইল। পুত্রে শিবত্ব জ্ঞান অপহৃত হইয়া পুত্রত্বজ্ঞানই প্রকাশিত হইতে লাগিল। এখন শঙ্করের শুভাশুভের জন্য ব্রাহ্মণদম্পতী সদাই উৎকণ্ঠিত। যদি শিশুর কোনও অমঙ্গল হয়, যদি শিশু অসুস্থ হয়, এই ভয়ে ব্রাহ্মণদম্পতী সর্ব্বদাই উতলা থাকিতেন। বিশেষতঃ, বিশিষ্টাদেবীর দিনে দিনে এই ভাব অতিশয় প্রবল হইতে লাগিল। পক্ষিণী যেমন শাবককে পক্ষপুটে আবৃত রাখিয়াও শাবকের অনিষ্টাশঙ্কায় সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকে, বিশিষ্টাদেবীও তদ্রূপ শঙ্করকে বক্ষে ধারণ করিয়াও যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। পুত্রকে বক্ষঃচ্যুত করিয়া শয্যায় শয়ন করাইতেও যেন তাঁহার ইচ্ছা হইত না। তিনি আহার নিদ্রা বিশ্রাম সকলই যেন ভুলিয়া অহর্নিশি পুত্রের চাঁদমুখখানি দেখিতে ভালবাসেন।

এইরূপে কয়েকমাস গত হইলে শান্ত শিশু ক্রমেই অশান্ত হইতে লাগিল, সে এক্ষণে আর মাতৃবক্ষে স্থির হইয়া থাকিতে চাহে না। সে মায়ের কোল হইতে মাটীতে নামিয়া খেলাধূলা করিতে চাহিত। মা তাহাকে একবার ছাড়িয়া দিলে সে আর সহজে মায়ের কোলে আসিতে চাহিত না, তিনি ধরিতে গেলে সে হাসির লহর তুলিয়া ছুটিয়া পলাইয়াও যাইত। তাহার অমিয় অধরে অমিয় হাসি, মুখে আধ-আধ মা মা বুলি ব্রাহ্মণদম্পতীর কর্ণে যেন অমৃত সিঞ্চন করিত। তাঁহাদের নিকট জগৎই যেন সেই শিশুরত্ন। তাঁহাদের

ধ্যান জ্ঞান সবই এখন সেই শিশু। গৃহকর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলই যেন সেই শিশুর কল্যাণার্থ।

ব্রাহ্মণদম্পতীর বহু সাধনার ধন একমাত্র পুত্র এই শিশু, তাঁহারা যে শিশুগত প্রাণ হইবেন, ইহা ত স্বাভাবিক। কিন্তু এই শিশুর এমনি আকর্ষণশক্তি যে, প্রতিবেশী যে কেহ এই শিশুকে একবার দেখিত, সে আর যেন চক্ষু ফিরাইতে পারিত না। গ্রামবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই শিশুর প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা নানা উপলক্ষে শিবগুরুর গৃহে আসিতেন এবং শঙ্করের চাঁদ-মুখখানি একবার দেখিয়া যাইতেন, অথবা শিশুকে কোলে লইয়া একবার আদর করিয়া যাইতেন।

শিবগুরু পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইলেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম একেবারে বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি যথারীতি শঙ্করের দশবিধ সংস্কারের জন্য সতত যত্নবান্ থাকিতেন। ছয়মাস পূর্ণ হইলে তিনি শঙ্করের অন্নপ্রাশনক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এদিকে বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে শঙ্কর সমুদয় মাতৃ-ভাষা উচ্চারণে সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া শিবগুরু তাঁহার কর্ণবেধ সংস্কারে আর বিলম্ব করিলেন না এবং দ্বিতীয় বর্ষে বিদ্যারম্ভ সংস্কার করাইয়া দিলেন। অপূর্ব্বচরিত্র শঙ্করের সকলই অপূর্ব্ব—তিনি অচিরে বর্ণপরিচয় সমাপ্ত করিয়া তৃতীয় বর্ষে পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে সমর্থ হইলেন। ইহা দেখিয়া শিবগুরু শীঘ্রই তাঁহার চূড়াকরণ সংস্কার সম্পন্ন করিবার সংকল্প করিলেন।

শিবগুরু পুত্রের এই অসাধারণ ধীশক্তি দর্শনে পরম প্রীত হইলেও বিশেষ ভাবিত হইয়াছিলেন। কারণ, এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সন্তানকে মানুষ করা বড়ই কঠিন কর্ম্ম। তিনি ভাবিলেন পঞ্চমবর্ষেই পুত্রের উপনয়ন সংস্কার করাইয়া পুত্রকে গুরুগৃহে প্রেরণ করিবেন, কারণ, মনু বলিয়াছেন—"ব্রহ্মতেজ কামনা করিলে ব্রাহ্মণ কুমারকে পঞ্চবর্ষে উপনীত করিবে।"

কিন্তু হায়! মানুষ ভাবে একরূপ, বিধাতা ঘটান অন্যরূপ। মানুষ গড়ে আর কাল তাহা ভাঙ্গে। কালের কঠোর তাড়নায় শিবগুরুর

সে বাসনা পূর্ণ হইল না। শঙ্করের তিন বর্ষ পূর্ণ হইতে না হইতেই শিবগুরু ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

শঙ্করজননী সহসা এই অভাবনীয় বিপদে একেবারে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। যদিও শিবগুরু প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রায় বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন কিন্তু তথাপি মৃত্যুর জন্য আর কে কবে প্রস্তুত হইয়া থাকে? তাই মৃত্যু যখন অতর্কিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সকলেই মৃত্যুকে অভাবনীয় বিপদ্ ভাবিয়া শোকে অভিভূত হইয়া পড়ে। বিশিষ্টাদেবীরও আজি তাহাই ঘটিল। তিনি পতিহারা হইয়া শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। একে তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা, তাহাতে এই নাবালক অপোগণ্ড শিশু, তিনি যেন চিন্তার অকূলপাথারে ভাসিলেন।

কাল যেমন শোকে সান্ত্বনা প্রদান করে, এমন আর কিছুই নহে, কালে সকলই সহিয়া যায়। নচেৎ ভগবানের লীলা চলে না। তাই বিশিষ্টাদেবী ক্রমে পুত্রের মুখ চাহিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বুঝিলেন, এক্ষণে এই শিশুর লালন পালন শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সকল ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহার সম্মুখে এক মহান্ কর্ত্তব্যভার উপস্থিত। শোকে অভিভূত হইয়া থাকিলে তাঁহার চলিবে না, তিনি শোক সম্বরণ না করিলে কে তাঁহার এই শিশুকে পালন করিবে। পিতার অসীম স্নেহ হারাইয়া বালক দিন দিন মলিন হইতেছে—তাঁহাকেই তাহার পিতার অভাব মোচন করিতে হইবে, নচেৎ পুত্রের জীবনসংশয় হইবে। আর সে কথা ভাবিতেও বিশিষ্টা-দেবীর হৃদয় শিহরিয়া উঠে। তাই তিনি আবার হৃদয় বাঁধিয়া গৃহকর্ম্মে মন দিলেন।

সুখের দিনে বিশিষ্টাদেবী যাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, আজ এই দুঃখের দিনে সহসা বিদ্যুৎচমকের ন্যায় পতির সেই স্বপ্নকথা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল। তাঁহার শিশু শঙ্কর যে সেই ভগবান্ শঙ্কর, একথা মনে পড়াতে বিশিষ্টাদেবীর যেন অনেক দুশ্চিন্তা দূর হইল। কিন্তু হায় সে কতক্ষণের জন্য, পুত্রকে কখন ম্রিয়মাণ দেখিলেই বিশিষ্টা-

দেবী পূর্ব্বাপর সকলই বিস্মৃত হইয়া পুত্রকে বক্ষে ধরিয়া রোদন করিতেন।

যথারীতি শিবগুরুর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। জ্ঞাতিগণ শঙ্করকে নিতান্ত নাবালক দেখিয়া তাঁহাকে পিতৃধন হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী বিশিষ্টাদেবী জ্ঞাতিগণের এই অভিসন্ধি অচিরে বুঝিতে পারিলেন। প্রতিকূল জ্ঞাতিকুলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির জন্য বালক শঙ্করকে লইয়া তিনি পিতৃগৃহে যাইবার মনস্থ করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় যাইলেন। শিবগুরুর পিতৃ-মাতৃ বিয়োগের পর সংসারে অন্য রমণী না থাকায় বিশিষ্টাদেবীর পিত্রালয়ে আসা আর ঘটিয়া উঠিত না, তাই এক্ষণে বহুদিন পরে সপুত্র তাঁহাকে দেখিয়া পিত্রালয়ের সকলেই যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। জ্ঞাতিগণের অভিসন্ধির কথা জানিতে পারিয়া তাঁহারাও কিছুদিন বিশিষ্টাদেবীকে তথায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং শঙ্কর ও বিশিষ্টাদেবীকে সকলে যথেষ্ট আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ, কমনীয়মূর্ত্তি, মধুরপ্রকৃতি শঙ্কর সকলের অতিশয় আদরণীয় হইলেন। তিনবর্ষের শিশু শঙ্করকে পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠে অভিজ্ঞ জানিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

এইরূপে সকলের আদরযত্নে পালিত হইয়া শঙ্কর ক্রমে চতুর্থ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চম বর্ষে পড়িলেন। দিনে দিনে শঙ্করের বিদ্যানুরাগ প্রবল হইতে লাগিল, তিনি শিশুগণোচিত খেলাধূলা ছাড়িয়া সর্ব্বদা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে রত থাকিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বালপ্রকৃতি ক্রমে যেন চিন্তাশীল ও গম্ভীর হইতে লাগিল। তাঁহার এই অসাধারণ ভাব দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইতেন এবং ভাবিতেন এ বালক কখনই সাধারণ মানব নহে।

শঙ্কর পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে বিশিষ্টাদেবী পুত্রের উপনয়ন সংস্কার করাইয়া পুত্রকে গুরুগৃহে প্রেরণের জন্য চিন্তিতা হইলেন। তিনি ভাবিলেন আর এস্থানে বিলম্ব করা উচিত নহে, এই বার স্বগৃহে গিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে।

এই ভাবিয়া তিনি পুত্রকে লইয়া গৃহে ফিরিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনোগত ইচ্ছা অবগত হইয়া পিত্রালয়ের সকলে এত শৈশবে শঙ্করকে উপনীত করিয়া গুরুগৃহে প্রেরণে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিশিষ্টাদেবী স্বামীর আদেশ স্মরণ করিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি শঙ্করকে লইয়া স্বগৃহে যাত্রা করিলেন। নয়নাভিরাম বালক শঙ্করকে বিদায় দিতে সকলেরই নয়ন সিক্ত হইল।

বিশিষ্টাদেবী বহুদিন পরে গৃহে ফিরিয়াছেন দেখিয়া প্রতিবেশিনীরা আনন্দিতা হইলেন। অতঃপর তিনি গ্রামের পূজনীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-গণ ও পতির বন্ধুবর্গকে স্বগৃহে আনাইয়া শঙ্করের উপনয়ন এবং গুরুগৃহে প্রেরণের জন্য পরামর্শ চাহিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ গুরুগৃহের কঠোরতা স্মরণ করিয়া এত অল্প বয়সে উপনয়ন দিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু শিবগুরুর ইহাই একান্ত ইচ্ছা ছিল জানিয়া এবং বিশিষ্টাদেবীরও আগ্রহ দেখিয়া অবশেষে আর কেহই তাহাতে বাধা দিলেন না।

অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণে শঙ্করের উপনয়ন সংস্কার হইয়া গেল। শিবগুরুর বন্ধুজন মধ্যে একজন গ্রামসন্নিকটস্থ গুরুগৃহে সংবাদ দিলেন যে, শীঘ্রই শঙ্করকে গুরুগৃহে প্রেরণ করা হইতেছে। শঙ্করকে গুরু-গৃহে প্রেরণ করিবার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, পুত্রের অদর্শন চিন্তায় বিশিষ্টাদেবী ততই কাতর হইতে লাগিলেন। যাহার মুখ চাহিয়া পতিশোক বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহাকে দূরে পাঠাইয়া একাকী এই নির্জ্জন গৃহে কিরূপে বাস করিবেন, ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী এবং ধর্ম্মশীলা নিষ্ঠাবতী রমণী—মায়াতে অন্ধ হইয়া তিনি কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হইবেন? তিনি ভাবিলেন, প্রাণ হইতে প্রিয়তর ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজের জন্য গুরুগৃহবাস একান্ত প্রয়োজন, আমি তাহাতে কেন কাতর হইতেছি। এই ভাবিয়া তিনি মনকে দৃঢ় করিলেন এবং মনে মনে পুত্রকে ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া চিন্তা হইতে বিরত হইলেন।

অতঃপর একদিন প্রাতে বিশিষ্টাদেবী পুত্রকে গুরুগৃহে প্রেরণ করিলেন। শঙ্কর যাত্রাকালে কুলদেবতা কৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া মাতার পদধূলি মস্তকে লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। একজন নায়ার পরিচারিকা শঙ্করকে লইয়া গুরুগৃহে গমন করিল।

সেবাধর্ম্মের ক্রমবিকাশ।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ।)

আমরা যে সার্ব্বভৌমিক মহাব্রতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার শক্তি অত্যদ্ভুত। উহা ইতর ধর্ম্মের সকল পরিখা উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাহাদের সকল গণ্ডী ভেদ করিয়া তাহাদের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করে। এই সেবাধর্ম্ম কোনও বিশেষ জাতি, সমাজ বা শরীরের অপেক্ষা করে না, এ ধর্ম্মে বর্ণবিচার নাই— এ ধর্ম্ম পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ হইতে অতি মহান্ দেবমানবকে পর্য্যন্ত প্রেমের আলিঙ্গনে বদ্ধ করে, কিন্তু সে বন্ধনে মুক্তিরই প্রকাশ। যেথানে প্রেম সেথানেই ত্যাগ—সেথানে 'আমি' 'আমার' বলিয়া কিছু নাই। পরের তরে আপনার ক্ষুদ্র আমিটি নিঃশেষে যে ভুলিতে পারিয়াছে, তাহার নিকট পরমপ্রেমস্বরূপ পরমাত্মা প্রকটিত হইয়া তাহাকেও প্রেমস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে—তাহার আবার বন্ধন কোথায়? মুক্তি যে তাহার পায় পায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে যে সকল দ্বন্দ্বের মধ্যে—সকল 'লীলা'র মধ্যে— একমাত্র পরমাত্মার স্ফুরণ দর্শনে সশক্তিক শ্রীভগবানের লীলার পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছে। একমেবাদ্বিতীয়ম্ সচ্চিদানন্দ যথন

আপনা হইতে অভেদ অনির্ব্বচনীয়রূপা আদিভূতা সনাতনী জগজ্জননীর সহিত ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া আপনাকে বহুরূপে ঈক্ষণ করিলেন, তখন সেই রসক্রীড়াসাগরে কত সুখ দুঃখ, জরা ব্যাধি, বিরহ মিলন, স্বর্গ নরক, আলোক আঁধারের আবর্ত্ত—কত করুণ, বীভৎস, শৃঙ্গার, বীর, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, রৌদ্র, শান্ত রসতরঙ্গের হিল্লোল কল্লোল—কত মায়া, দয়া, স্নেহ, মমতা, ভ্রান্তি, শান্তি, কান্তির বীচিমালার উত্থান হইল, কে তাহার গণনা করিবে? ক্রমে সে রসক্রীড়া-রঙ্গভঙ্গে 'বহু' আত্মহারা হইয়া পড়িল—আত্মস্বরূপ হারাইয়া মোহপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গমঞ্চে আত্মহারা না হইয়া পরমাত্মীয় একের সহিত নিজ হৃদয়তন্ত্রী ঠিক সুরে বাঁধিয়া তাঁহার লীলার সহায়ক হন। সে তন্ত্রীর কি অপূর্ব্ব ঝঙ্কার—সে কণ্ঠের কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত-লহরী,—

"প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি, আমি তুমি তুমি-আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী।"

জগৎটা তাঁহার কাছে একটা বিরাট্ পূজার উপকরণ সামগ্রীতে পরিণত হয়। দেহের প্রতি স্পন্দনটি পর্য্যন্ত যেন সেই বিরাট্ আমির সেবাতে নিরত বলিয়াই বোধ হয়। বন্ধন বা মুক্তি বলিয়া আর কিছু তখন থাকে না। ইহাই বর্ত্তমান যুগের সেবাধর্ম্মের নীতি। এই কথাটি পূজ্যপাদ স্বামীজি তাঁহার একখানি সংস্কৃত পত্রে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"শ্রীভগবান্ সমষ্টিরূপে সকলেরই প্রত্যক্ষ। সুতরাং জীবেশ্বরের অভেদহেতু জীবসেবা এবং ভগবৎপ্রেম একই পদার্থ। বিশেষ এই,—জীবে জীববুদ্ধি করিয়া যে সেবা করা হয় তাহাকে দয়া বলে, প্রেম নহে; আর আত্মবুদ্ধি করিয়া যে সেবা তাহাই প্রেম। আত্মার প্রেমাস্পদত্ব শ্রুতি, স্মৃতি এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ভগবান্

শ্রীচৈতন্যদেব যাহা বলিয়াছেন তাহাও ঠিক,- ঈশ্বরে প্রেম, জীবে দয়া ইত্যাদি। দ্বৈতবাদ হেতু সেখানে তাঁহার জীব ও ঈশ্বরের ভেদ-বিজ্ঞাপক সিদ্ধান্ত সমীচীন। কিন্তু আমরা যে অদ্বৈতবাদী—আমাদের নিকট জীববুদ্ধি বন্ধনের নিমিত্ত। সেইহেতু আমাদের প্রেমই একমাত্র শরণ—দয়া নহে। মনে হয়, জীবের প্রতি 'দয়া' শব্দের প্রয়োগ সাহস মাত্র। আমরা দয়া করিতে পারি না, সেবাই করিতে পারি। আমাদের অনুকম্পানুভূতি সম্ভব নয়, পরন্তু সর্ব্বভূতে প্রেমানুভব বা স্বানুভবই সম্ভব।"

কথিত সেবাধর্ম্ম বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইদানীং বেদান্ত শব্দার্থের অপচয় ঘটিয়াছে। বেদান্ত শব্দে আজকাল অনেকেই শাস্ত্রে যাহা "অজাতবাদ" বলিয়া খ্যাত তাহাই বুঝিয়া থাকেন এবং কেহ বা আচার্য্য শঙ্করের শারীরক ভাষ্যকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন—কিন্তু উভয়েই ইহার অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ। বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদের অন্ত বা শেষভাগ অর্থাৎ উপনিষদ্ কাণ্ড। এই উপনিষদ্ ভাগই সকল মতবাদের খনি—ভারতীয় দ্বৈতাদ্বৈত সকল বাদেরই আশ্রয়স্থল। উক্ত অপূর্ব্ব জ্ঞানগ্রন্থের সিদ্ধান্ত সূত্রাকারে নিবদ্ধ আছে--উহা "বেদান্ত সূত্র" বা "বেদান্ত দর্শন" নামে পরিচিত। উক্ত দর্শনোপরি দ্বৈত অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি নানাজাতীয় নানা আচার্য্যের ভাষ্য বর্ত্তমান। ইহা হইতেই বেশ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বেদান্তে বা বেদান্ত-দর্শনে সকল ভাবই বর্ত্তমান এবং সেই হেতু সকল আচার্য্যগণের ভাষ্যই সকল মত সম্বলিত, মাত্র তাঁহারা কোনও বিশেষ ভাবকে তাঁহাদের ভাষ্যমধ্যে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আবার যাঁহারা বেদান্ত বলিতে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বুঝেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই উক্ত বাদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ বলিয়া মনে হয় না। যেমন "আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" বাক্য উদ্ধৃত করিয়া যদি আমরা বলি যে, গীতাতে শ্রীভগবান্ সকলকেই কার্য্য ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলিয়াছেন, ইহা যেরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ,

সেইরূপ অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয়ের সম্পূর্ণ ভাষ্য এবং ভাষ্যকার কৃত অন্যান্য স্তবস্তুতি যথাযথরূপে অধ্যয়ন না করিয়াই 'শিবোঽহং' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি দুই চারিটী বচন পাঠ করিয়া বা শুনিয়া উহাকে অজাতবাদ—যে বাদে জগৎ নিঃশেষরূপে অস্বীকৃত হইয়াছে এবং যাহা দত্তাত্রেয়, গৌড়পাদ, অষ্টাবক্র প্রভৃতি দুই একজন ব্রহ্মজ্ঞানীর মত—বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। অদ্বৈতবাদে যেমন নিত্য স্বীকার করা হইয়াছে তেমনি লীলাও স্বীকার করা হইয়াছে—দার্শনিকের ভাষায় ঐ নিত্য ও লীলাকে পারমার্থিক এবং ব্যবহারিক আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে মাত্র। এ জগৎ লীলাময়ের লীলা, ইহা সকল শাঙ্কর মতাবলম্বীই স্বীকার করেন। প্রমাণস্বরূপ আচার্য্যের বচন উদ্ধৃত করিতেছি,—"যেমন লোকমধ্যে কোনও এক প্রাপ্তকাম রাজার অথবা রাজ-অমাত্যের—যাহার কিছুমাত্র অভাব নাই, সমস্তই আছে তাহার—বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র লীলারূপা প্রবৃত্তি (চেষ্টা) হইতে দেখা যায়, অথবা যেমন শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র স্বভাবের বশে নিষ্পন্ন হইতে পারে সেইরূপ। লীলায় যৎকিঞ্চিৎ উল্লাসাদি প্রয়োজন আছে সত্য কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগে কিছুমাত্র উদ্দেশ্য অথবা অভিসন্ধি নাই। কোন বুদ্ধিমান্ অমুক হউক বা হইবে ভাবিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করেন না। তাহা স্বভাব বশে আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। সেইরূপ ঈশ্বরের যে কাল-কর্ম্ম-সচিব মায়াশক্তি আছে সেই মায়াশক্তিই তাঁহার স্বভাব। সেই স্বভাবের বশেই সৃষ্টি হয়, কেহ তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম নহে। জগৎসৃষ্টিতে যে পরমাত্মার কোনও রূপ উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি অথবা প্রয়োজন আছে তাহা নহে। শ্রুতি ও যুক্তি দুএর কোনটির দ্বারা প্রয়োজনসদ্ভাব নিরূপিত হয় না। তিনি সৃষ্টি করেন কেন? চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকেন না কেন? এ অনুযোগ করিতে পার না। স্বভাবরূপ কারণ থাকিলে তাহার কার্য্য নিতান্ত অপরিহার্য্য। আমরা মনে করিতেছি, জগৎ-রচনা অতি গুরুতর কার্য্য, কিন্তু পরমেশ্বরের নিকট ইহা গুরুতর নহে।

তিনি অপরিমিত শক্তিসম্পন্ন—তাঁহার নিকট ইহা লীলাই, অন্য কিছু নহে। যদিও লৌকিক লীলায় কিছু না কিছু প্রয়োজনের অস্তিত্ব উহ্য করিতে পার, কিন্তু ঈশ্বরের জগৎরচনারূপ লীলায় অত্যল্প প্রয়োজনও উহ্য করিতে পারিবে না। কেননা তিনি আপ্তকাম, পূর্ণ বা নিত্যতৃপ্ত। তিনি করেন নাই, অথবা তাঁহার এ প্রবৃত্তি উন্মাদের প্রবৃত্তির ন্যায়, ইহাও বলিতে পার না। শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞ—সমস্তই জ্ঞানপূর্ব্বক করেন।" (বেদান্তসূত্র—২ অ, ১ পা, ৩৩ সূ ভাষ্য)।

ভাষ্যে যে "লীলারূপা প্রবৃত্তি"র উল্লেখ আছে, তাহার স্বরূপ কিরূপ তাহা আচার্য্য অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছেন,—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্,
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।" (আনন্দ লহরী)

"শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তাহা হইলেই তিনি প্রভাবশালী হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়েন; অন্যথা তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয়েন না।" এই লীলারূপা অনির্ব্বচনীয়া শক্তি মানিলেই, ঈশ্বর, জীব, জগৎ, ভগবান্, ভক্ত, ভাগবৎ, সেব্য, সেবক, সেবা সকলই মানিতে হয়। উপাধিযুক্ত মায়াধীশ ঈশ্বর, উপাধিযুক্ত মায়াধীন জীব। 'এক' ঈশ্বর উপাধিযুক্ত হইয়া 'বহু' হইয়াছেন। উপাধিহীন অবস্থায় যাঁহাকে "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলা হইয়াছে, সোপাধিক অবস্থায় সেই একই বস্তুকে ভগবান্ বলা হইয়াছে। তাই ভাগবৎকার বলিয়াছেন,—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

অতএব অদ্বৈতবাদ মানিলেই যে লীলা অস্বীকার করিতে হইবে—জড় হইয়া থাকিতে হইবে ইহার কোনও অর্থ নাই। মায়াবাদী ছিলেন বলিয়া বুদ্ধ, শঙ্কর, বা বিবেকানন্দ কর্ম্মকুশলী ছিলেন না এরূপ বলিতে পার না। তবে একটা খুব উচ্চ অবস্থা আছে,

যেখানে জ্ঞান, জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই ত্রিপুটি একীভূত হয়। সেখানে কোনও কর্ম্ম সম্ভব নহে। এই অবস্থাই পারমার্থিক বা নিত্য নামে অভিহিত। এই "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বয়ং" অবস্থায় যে কোন প্রকার ক্রিয়ার কল্পনাও করা যায় না, এ কথা যাঁহারা লীলা মানেন তাঁহারাও স্বীকার করিয়া থাকেন।

এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। আজ যে সেবাধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুগধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে তাহা একদিনের পরিণতি নহে। প্রাচীন বৈদিক যুগ হইত আরম্ভ করিয়া শত শত শতাব্দীর ভাব-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া স্মৃতি যুগে উহা কিরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং স্মৃতি যুগেরও শত সহস্র বৎসর পরে ঐতিহাসিক যুগে আবার উহা কিরূপভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, অতঃপর আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

বৈদিক যুগে সেবাধর্ম্ম ইষ্টাপূর্ত্ত-দত্ত প্রভৃতি নামে বীজাকারে বর্ত্তমান ছিল। ইষ্ট অর্থে যজ্ঞ। প্রতি গৃহস্থকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিতে হইত। উহা ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, এবং নৃযজ্ঞ নামে খ্যাত। ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, এবং ভূতযজ্ঞ সেবাধর্ম্মের অন্তর্গত। বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। উচ্ছিষ্ট অন্ন পাত্রে উদ্ধার করিয়া ধূলি না লাগে এমন ভাবে ভূমিতে কুক্কুর, পতিত, কুকুরোপজীবী, পাপরোগী, কাক ও কৃমিদিগকে প্রদান করার নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি ভোজন করানর নাম নৃযজ্ঞ। আপূর্ত্ত অর্থে বাপী, কূপ, তড়াগাদি খনন, পথিপার্শ্বে বৃক্ষাদি স্থাপন, দেবালয়াদি নির্ম্মাণ ইত্যাদি। জল, অন্ন, ধেনু, ভূমি, বস্ত্র, তিল, স্বর্ণ, ঘৃত, গো প্রভৃতি দান দত্ত কর্ম্ম বলিয়া পরিচিত ছিল। "ইষ্টাপূর্ত্তেদত্তমিতি কর্ম্ম তেন প্রতিপত্তব্যঃ পিতৃযানঃ পন্থাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" অর্থাৎ ইষ্ট, আপূর্ত্ত ও দত্ত, এই সকল কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযান মার্গ প্রাপ্তব্য। "তেষাং ইষ্টাদিকারিণাং যদা তৎ কর্ম্ম পর্য্যবৈতি বিপাকক্ষীণং ভবতি তদা পুনরাবর্ত্তন্তে পুনরত্রৈব জন্ম

লভন্তে"। অর্থাৎ ইষ্টাদিকারীদের পুণ্য ক্ষীণ হইলে তাহারা পিতৃলোক হইতে স্খলিত হইয়া পুনরায় পৃথিবী আশ্রয় করে।

ক্রমে এই ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, আপূর্ত্ত এবং দত্ত মিলিত হইয়া স্মৃতিযুগে দান ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল এবং ইহা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করায় বেদব্যাস প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে পরোপকারই একমাত্র ধর্ম্ম। ভীষ্মদেব অন্ন, প্রাণ এবং অভয়দানকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। মনু জলদান, অন্নদান, ধেনুদান, ভূমিদান, বস্ত্রদান, তিলদান, স্বর্ণদান ও ঘৃতদান প্রভৃতি সকল দান অপেক্ষা বেদশিক্ষাদানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রদ—অতএব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুণ্য ফলদাতা—বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই দান ধর্ম্মের শাসনে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যে কত বলি, শিবি, কর্ণ প্রভৃতি দানবীরগণের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

কিন্তু যতই উৎকর্ষ লাভ করুক, এই দানধর্ম্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকাম বলিয়াই পরিচিত ছিল। জগতের স্থিতিকারণ এবং নিঃশ্রেয়সহেতু যে সনাতন ধর্ম্ম তাহা দীর্ঘকাল পরে অনুষ্ঠাতৃগণের হৃদয়ে কামোদ্ভব হেতু অভিভূত হইয়া পড়ে। সেই জন্য শ্রীভগবান্ তদ্ধর্ম্মের রক্ষাকল্পে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হয়েন। তিনিই প্রথম সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করেন,—

"তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা মোক্ষ কামনা করেন তাঁহারা ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে কর্ম্মসমর্পণ বুদ্ধিতে বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্যা ক্রিয়া করিবেন। তিনি এই নিষ্কাম দান ধর্ম্ম ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা—সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক।

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥"

দান অবশ্য কর্ত্তব্য এই প্রকার মনে করিয়া, "অনুপকারীকে" অর্থাৎ প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ ব্যক্তিকে, অথবা প্রত্যুপকার করিতে

সমর্থ হইলেও তাহার কাছে কোন প্রকার প্রত্যুপকার লাভের অপেক্ষা না করিয়া যে দান করা যায় এবং "দেশে" অর্থাৎ পুণ্য কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে, "কালে" অর্থাৎ সংক্রান্তি প্রভৃতি পুণ্যকালে এবং "পাত্রে" অর্থাৎ বিদ্বান্, চরিত্রবান্ সৎপাত্রে যে দান অনুষ্ঠিত হয়—তাহা সাত্ত্বিক।

"যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥"

যে দান প্রত্যুপকারের জন্য অর্থাৎ সময় বিশেষে এই ব্যক্তি আমার প্রত্যুপকার করিবে—এই প্রকার আশায়, অথবা ফললাভের জন্য অর্থাৎ ঐ দান করিলে যে 'অদৃষ্ট' বা পুণ্য হয় তাহা পাইবার জন্য, অথবা খেদের সহিত যে দান করা হয়, তাহাই রাজস্ দান বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃদতম্॥"

"অদেশে" অর্থাৎ অপুণ্য দেশে—যে দেশ অন্ত্যজজাতি এবং অন্যান্য অশুচি দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং "অকালে" অর্থাৎ পুণ্যের হেতু বলিয়া যে কাল প্রসিদ্ধ নহে অর্থাৎ সংক্রান্তি প্রভৃতি বিশেষ দিন নহে, অপাত্রে অর্থাৎ মূর্খ, তস্কর প্রভৃতিকে—যে দান করা হয় এবং পুণ্য দেশকাল সত্ত্বেও যে দান অসৎকৃত হয় অর্থাৎ প্রিয়বচন ও পাদপ্রক্ষালনাদি পূর্ব্বক না হয়, অথবা অবজ্ঞাত অর্থাৎ পাত্রকে অবজ্ঞা করিয়া দেওয়া হয়, তাহা তামস বলিয়া খ্যাত।

দানাদি নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রথম প্রচার সর্ব্বসাধারণের নিকট ইহাই প্রথম। স্বর্গাদি অভ্যুদয়ের হেতু যে প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহা দেবাদি স্থানপ্রাপ্তির নিমিত্ত সত্য। কিন্তু দানাদি কর্ম্ম যদি ফলাভিসন্ধান বর্জ্জনপূর্ব্বক ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কৃত হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শুদ্ধচিত্ত জ্ঞাননিষ্ঠায় যোগ্যতা প্রদান করে বলিয়া উহা জ্ঞানোৎপত্তিরও হেতু বটে। সেই জন্য এই নিষ্কাম দানাদি ধর্ম্ম নিঃশ্রেয়স ধর্ম্মের মধ্যেই

পরিগণিত। শ্রীভগবান্ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "ব্রহ্মে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া যতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ আসক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করেন।"

যথেষ্ট উৎকর্ষলাভ সত্ত্বেও এই দানধর্ম্ম স্মৃতিযুগে সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই এবং নিষ্কাম ধর্ম্মের সহিত ত্যাগীর হৃদয়বত্তার উপযুক্ত সম্মিলন হয় নাই। উহা তখন ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ছিল, তবে কিঞ্চিৎ দয়াযুক্ত হওয়ায় অভ্যুদয় বা নিঃশ্রেয়সের দ্বারস্বরূপ ছিল মাত্র। শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্ম হইতেই ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ। তিনিই সর্ব্বপ্রথম দান ধর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম, ত্যাগ এবং হৃদয়বত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহা সঙ্ঘবদ্ধ করেন। তাঁহার সার শিক্ষা ছিল নিবৃত্তি ও পরোপকার; জগতে আর কোনও ধর্ম্ম পূর্ব্বে এমন আত্মত্যাগের মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে পারে নাই—

"যৎকিঞ্চিদ্ জগতোদুঃখং তৎসর্ব্বং ময়ি পচ্যতাম্।
বোধিসত্ত্বশুভৈঃ সর্ব্বৈর্জগৎ সুখিতমস্তু চ॥"

"জগতে যত কিছু দুঃখ আছে তৎসমস্তই আমাতে আসুক এবং আমার ও বোধিসত্ত্বগণের পুণ্যে জগৎ সুখী হউক।" এই অপূর্ব্ব পরার্থে ত্যাগই ইদানীং সেবাধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। প্রভেদ কেবল দার্শনিক মত লইয়া। বৌদ্ধ পরোপকারের দ্বারা নিজের ক্ষণিক আমির—যাহা অবিদ্যাপ্রসূত এবং যাহা পঞ্চ দুঃখাত্মক সংসারের জনক—তাহার ধ্বংসসাধন করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে চান, আর বৈদান্তিক সেবাধর্ম্মের দ্বারা বিজ্ঞান আত্মার বিলয় করিয়া পরমাত্মার স্ফুরণ সর্ব্বভূতে দর্শন করিয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে চান। বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক উভয়েই স্বীকার করেন যে, ত্যাগ করিতে হইলে নিজের ক্ষুদ্র আমিটিকে ভুলিতে হইবে। যিনি নিঃশেষে এই ক্ষুদ্র আমিটিকে ভুলিতে পারিবেন তাঁহারই নিকট সত্য প্রকাশিত হইবে। এই ত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া ভগবান্ বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথম দান ধর্ম্ম সঙ্ঘবদ্ধ করিলেন। এই দান ধর্ম্ম আমরা চারিভাগে বিভক্ত করিতে পারি—অন্নদান, প্রাণদান, বিদ্যা-

দান, এবং ধর্ম্মদান। সমগ্র ক্ষুধার্ত্ত জীবজন্তুকে এবং গৃহাগত অতিথিকে আহার্য্যদানের নাম অন্নদান, সঙ্কটাপন্ন ব্যাধিগ্রস্ত বা মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে ঔষধ, পথ্য, শুশ্রূষা প্রভৃতি দ্বারা রক্ষা করার নাম প্রাণদান। উহা অন্নদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাদান অন্ন ও প্রাণদান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ, বিদ্যা দ্বারা উভয়ই সিদ্ধ হয়। পারিশ্রমিক না লইয়া অধ্যাপনা বা বিদ্যার্থী-দের প্রতিপালনই এই দানের প্রকৃতি। ধর্ম্মদান আবার বিদ্যাদান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ, জীব ধর্ম্মসাহায্যে এই দুস্তর সংসার-সাগর অতিক্রমে সমর্থ হয়।

এই চতুর্ব্বিধ দান শ্রুতি এবং স্মৃতির যুগেও বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে ভগবান্ বুদ্ধ এই দানধর্ম্ম এক নবালোকে আলোকিত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করেন এবং উহা সন্ন্যাসী গৃহস্থের সমবায়ে এক বিপুল ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া প্লাবনের ন্যায় ভারতে এবং ভারতের দুর্ভেদ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া মিশর হইতে মেক্সিকো পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বহু যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে দর্শন বিজ্ঞান ভারতবাসী অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা কি করিয়া সমগ্র জাতির বাস্তব জীবনে পরিণত করিতে হয়, ভগবান্ বুদ্ধই তাহা আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাদান করেন। স্বামীজি সত্যই বলিয়াছিলেন—Budha came to whip us into practice.

এই সমবায়-সঙ্ঘের ফলে ভারতে এবং ভারতেতর প্রদেশে যে কত অন্নসত্র, পান্থনিবাস, পশুশালা, চিকিৎসালয়, অনাথ আশ্রম—কত চতুষ্পাঠী, বিদ্যালয়, পরীক্ষাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, মঠ, বিহার, স্থাপিত হইয়াছিল—কত দর্শন, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যার আদান প্রদানে ভারত মহিমান্বিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রত্নতত্ত্বের আলোকে এক নবসত্যের প্রকাশ হইয়াছে। স্থবির পুত্র (Therapeuts) নামক কোনও এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় মিশর দেশান্তর্গত আলেক্-জেন্দ্রিয়া নগরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহাদেরই একটী শাখা পলাস্তানে (Palestine) আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহারাই পরে

তদ্দেশীয় ভাষায় ঈষানী (Essene) বলিয়া পরিচিত হন। জন দি ব্যাপটিষ্ট (John the Baptist) এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। ইঁহার নিকট হইতে ভগবান্ যীশুর অভিষেক ক্রিয়া (Baptism) সম্পাদিত হয়। প্রকৃত কথায় বলিতে হইলে খ্রীষ্টধর্ম্ম এই ঈশানী (Essene) সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ বলিতে হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ঈশানী সম্প্রদায় খ্রীষ্টধর্ম্মেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। নির্জ্জন বাস, স্ত্রী ও পুরুষের আজীবন কৌমার ব্রত, অহিংসা, বর্ণবিভাগ, স্ত্রীজাতির হীনত্ব, অভিষেক, গুপ্ত তন্ত্র মন্ত্র, শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, ইহুদি মন্দিরে আগমন, পশুবধের বিরোধিতা, আত্মার অমরত্ব, বহুজন্মবাদ, সঙ্ঘ, ব্রহ্মদণ্ড, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান, পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি, স্পর্শদোষ, ভোজনকালে মৌনাবলম্বন, সাধারণ ভাণ্ডার, ক্ষেত্রে কার্য্য, নিরামিষ ভোজন, আলখেল্লা পরিধান, আহারের পূর্ব্বে ও পরে জয় উচ্চারণ, মলত্যাগের পর তদুপরি মৃত্তিকা দ্বারা আবরিত করণ, পুত্রার্থে ভার্য্যা, একব্রোপাসনা, মদ্য মাংস ত্যাগ, ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি মতবাদ এবং পদ্ধতি ঈশানী এবং স্থবিরপুত্রদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই সকল দেখিয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অনুমান করিতে হয় যে, এই সম্প্রদায়ীরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কারণ, তৎকালীন পাশ্চাত্য ধর্ম্মের মধ্যে কোথায়ও ঐরূপ আচারপদ্ধতি বর্ত্তমান ছিল না, বরং উহাদের আচার পদ্ধতির সহিত অস্মদ্দেশীয় আচার পদ্ধতিরই সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। ইহা ছাড়া আরও যথেষ্ট প্রমাণ আছে, বাহুল্য হেতু উহাদের উল্লেখ করা হইল না।

ভগবান্ খৃষ্ট এই বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে উত্থিত হইয়া উহার নীতি এবং সঙ্ঘের সহিত ইহুদি ধর্ম্মের ঈশ্বরবাদ এবং স্বানুভূতি একত্রিত করিয়া এক বিশাল প্রাসাদের সৃষ্টি করেন—যাহাতে আজ শত শত বর্ষ ধরিয়া কত কোটী প্রাণী আশ্রয় লাভ করিয়া রহিয়াছে। এই খ্রীষ্ট ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রসারের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ দানধর্ম্মও ছড়াইয়া পড়ে। উক্ত দান-ধর্ম্ম খ্রীষ্টীয় দ্বৈত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 'সকলে ঈশ্বরের পুত্র,' 'ঈশ্বরাদেশ', "ভগবৎ কর্ম্ম" এই সকল দ্বৈতপ্রধান

নীতি দাতার প্রেরয়িতা ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের যে দানের কথা বিশ্ববিখ্যাত ছিল এই প্রেরণাই তাহার মূলীভূত কারণ। কিন্তু সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, ঘোর রজোগুণসম্পন্ন জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় উহার Catholicity বা উদার ভাব ধীরে ধীরে সম্প্রদায়িকতায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। ক্রমে জড়বিজ্ঞানের উত্থানের সহিত উহা কখনও বা নামে মাত্র ধর্ম্মহেতু, কখনও বা একেবারে ধর্ম্মভিত্তিহীন Philanthropy নাম গ্রহণ করিয়া জাতীয় শক্তি রক্ষা এবং বিস্তারের যন্ত্রস্বরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। পরে ইংরাজের ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যস্থাপনের সহিত নানাবিধ পাশ্চাত্য হিতসাধন মণ্ডলীও প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে উহা মহা-কার্য্যকরী হয়। ঐ সকল সম্প্রদায়ের প্রসাদে ভারতীয় নানা ইতর জাতি মনুষ্যপদবাচ্য হইয়াছে এবং বহু নিম্ন সমাজ উচ্চ সমাজের অমানুষিক উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কেবল নিম্ন সমাজ কেন, উচ্চ সমাজও ঐ সকল সম্প্রদায়ের দ্বারা বিশেষরূপে অনুগৃহীত।

পাশ্চাত্য এই সকল হিতসাধন সম্প্রদায় দেখিয়া ভারতবর্ষীয় জনসমাজের মনে পুনরায় তাহাদের অতীত গৌরব কাহিনী জাগিয়া উঠিল বটে, কিন্তু উহা পাশ্চাত্যানুকরণে কতকটা আধ্যাত্মিক ভিত্তিহীন হইয়া প্রকটিত হইতে লাগিল। ভারতীয় বদান্য ব্যক্তিদের উৎসাহে বহু বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, কিন্তু ঐ পরোপকার ব্রতের প্রতিষ্ঠা হইল জড়বাদ এবং মাত্র জাতীয়তার উপর। তখনও অস্মদ্দেশীয় লোকেরা উহার প্রকৃত দার্শনিক ভিত্তি কোথায় খুঁজিয়া পান নাই। যদিও ইদানীং অনেকে সেবাধর্ম্মের নানারূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন, কিন্তু আচার্য্য বিবেকানন্দের পূর্ব্বে পরোপকার ব্রতের যে কোনও রূপ দার্শনিক ভিত্তি থাকিতে পারে, উহা যে ধর্ম্মের অঙ্গ, রাজনীতি বা সমাজ নীতির দিক্ দিয়া না দেখিলেও কেবলমাত্র উহা দ্বারাই যে দেশ, সমাজ এবং জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহা কাহারও মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয় নাই। স্বামীজিই সর্ব্বপ্রথম ঐ দান-

ধর্ম্ম বা পরোপকার ব্রতকে অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার প্রকৃতিকে প্রেমাত্মক করিয়া উহার সেবাধর্ম্ম নাম সার্থক করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর জীবের দেহান্তর-প্রাপ্তি প্রকরণ ভাষ্যে একস্থলে বলিতেছেন—"ইষ্টাদিকারীরা কর্ম্মী, তাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহে, সেই জন্য তাহারা দেবগণের উপভোগ্য বা ভোগোপকরণ।" শ্রুতিও অনাত্মজ্ঞ জীবের দেবভোগ্যতা দেখাইয়াছেন। যথা, "যে উপাসক আত্মভিন্ন দেবতার উপাসনা করে, আমি এই ও ইনি আমার উপাস্য এইরূপ ভেদ বুদ্ধি অবলম্বন করে, সে আপনাকে জানে না অর্থাৎ সে অনাত্মজ্ঞ। যদ্রূপ পশু; সেও দেবগণের নিকট তদ্রূপ। সে ইহ-লোকে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা দেবগণের সন্তোষ উৎপাদন করতঃ পশুর ন্যায় উপকার করে এবং পরলোকেও দেবোপজীবী হইয়া দেবতাদের আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মের ফল ভোগ ও পশুর ন্যায় দেবোপকার করিতে থাকে। ইষ্টাদিকর্ম্মকারীরা কেবল কর্ম্মী, আত্মবিৎ নহে অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ানুষ্ঠায়ী নহে। অনাত্মজ্ঞ জীব দেবভোগ্য হয়।" অর্থাৎ শাস্ত্র আদেশ করিতেছেন জ্ঞান পূর্ব্বক সৎকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কেন সৎকর্ম্ম করিব? উহার দার্শনিক ভিত্তি কি? বৈদিক যুগে উহা দেবতা (বিদ্যা) ও জীব-সংসরণ-গতি (পঞ্চাগ্নি বিদ্যা) জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রকরণে যে 'আত্মজ্ঞ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, উহার অর্থ দেবতা ও জীব-সংসরণ-গতি জ্ঞান (বিদ্যা)। অনাত্মজ্ঞ অর্থে যিনি উক্ত জ্ঞান বা বিদ্যা সম্পন্ন না হইয়া ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম (অবিদ্যা) করেন। বিদ্যাযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে দেবত্বাদি ব্রহ্মলোক লাভ করা যায় এবং অবিদ্যা যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে পিতৃলোকাদি অল্পকালস্থায়ী সুখভোগ করা যায়।

কিন্তু স্মৃতিযুগে উক্ত ইষ্টাপূর্ত্তদত্ত দান ধর্ম্ম নামে প্রথিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হইল। পরে ঐতিহাসিক যুগে ঐ দান ধর্ম্ম হৃদয়বত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরোপকার ব্রত বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। পরে উহা যখন

যেরূপ আধার পাইয়াছে, তখন তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নানা দার্শনিক মতের সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা সংক্ষেপে এক এক করিয়া সেগুলির আলোচনা করিতেছি—

বৈদিকযুগে ইষ্টাপূর্ত্তাদির বিধান ছিল। ইহা দ্বারা স্বর্গাদি অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারা যায়। কিন্তু সে ভোগ সান্ত। শাস্ত্র বলিতেছেন, 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি'। তবে এই গতাগতির লাভ কি? ইহা দ্বারা ত নিত্য আনন্দের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

কিন্তু যদি নিষ্কাম ভাবে দান ধর্ম্মের পালন কর তাহা হইলে বাসনারূপ চিত্তের কলুষ দূর হইয়া তুমি জ্ঞান, ভক্তি লাভ করিতে পারিবে, যাহা দ্বারা মুক্তি অনিবার্য্য। কিন্তু তুমি ত সৎকর্ম্ম কর নিজের জন্য। আজ যদি ভগবান্ তোমাকে হঠাৎ মুক্তিদান করেন, তাহা হইলে তুমি ত অজ্ঞানান্ধ, দীন হীন আমাদের প্রতি একবারও তাকাইবে না। দার্শনিক ভাষায় তুমি আত্মতৃপ্ত হইতে পার কিন্তু গ্রাম্য ভাষায় তুমি স্বার্থপর!

কিন্তু দয়া অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই। নিষ্কাম সৎকর্ম্ম যদি দয়ার দ্বারা অলঙ্কৃত হয় তাহা হইলে পরোপকার ব্রতের যথার্থ দার্শনিক ভিত্তি আমরা পাইতে পারি।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, দয়ারূপ বৃত্তিতেও আমাদের যথেষ্ট স্বার্থ আছে। দয়াপরবশ হইয়া পরার্থে যে ত্যাগ কর তাহাতে কত আনন্দ হয় বল দেখি? তুমি নিজের কষ্ট দূর হইলে যেরূপ আনন্দ উপভোগ কর সেইরূপ অপরের কষ্ট লাঘব করিলে সেই আনন্দ তুমি নিশ্চই ভোগ করিতে পার। কিন্তু আনন্দই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে তোমার যেরূপ ত্যাগের দ্বারা আনন্দ, আমার সেইরূপ ভোগের দ্বারা আনন্দ বোধ হয়। এরূপ যথেষ্ট কার্য্য আছে যাহাতে তোমার কষ্ট হইতে পারে কিন্তু আমার তাহাতে বিশেষ আনন্দ লাভ হয়।

ইহার উত্তরে বলিতে হয়—কিন্তু ভগবানের এবং শাস্ত্রের

আদেশ ত মানিতে হইবে। আমরা সকলে তাঁহার সন্তান, শাস্ত্র তাঁহার বাণী। তিনি যখন সকলকে অন্ধকার হইতে আলোকে, অশান্তি হইতে শান্তিতে লইয়া আসিবার আদেশ করিয়াছেন তখন উহা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

তিনি হয়ত বলিবেন—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভগবান্ অন্ধকার, অশান্তি সৃষ্টি করিয়া পুনরায় তাহা দূর করিবার আদেশই বা প্রচার করিলেন কেন? আমি আজীবন দুঃখ ভোগ করিতেছি, অপরে আজীবন ভগবৎ প্রদত্ত সুখ ভোগ করিতেছে, এই অবিচার সত্ত্বেও আমি অপরকে সাহায্য করিতে যাইব কেন? সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ইচ্ছা করিলেই ত সকলের দুঃখের লাঘব করিতে পারেন। তিনি কি অশক্ত হইয়াছেন যে তাঁহার সন্তানদিগকে অপরের সাহায্য করিতে হইবে? ইহা ত ভগবানের পক্ষে অতি কলঙ্কের কথা। কর্ম্ম ফলের দ্বারা ইহার কোনও মীমাংসা হইতে পারে না। কর্ম্মফল আমরাও মানি, কিন্তু ভগবানের আদেশ মানিবার প্রয়োজন আমরা বোধ করি না।

তদুত্তরে বলা যাইতে পারে—ভগবানের আদেশ মান বা না মান যখন আমরা সমাজে বাস করিতেছি তখন আমাদিগকে পরস্পর সাহায্য করিয়া চলিতেই হইবে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরের অপেক্ষা করিয়া চলিতে হয়। সমাজ একটি বৃহৎ যন্ত্রস্বরূপ। কোন একটি যন্ত্রকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখিতে হইলে উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি অটুট রাখা প্রয়োজন, নচেৎ তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ জন-সমাজের প্রত্যেক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে আমাদের সাহায্য করা প্রয়োজন, নচেৎ সমাজযন্ত্রটি শিথিল হইয়া একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িবে। সমাজে দুঃখ দারিদ্র্য থাকা মানে, ঐ যন্ত্রটির কোনও না কোন স্থানটি বিগড়াইয়াছে। সমাজরূপ দেহের স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে হইলে দেহের সকল অংশই সবল সুস্থ রাখিতে হইবে। কিন্তু তোমরা যে জনসমাজের প্রত্যেক ব্যষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া "Greatest good of the greatest number" এই নীতির অনুসরণ করিতে চাও, সামান্যতঃ উহার ব্যবহার চলে না। কারণ,

সমাজশরীরের যথেষ্ট অব্যবহার্য্য অঙ্গ আছে, যাহাদের উপকারিতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অতএব তাহাদের পরিত্যাগ নিষেধ করিতে পার না। কিন্তু তোমার হৃদয় তাহা করিতে দিবে না। সমাজেরও ভিন্নতা দৃষ্ট হয়—এক সমাজ অপর সমাজের বিরোধী। যদি বিভিন্ন সমাজ নিজ নিজ উন্নতি সাধন করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে অপরের নাশের দ্বারা। লোকে ইহাই দৃষ্ট হইতেছে। আর যে সমাজদেহের সর্ব্বাঙ্গীন সুস্থতা কল্পে অতি দীনহীনকেও সাহায্যের প্রয়োজন দেখাইয়াছ, তাহারই বা সার্থকতা কোথায়? সমগ্র সমাজসঙ্ঘের সাধনার সে সমষ্টি ফল, ব্যক্তিগত জীবনে তাহার ভোগের ভয়ানক অবিচার দৃষ্ট হওয়ায়, ঐ সঙ্ঘের নিম্ন শ্রেণীর লোকগণ—যাহারা ঐ ফলভোগ হইতে বঞ্চিত তাহারা—তোমার ঐ সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছেন এবং একই ভ্রমে পতিত হইয়া পূর্ণ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উপর ব্যক্তি ও সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত। কিন্তু সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার দার্শনিক ভিত্তি কোথায় এবং কোন্ সর্ব্বশক্তিমান্ দিব্য জ্ঞান সকল ব্যক্তির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত করিতে পারে তাহা তাঁহারা অবগত নন। অধিকন্তু, তাঁহারা যেমন নিজ নিজ স্বার্থকে লক্ষ্য করিয়া পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া নূতনকে গড়িয়া তুলিতে চান, সেইরূপ সমাজসঙ্ঘের উচ্চশ্রেণীরও যে স্বার্থ বর্ত্তমান সে বিষয়ে তাঁহারা কথঞ্চিৎ অন্ধ বলিলেও চলে।

এই যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীশঙ্করের মস্তিষ্ক এবং শ্রীচৈতন্যের হৃদয় সমবায়ে এমন এক মহাপুরুষের বঙ্গদেশে আবির্ভাব হইল যিনি অবলীলাক্রমে অদ্বৈত পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া প্রেম নির্ঝরিণীর আবিষ্কার করিলেন এবং সেই বার্ত্তা সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের নিকট বহন করিলেন। অদ্বৈত পর্ব্বতের কঠিন হৃদয়নিঃসৃত "রস"-তৃপ্তমানব আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য লাভ করিয়া, বুঝিতে পারিল বহুকালের একদেশী চিন্তায় তাহার মস্তিষ্ক কত দুর্ব্বল, স্ব স্ব ভোগসুখ চরিতার্থ করিতে গিয়া হৃদয় কত সংকীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে

অদ্বৈতরসতৃপ্ত মানবহৃদয় এক নব ভাবে মাতোয়ারা। প্রেমিক মানবহৃদয় এখন বুঝিতেছে যে, এক অস্তি-ভাতি-প্রিয় রূপ সত্তা জীব জগৎ ঈশ্বর হইয়া ক্রীড়ায় মত্ত। সে আনন্দরসক্রীড়ায় ভক্তের ভগবৎসেবার অপূর্ব্ব অবসর। এত দিন আমরা অনুমানের উপাসনা করিয়া আসিয়াছি—শালগ্রাম, শিবলিঙ্গ, ক্রুশ, প্রতিমা, মনোময়ীমূর্ত্তি, জ্যোতিঃতে চৈতন্য বুদ্ধি করিয়া সেই চৈতন্যের উপাসনা করিয়াছি, কিন্তু এখন এস প্রেমিক, এস ভক্ত, আমরা বর্ত্তমানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হই। এখানে অনুমানের স্থান নাই—জীবন্ত চৈতন্য খেলিয়া বেড়াইতেছে।

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥"

সমগ্র জীবন এখন আর হেয় বা ভোগদুষ্ট নয়, উহা আজীবন তপস্যা এবং পূজা—সকলই পরার্থে, সেই পরপুরুষের নিমিত্ত। এখন আর কর্ম্ম নয়, উহা সেবা বা পূজা। চণ্ডালের পথমার্জ্জন, রাজার রাজ্যশাসন, কৃষকের হলচালন, বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা সমস্তই এখন সর্ব্বভূতান্তর্যামীর পূজার অঙ্গীভূত। ব্রহ্মবাদীর অধ্যয়ন, গৃহস্থের ধর্ম্ম, বানপ্রস্থীর তপস্যা, সন্ন্যাসীর মোক্ষ এখন একই স্বরাটের উপাসনার উপকরণভেদ মাত্র।

এই জীবন্ত ভগবৎসেবা আজীবন ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুই প্রকারের ত্যাগী সাধক আছেন—যিনি সংসারে সুখ দুঃখে বীতরাগ, বিবিক্তদেশসেবী এবং সর্ব্বদা পরমেশ্বরের নিত্যস্বরূপ ধ্যানে রত, জীবের সুখে বা মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে যাঁহার বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য আসে না—তিনি আত্মসুখী ত্যাগী। আর যিনি এই সংসারে বাস করেন কিন্তু ইহার সুখ দুঃখ ভোগ করেন না, সর্ব্ব-ভূতান্তর্যামী পরমাত্মীয় আত্মার সর্ব্বভূতে স্ফুরণ দর্শন করিয়া সকল দ্বন্দ্ব সহ্য করেন এবং আজীবন ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন তিনি ভক্ত ত্যাগী। আচার্য্য বিবেকানন্দ এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মহাপুরুষ। তিনি কেবল নিত্যের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন না। বর্ত্তমান শ্রীভগবানের

বিরাট্ লীলার তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। তিনি তাঁহার পত্রাবলীতে যে বিরাট্ উপাসনার পূজাপদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে সংক্ষেপে তাহার বিবৃতি করিতেছি:—আমি মুক্তি বা ভোগ কামনা করি না। সকল জীবের সমষ্টিস্বরূপ শ্রীভগবান্—একমাত্র যাহাতে আমি বিশ্বাস করি—তাঁহার পূজার নিমিত্ত যদি আমাকে বহুবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, যদি সহস্র যন্ত্রনায় তাড়না সহ্য করিতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত। আমার ভগবান্ সর্ব্বজাতির, সর্ব্ববর্ণের দুষ্ট, দুঃখী, দরিদ্র। যিনি দৃষ্ট—সত্য—যাঁহাকে আমরা প্রত্যক্ষ জানি—যিনি উচ্চ নীচ, মহাপুরুষ পাপী, দেবতা কীটে সমভাবে বর্ত্তমান, তাঁহার উপাসনা কর, অপর প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেল। যাঁহাতে আমরা ছিলাম, আছি ও থাকিব—যাঁহার সহিত আমরা এক—যিনি অতীত এবং ভবিষ্যৎ জীবন বর্জ্জিত, তাঁহার উপাসনা কর, অপর প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেল। রে বাতুল! তুমি কাহাকে সাহায্য করিবে? তুমি তোমার নিজের জন্য ইচ্ছামত কিছুই করিতে পার না, তুমি পিপাসিত হইয়া এক পাত্র জলপান করিতে গেলে উহা হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়, তুমি আবার কাহার কি করিবে? বরং তুমি তাঁহার সেবা কর—সর্ব্বভূতে তাঁহার পূজায় ব্রতী হও—আত্মস্বরূপের পূজায় পৌরোহিত্য গ্রহণ কর।

আমাদের পল্লীগ্রামের অবস্থা ও তাহার প্রতিকারের উপায়।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দাতব্য চিকিৎসালয়ের ন্যায় "দরিদ্র ভাণ্ডার" আর একটী অনুষ্ঠান। প্রত্যেক গ্রামেই অন্ততঃ দু একটি ব্যক্তি বা পরিবার আছে যাহাদের বাৎসরিক অন্ন সংস্থানের কোন উপায় নাই। ইঁহারা ভদ্রসন্তান বলিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন না, কাজেই সম্বৎসরের মধ্যে অধিক দিবসই ইঁহাদের উপবাস বা অর্দ্ধোপবাসে অতিবাহিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে নিয়মিত সাহায্য দান কল্পে একটি "দরিদ্র ভাণ্ডারের" বিশেষ প্রয়োজন। এই ভাণ্ডারের নিমিত্ত বহুল অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে না—মাত্র সাধারণ মুষ্টিভিক্ষাতেই এই অনুষ্ঠানটি বেশ চলিয়া যাইতে পারে। সুতরাং যখন সেবকগণ সাধারণের বিশ্বাস ও সহানুভূতিভাজন হইবেন, তখন তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যেক বাড়ী হইতে দৈনিক এক মুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা সংগ্রহ করা অতি সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে। অবশ্য এই ভিক্ষা সপ্তাহে, পক্ষে বা মাসে একদিন সংগ্রহ করিলেই হইবে—গৃহস্থগণ প্রতিদিন একমুষ্টি তণ্ডুল কোন পাত্রে জমাইয়া রাখিবেন। আমাদের দেশের গৃহস্থগণ নিজের দারিদ্র্য সত্ত্বেও গৃহাগত ভিক্ষুক বা অতিথিকে ফিরাইয়া দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন — কাজেই নিঃস্বার্থ ভদ্রসন্তানগণের আবেদনে প্রতিদিন একমুষ্টি তণ্ডুল দান তাঁহারা অনায়াসে এবং আনন্দের সহিতই করিবেন।

কিন্তু একটি কথা, গৃহস্থগণের মনে যদি কোনও কারণে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে মুষ্টিভিক্ষার তণ্ডুলের অপব্যয় হইতেছে—সেবকদিগের বনভোজনে উহার কিয়দংশ ব্যয়িত হইয়াছে--তাহা হইলে তাঁহারা মুষ্টিভিক্ষা বন্ধ করিয়া দিবেন। এইরূপ সন্দেহের কোনও কারণ

যাহাতে উপস্থিত না হয় তজ্জন্য সেবকদিগকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। প্রতি সপ্তাহে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের পর তণ্ডুল ওজন করিয়া হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং বিতরণের পরেও বিতরিত তণ্ডুলের সঠিক ওজন খরচের খাতায় লিখিয়া রাখিতে হইবে। পরে মাসান্তে, ষণ্মাসান্তে বা বৎসরান্তে সাহায্যদাতৃগণের নিকট জমা খরচের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব প্রকাশ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে সেবকদিগের প্রতি সাধারণের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবে। উল্লিখিত অনুষ্ঠান দুইটি পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে সেবকগণ পল্লীস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কয়েকটি অতি অল্পব্যয়সাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বে পল্লীস্বাস্থ্যের অবস্থা বর্ণনা করিবার সময়ে যে যে অল্লায়াসসাধ্য এবং অল্পব্যয়সাপেক্ষ সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছি, সেবকগণ সেইগুলির অনুষ্ঠানও করিতে পারেন।

কিন্তু এই সংস্কার কার্য্য করিবার নিমিত্ত সেবকদিগকে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহারা কোনও সংস্কার কার্য্যের প্রচার করিবার পূর্ব্বে আপনারা উহার অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ অভ্যস্ত হইবার পর বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্য পল্লীবাসীর নিকট কু অভ্যাসটির তীব্র সমালোচনা না করিয়া, মিষ্ট ভাষায় উহার কুফল ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন এবং বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে ঐ অভ্যাসটি ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। তৃতীয়তঃ, এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে হইলে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। এক ব্যক্তিকে দিনের পর দিন অনুরোধ করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, অনেক সময়ে জড়তা নিবন্ধন আমরা নূতন কিছু করিতে পারি না। সেবকগণ যদি স্বীয় শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অপরকে এই সব বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন, তাহা হইলে সহজেই কৃতকার্য্য হইবেন। তাঁহারা অবসরানুযায়ী কাহারও বাড়ীতে একটি ফিল্টার তৈয়ারী করিয়া দিবেন, কাহারও বাড়ীর চতুঃপার্শ্বস্থ বনজঙ্গল ও আবর্জ্জনা সাফ করিয়া দিবেন, কাহারও বাড়ীর জল নিকাশের পথ করিয়া দিবেন ইত্যাদি। এইরূপভাবে সহায়তা করিয়া সেবকগণ

যদি নম্রভাবে কোনও সংস্কারবিশেষের জন্য কাহাকেও অনুরোধ করিতে থাকেন, তাহা হইলে মনে হয় তাহার জড়বৎ শরীরেও জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইবে।

জল গরম করিয়া ফিল্টারে ছাঁকিয়া লওয়া, গৃহের ভিতরের ও বাহিরের আবর্জ্জনা মুক্ত করা, পুষ্করিণীতে প্রস্রাব শৌচাদি বন্ধ করিবার নিমিত্ত ঘটি বা গাড়ু ব্যবহার করা এবং রমণীগণের শৌচাদির জন্য টাট্ বাঁধিয়া দেওয়া, মশারি ব্যবহার করা, পরিধেয় বসনের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, ধুনাগন্ধকের ব্যবহার করা, আঁতুড়ঘরের সুব্যবস্থা করা প্রভৃতি এই শ্রেণীর সংস্কার কার্য্যের মধ্যে গণ্য।

এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্ম্মের দ্বারা যখন সেবকগণের উপরে সর্ব্ব-সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ় হইবে তখন তাঁহারা আর একটি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। গ্রামে "সমবায়-সমিতি" গঠনই এই তৃতীয় অনুষ্ঠান। এ বিষয়ে সেবকগণের প্রথম কার্য্য, সমবায়-সমিতির দ্বারা কিরূপে সর্ব্ব-সাধারণ উপকৃত হইতে পারেন ইহা তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া।

বস্তুতঃ, আমরা পূর্ব্বে কৃষকদিগের দারিদ্র্যের যে কারণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছি তৎসমুদয়ই এই সমবায়-সমিতির দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে। এই সমবায়-সমিতি গঠন করিতে হইলে প্রথমতঃ মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। গ্রামস্থ মধ্যবিত্ত, দীন মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী-দিগের নিকট হইতে এই অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। তাঁহারা যেমন বারোয়ারী, যাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য অর্থদান করিয়া থাকেন, এই সমবায়-সমিতির জন্যও তদ্রূপই করিবেন। বরং বারোয়ারীর চাঁদা সমুদয়ই ব্যয়িত হয় এবং গ্রামবাসীদিগের লাভের মধ্যে যাত্রা শুনার ক্ষণিক আনন্দ, কিন্তু সমবায়-সমিতিতে তাঁহারা যে অর্থ প্রদান করি-বেন তাহা মূলধনরূপে একটি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিবে এবং বৎসরান্তে প্রত্যেকে লাভের কিছু কিছু অংশ পাইবেন। এতদ্ব্যতীত সমবায়ের ব্যবসায়গুলিতে প্রত্যেকে বিশেষ আর্থিক সুবিধা ভোগ করিবেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, পল্লীবাসিগণ এই সমবায়-

সমিতিতে অর্থদান করিলে তাঁহাদের একটি চিরস্থায়ী লাভের ব্যবস্থা হইবে।

যিনি ১০৲ টাকা সমিতিতে দিবেন তিনিই সমিতির সভ্য হইবেন। তিনি ১০৲ টাকার অনুযায়ী লাভাংশ ও সমিতির অনুষ্ঠিত প্রত্যেক ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবেন। এই ১০৲ টাকা এককালীন না দিয়া প্রতি মাসে ২॥০ টাকা করিয়া চারি মাসে দিলেও চলিবে। যখন সেবকগণ সাধারণের বিশ্বাসভাজন হইবেন তখন তাঁহাদের পক্ষে সমবায়-সমিতির মূলধন সংগ্রহ করা আদৌ শক্ত হইবে না।

এইরূপে সংগৃহীত মূলধনের এক অংশ দ্বারা গ্রামে একটি দোকান খুলিতে হইবে। এই দোকানে বস্ত্র, তৈল, লবণ, চিনি, মশলা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য পাইকারী দর অপেক্ষা সামান্য অধিক দরে দেওয়া হইবে। বড় মহাজনদিগের নিকট হইতে এই দ্রব্যাদি পাইকারী দরে ক্রয় করিয়া অতি সামান্য লাভাংশ রাখিয়া গ্রামে বিক্রয় করিতে হইবে। মেম্বর ব্যতীত অপর কাহাকেও এত অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হইবে না। অবশ্য যদি গ্রামে এমন কেহ থাকেন যাঁহার সমিতির সেয়ার ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই, তাহা হইলে সেবকগণ চাঁদা তুলিয়া তাঁহার জন্য একটি সেয়ার ক্রয় করিয়া দিবেন। তথাপি মেম্বরগণের সুবিধা অপর কাহাকেও ভোগ করিতে দেওয়া হইবে না।

এই দোকানে অন্ততঃ একজন দোকানদার নিযুক্ত করা প্রয়োজন হইতে পারে। কাজেই লাভের একাংশ এই দোকানদারের মাহিনার জন্য ব্যয় করিয়া অপরাংশ বৎসরান্তে মেম্বরগণের মধ্যে করিয়া দিতে হইবে। সপ্তাহে বা পক্ষে একদিন দোকানের হিসাব ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। দোকানদারের হস্তে সমস্ত সমর্পণ করিয়া সেবকগণ নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। এমন কি, দ্রব্যাদি ক্রয়ও সেবকগণ নিজেরা করিলেই ভাল হয়।

সমিতির দ্বিতীয় অনুষ্ঠান অল্পহারে ঋণদান। বৎসরে শতকরা ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা সুদে ঋণদান করিতে পারিলে পল্লী সমাজের, এমন কি, সমগ্র দেশের যে কতদূর উপকার সাধিত হয়

তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমাদের গভর্ণমেণ্টও দেশ হইতে দারিদ্র্যের এই কারণটি দূর করিবার মানসে গ্রামে গ্রামে সমবায়-সমিতি গঠন করিয়া অল্পহারে ঋণদানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

আমাদের সেবকদিগের চেষ্টায় অনুষ্ঠিত সমবায়-সমিতির পক্ষে অল্পহারে ঋণদানের ব্যবস্থা করা অতি সহজসাধ্য। তবে এই বিষয়ে দুইটি সমস্যা আমাদের মনে উদয় হয়। তাহাদের মধ্যে প্রথমটি এই যে, যদি কেহ ঋণগ্রহণ করিয়া পরিশোধ না করে তাহা হইলে কি সেবকগণ আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিবেন? এইরূপ কার্য্য কিন্তু সেবকগণের রুচিবিরুদ্ধ। কিন্তু মনে হয়, চারিটি ব্যবস্থাতে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। প্রথমতঃ, সেবকদিগের নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা তাঁহারা দীন মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবিগণের বিশেষ শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালবাসা পাইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা যদি ভাল করিয়া এই দরিদ্র সমাজকে বুঝাইয়া দেন যে, তাহাদেরই প্রভূত উপকার সাধনের নিমিত্ত এই অনুষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকেই এই অনুষ্ঠানটির অহিতাচরণ করিতে কোন প্রকারে প্রয়াসী হইবে না। আমাদের এই সত্যটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে যথার্থ ভালবাসা ও নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা তস্করের চরিত্রও পরিবর্ত্তিত হয়। তৃতীয়তঃ, মেম্বর ব্যতীত আর কাহাকেও এত অল্পহারে ঋণদান করা হইবে না। তাহা হইলে ঋণী ব্যক্তির অন্ততঃ ১০৲ টাকা ত সমবায়-সমিতির দখলেই থাকিবে। চতুর্থতঃ, কোন ব্যক্তিকে ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে অপর তিন বা চারি ব্যক্তিকে তাহার ঋণের জন্য দায়ী হইতে হইবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে ঋণের অর্থ অনেকটা নিরাপদ হইবে। এই পদ্ধতিটিতে ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে খুবই সফলতা দেখা গিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে ইহা যথাযথভাবে কার্য্যকরী হইবে কিনা বলা যায় না। উপস্থিত আমাদের দেশে কেহ কাহারও দায়িত্ব লইতে সহজে স্বীকৃত হন না এবং যদিও দায়িত্ব গ্রহণ করেন তথাপি তাঁহার দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে এই পদ্ধতিটি প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ, যে সকল ব্যক্তি কোনও ঋণীব্যক্তির

দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পারিবেন যে, ঐ ব্যক্তি কোনও প্রকারে অর্থের অপচয় না করেন, এবং ঐ ব্যক্তির অর্থাগমের সময় আসিলেই তাঁহারা উহার নিকট হইতে ঋণের অর্থ আদায় করিতে পারিবেন। যদি কোনও কৃষক ঋণ গ্রহণ করে এবং যদি তাহার জমির মালিক তাহার ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে ফসল তুলিবার সময়েই তিনি তাহার নিকট হইতে ঋণের অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।

ঋণ দান বিষয়ে দ্বিতীয় সমস্যা এই যে, যদি এককালীন বহু লোক এত টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে যাহা সমবায়-সমিতির পক্ষে দান করা অসম্ভব, তাহা হইলে কি করা হইবে? এই বিষয়ে একটি কথা জানিলেই এই সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে। কৃষকগণ সাধারণতঃ খুব সামান্য অর্থের জন্য ঋণবদ্ধ বা চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাদের বহু অর্থের প্রয়োজন কচিৎ দৃষ্ট হয়। তারপর সমবায়-সমিতি নিজ মূলধন অনুযায়ী কত টাকা পর্য্যন্ত এক ব্যক্তিকে ঋণ দান করিতে পারেন তাহা যদি স্থির করিয়া লন তাহা হইলে এই সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হয়।

আমাদের দারিদ্র্যের একটি প্রধান কারণ কৃষির অবনতি। সমবায়-সমিতির চেষ্টায় এই কারণটিও দূর করা যাইতে পারে। সেবকগণ যদি স্থানীয় কৃষিবিভাগের ইনস্‌পেক্টরের সহিত আলাপ করিয়া এবং কৃষিতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করিয়া আমাদের কৃষিক্ষেত্রে যে সকল বিজ্ঞানসম্মত সার, যন্ত্র এবং নূতন শস্যের বীজ বিশেষ উপযোগী সেই সকল সমবায়-সমিতির অর্থে ক্রয় করিয়া কৃষকদিগের নিকট অল্প মূল্যে বিক্রয় করেন এবং অল্পহারে ভাড়া খাটান তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই কৃষির উন্নতি সাধিত হইতে পারে। মনে করুন, যদি সমবায়-সমিতি একটি Hand Pump ক্রয় করিয়া ঘণ্টায় দুই বা চারি পয়সা হারে ভাড়া খাটান, তাহা হইলে কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের কত সুবিধা হয়। সমবায়-সমিতির আর্থিক অবস্থা যদি বিশেষ স্বচ্ছল হয় তাহা হইলে সেবকগণ কৃষিক্ষেত্রে কূপ আদি খননের ব্যবস্থাও করিতে

পারেন। সাধারণতঃ পল্লীবাসিগণ নগদ টাকা খরচ করিতে পারেন না। এই জন্যই কৃষিক্ষেত্রে কূপাদি খননের আবশ্যকতা অনুভব করিলেও কেহ সহজে ঐরূপ কার্য্যে হাত দেন না। যদি পাশাপাশি কয়েকখানি জমির সত্বাধিকারিগণ একটি কূপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সমবায়-সমিতির নিকট হইতে উপযুক্ত অর্থ কর্জ্জ করিয়া কূপটি খনন করাইয়া লইতে পারেন এবং বৎসরান্তে শস্য বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন। একটি কাঁচা কূপ খনন করিবার খরচ ২৫।৩০৲ টাকা এবং পাঁচ ছয় জন একত্র হইয়া এই কার্য্য করিলে প্রত্যেকের ঋণভার অতি সামান্যই হয়। এইরূপে যদি সেবকগণ পল্লীবাসী কৃষিজীবীদিগকে কূপের প্রয়োজনীয়তা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন এবং উপযুক্ত ঋণ দান করিয়া কূপ খননের সহায়তা করিতে পারেন তাহা হইলে কৃষিক্ষেত্রে জলের অভাব দূর করা অতি সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে।

কৃষিক্ষেত্রোপযোগী যন্ত্রের ন্যায় ইক্ষুপেষণ যন্ত্র, ধান এবং দাল ভাঙ্গার যন্ত্র, ঘৃত মাখমাদি প্রস্তুতকরণ যন্ত্র, নানাবিধ ফল হইতে আচার ও মোরব্বা প্রস্তুতকরণ যন্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করিয়া সমবায়-সমিতি ভাড়া খাটাইতে পারেন।

কৃষকদিগের দারিদ্র্যের চতুর্থ কারণ অল্প মূল্যে শস্য বিক্রয়। দুইটি ব্যবস্থার দ্বারা সেবকগণ কৃষকদিগকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা যথাসময়ে সমবায়-সমিতি হইতে কৃষকদিগকে ঋণ দান করিয়া দাদন গ্রহণ ও অসময়ে শস্য বিক্রয়রূপ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামের মধ্যে একটি শস্যাগার নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানে কৃষিদিগের পণ্যদ্রব্য জমা করিয়া উপযুক্ত সময়ে উহা সহরের বড় মহাজনের নিকটে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিলে, সেবকগণ কৃষকদিগকে অল্পমূল্যে শস্য বিক্রয়রূপ ভীষণ সঙ্কট হইতে ত্রাণ করিতে পারেন। একস্থানে বহু শস্য মজুত হইলে মহাজনগণ আপনারাই সেখান হইতে শস্য ক্রয় করিয়া লইতে আসিবেন—সেবকদিগকে হাটে শস্য লইয়া যাইবার ব্যবস্থাও বোধ হয় করিতে

হইবে না। এই কার্য্যটি করিবার জন্য সমবায়-সমিতি শস্য বিক্রয়ের অর্থ হইতে অল্পহারে কিঞ্চিৎ লাভাংশ রাখিয়া দিবেন। এখানেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমবায় সমিতির মেম্বর ব্যতীত অপর কোন কৃষকই এই সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না।

সমবায়-সমিতি কিরূপে দারিদ্র্যের চারিটি কারণ দূর করিতে পারেন তাহা আলোচনা করা হইল। কিন্তু এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মূলধন অধিক না হইলে সমবায়-সমিতির সকল অনুষ্ঠানগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। মূলধন যতই অধিক হইবে সর্ব্বসাধারণ ততই লাভবান্ হইবে। মূলধন বৃদ্ধি করিবার জন্যই মেম্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও কোন সুবিধা ভোগ করিতে দেওয়া উচিত নহে। সুবিধা পাইবার জন্য বাধ্য হইয়া সকলেই মেম্বর হইবে। এ বিষয়ে কোন প্রকার কোমলতা প্রদর্শন করিলে এই সুন্দর অনুষ্ঠান-টির ক্রমবর্দ্ধনের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পাশাপাশি দুই তিনখানি গ্রাম সমবেত হইয়া সমবায়-সমিতি গঠন করিলে মূলধন অধিক হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। প্রচারকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে একটি বড় গ্রামেও অনায়াসে সমবায়-সমিতির কার্য্য সুন্দর ভাবে চলিতে পারে।

(সমাপ্ত)

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

(জীবন্মুক্তি স্বরূপ)

(পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে, (১) জীবন্মুক্তি কাহাকে বলে? (২) জীবন্মুক্তি বিষয়ে প্রমাণ কি? (৩) কি প্রকারেই বা জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে? (৪) জীবন্মুক্তি সাধনের প্রয়োজনই বা কি?

(তদুত্তরে বলা যাইতেছে)—শরীরধারী লোকমাত্রেরই চিত্তে "আমি কর্ত্তা," "আমি ভোক্তা," (ইত্যাদি রূপ অভিমান) ও (বিবিধ প্রকার) সুখ দুঃখ দৃষ্ট হয়—তাহারা চিত্তের ধর্ম্ম। ক্লেশস্বরূপ বলিয়া তাহারাই পুরুষের বন্ধন। সেই বন্ধনের নিবারণই জীবন্মুক্তি।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, এই বন্ধন নিবারিত হইবে কোথা হইতে? (সুখ দুঃখাদি চিত্তধর্ম্মের) সাক্ষী বা দ্রষ্টা হইতে?—অথবা চিত্ত হইতে? (অর্থাৎ এই বন্ধনটা আছে কোথায়?) যদি বল, 'সাক্ষী হইতে এই বন্ধন নিবারিত হইবে', (তবে বলি) তাহা বলিতে পার না। কেন না, সাক্ষীর প্রকৃত স্বরূপ জানিলেই অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই এই বন্ধন নিবারিত হয়। (বন্ধন যদি সাক্ষীর প্রকৃতিগত হইত তাহা হইলে সাক্ষীর সেই প্রকৃতি বা স্বরূপকে জানিবামাত্রই বন্ধন নিবারিত হইত না। বন্ধন সাক্ষিস্বরূপে নাই বলিয়াই, সাক্ষি স্বরূপ জানিলেই তাহা নিবারিত হইয়া থাকে)। আর যদি বল, 'বন্ধন চিত্ত হইতে নিবারিত হইবে', তবে বলি তাহা অসম্ভব। কেন না, যদি জল হইতে তাহার দ্রবত্ব নিবারণ করা সম্ভব হয়, যদি অগ্নি হইতে তাহার উষ্ণতা নিবারণ করা সম্ভব হয়, তবেই চিত্ত হইতে কর্ত্তৃত্বাদি (অভিমান) নিবারণ করা সম্ভব হইবে, কারণ দ্রবত্ব ও উষ্ণত্ব যেমন জল ও বহ্নির স্বভাবগত ধর্ম্ম, কর্ত্তৃত্বাদিও ঠিক সেইরূপ চিত্তের স্বভাবগত ধর্ম্ম।

(সমাধান)—এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। যাহা স্বভাবগত, তাহার আত্যন্তিক বা সম্পূর্ণরূপ নিবারণ সম্ভবপর না হইলেও, তাহার অভিভব বা আংশিক দমন সম্ভবপর হইতে পারে। যেমন জলের স্বভাবগত দ্রবত্ব, জলের সহিত মৃত্তিকা মিশ্রিত করিলে অভিভূত হইতে পারে, যেমন বহ্নির উষ্ণতা মণিমন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হইতে পারে, সেইরূপ চিত্তের বৃত্তি সমূহকে যোগাভ্যাস দ্বারা অভিভব করিতে পারা যায়।

(শঙ্কা)—ভাল, বলা হইল যে, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সমগ্র অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য নষ্ট হইবে। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম ত আপনার ফল দিতে ছাড়িবে না, সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ঘটাইয়া, আপনার ফল দিবার নিমিত্ত অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি ঘটাইবার নিমিত্ত, দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে নিয়োজিত করিবে। আর চিত্তবৃত্তির সাহায্য বিনা সুখ দুঃখাদির ভোগ সম্পন্ন হইতে পারে না। তাহা হইলে চিত্তবৃত্তির অভিভব কি প্রকারে হইতে পারে?

(সমাধান)—এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কেননা, (চিত্তবৃত্তির) অভিভব দ্বারা যে জীবন্মুক্তির সাধন করিতে হইবে, সেই জীবন্মুক্তিও সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া প্রারব্ধ ফলের মধ্যেই গণ্য। (এই হেতু প্রারব্ধ কর্ম্ম জীবন্মুক্তির প্রতিবন্ধক ঘটাইবে না)।

(শঙ্কা)—তাহা হইলে (প্রারব্ধ) কর্ম্মই জীবন্মুক্তি সম্পাদন করিবে। পুরুষের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন।

(সমাধান)—তোমার, এ আপত্তি ত কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়েও তুল্যরূপে উঠিতে পারে (কিন্তু কৃষি বাণিজ্য বিষয়ে পুরুষের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন—এ কথাত বলা চলে না)

(খণ্ডন)—(প্রারব্ধ) কর্ম্ম স্বয়ং অদৃষ্ট স্বরূপ (অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের নামান্তরই অদৃষ্ট)। তাহা যথোপযুক্ত দৃষ্ট সাধনের সমাবেশ ব্যতিরেকে ফল উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া কৃষি বাণিজ্যাদিতে পুরুষের চেষ্টার অপেক্ষা আছে। (প্রত্যুত্তর) জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে যে আশঙ্কা উঠাইয়াছ তাহারও ঠিক ঐরূপই সমাধান হইবে। কৃষি

বাণিজ্যাদিতে যেস্থলে পুরুষপ্রযত্নসত্ত্বেও ফলোৎপত্তি দেখা যায় না, সেস্থলে ধরিতে হয় যে কোন প্রবল অদৃষ্ট বা কর্ম্ম প্রতিবন্ধক ঘটাই-তেছে। সেই প্রবল অদৃষ্ট বা কর্ম্ম নিজের ফলসাধনোপযোগী অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৃষ্ট কারণসমূহ উৎপাদন করিয়াই প্রতিবন্ধক ঘটায়। সেই প্রতিবন্ধক আবার প্রবলতর প্রতিকারক কারীরী যাগ প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা নিবারিত হয়, এবং সেই প্রতিকারক কর্ম্ম, নিজের ফলসাধনোপযোগী বৃষ্ট্যাদিরূপ দৃষ্টকারণ সমূহ উৎপাদন করিয়াই পূর্ব্বোক্ত প্রতিবন্ধককে দূর করে। অধিক আর কি বলিব, তুমি প্রারব্ধ কর্ম্মের অত্যন্ত ভক্ত হইলেও, মনে কল্পনাও করিতে পারিবে না যে, (জীবন্মুক্তি সাধন বিষয়ে) যোগাভ্যাসরূপ পুরুষচেষ্টা একান্ত নিষ্ফল। অথবা যদি বল, প্রারব্ধ কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষাও প্রবল (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানকে পরাভূত করিয়া বন্ধনকে বজায় রাখিবে) তাহা হইলে জানিও যে যোগাভ্যাস আবার সেইরূপ প্রারব্ধের অপেক্ষাও প্রবল এবং তাহার বলেই উদ্দালক (১) বীতহব্য প্রভৃতি যোগিগণ নিজের ইচ্ছায় দেহত্যাগ করিতে পারিয়া-ছিলেন। যদ্যপি আমরা (কলির জীব) স্বল্পায়ুঃ বলিয়া আমাদের পক্ষে সেই প্রকার যোগ সম্ভবপর হয় না, তথাপি কামাদিরূপ চিত্তবৃত্তির নিরোধ মাত্র যে যোগ, তাহাতে আবার প্রয়াস কি? যদি শাস্ত্রবিহিত পুরুষপ্রযত্নের শক্তি স্বীকার না কর, তাহা হইলে চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষশাস্ত্র পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রেরই নিষ্ফলতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। (আর) কখন কখন কর্ম্মে ফলবিসম্বাদ ঘটে অর্থাৎ কর্ম্মে (অভিষ্ট) ফললাভ ঘটে না, তাই বলিয়াই যে (শাস্ত্রবিহিত) পুরুষপ্রযত্ন নিষ্ফল, একথা বলা চলে না। তাহা হইলে কোনও সময়ে পরাজিত হইয়াছে বলিয়া সকল রাজাই গজারোহী, অশ্বারোহী প্রভৃতি সেনা উপেক্ষা করিত। এইহেতু আনন্দবোধাচার্য্য বলিতেছেন:— "অজীর্ণ হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া কেহ আহার পরিত্যাগ করে না, ভিক্ষুকের ভয়ে কেহ হাঁড়ি চড়াইতে বিরত থাকে না, ছারপোকার ভয়ে

(১) যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণের—উপশম প্রকরণে ৫১ হইতে ৫৫ অধ্যায়ে উদ্দালকের এবং ৮৪ হইতে ৮৮ অধ্যায়ে বীতহব্যের বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে।

কেহ লেপাদি বহিরাবরণ ব্যবহারে বিরত হয় না।" শাস্ত্রবিহিত পুরুষপ্রযত্নের যে শক্তি আছে তাহা বসিষ্ঠের সহিত রামের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায়। বসিষ্ঠ রামায়ণে "সর্ব্বমেবেহ হি সদা" (মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ, ৪।৮) এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া "তদস্তু তদপ্যবমুচ্য সাধুতিষ্ঠ।" (মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ ৯।৪৩) এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধে তাহা পাওয়া যায়, যথা :—

বসিষ্ঠ—"সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন।
সম্যক্‌প্রযত্নাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে॥"

"বসিষ্ঠ কহিলেন—হে রঘুনন্দন, এই সংসারে সকল লোকেই সম্যক্ প্রযত্নবিশিষ্ট (সম্যক্ শব্দের অর্থ অবিরত,—"অনুপরমঃ এব সম্যক্‌প্রয়োগঃ") পৌরুষ দ্বারা সকল সময়েই সকল বস্তু অবশ্য লাভ করিতে পারে। সকল বস্তু অর্থাৎ পুত্র, বিত্ত, স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোকাদি ফল। পৌরুষ দ্বারা - অর্থাৎ পুত্রকামযাগ, কৃষিবাণিজ্য, জ্যোতিষ্টোম, ব্রহ্মোপাসনা রূপ পুরুষপ্রযত্নের দ্বারা।

"উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতং চেতি পৌরুষং দ্বিবিধং স্মৃতং।
তত্রোচ্ছাস্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতম্॥" ৫।৪।

শাস্ত্রবিগর্হিত ও শাস্ত্রানুমোদিত ভেদে পৌরুষ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে শাস্ত্রবিগর্হিত পৌরুষ অনর্থপ্রাপ্তির কারণ হয়, এবং শাস্ত্রানুমোদিত পৌরুষ পরমার্থলাভের কারণ হয়। শাস্ত্রবিগর্হিত পৌরুষ—পরদ্রব্যহরণ পরস্ত্রীগমন প্রভৃতি। শাস্ত্রানুমোদিত পৌরুষ—যথা নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। অনর্থ—নরক। পরমার্থ—স্বর্গাদি, 'অর্থের' অর্থাৎ অভিষ্ট বস্তুর মধ্যে মোক্ষই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরমার্থ।

"আবাল্যাদলমভ্যস্তৈঃ শাস্ত্রসৎসঙ্গমাদিভিঃ।
গুণৈঃ পুরুষযত্নেন সোঽর্থঃ * সম্পাদ্যতে হিতঃ॥" ৫।২৮॥

"অলং"—সম্পূর্ণরূপে, সম্যগ্‌রূপে।

* পাঠান্তর—'স্বার্থঃ সম্প্রাপ্যতে যতঃ'।

"গুণৈঃ"—উক্তগুণ সমূহের সহিত "যুক্ত" বা "মিলিত" হইয়া।

হিতঃ—শ্রেয়োরূপ "মোক্ষ"।

(সৎ) শাস্ত্রচর্চ্চা, সৎসঙ্গ প্রভৃতি সদ্‌গুণ বাল্যকাল হইতে সম্যক্ অভ্যস্ত হইলে, পুরুষের চেষ্টা তাহাদের সাহায্যে সেই কল্যাণকর অর্থ (অভীষ্ট বস্তু অর্থাৎ মোক্ষ) সম্পাদন করিয়া থাকে।

শ্রীরামঃ—প্রাক্তনং বাসনাজালং নিয়োজয়তি মাং যথা।
মুনে তথৈব তিষ্ঠামি কৃপণঃ কিং করোম্যহম্॥ ৯।২৩।

শ্রীরাম কহিলেন—"হে মুনে, পূর্ব্ব কর্ম্মজনিত বাসনা সমূহ আমাকে যে প্রকারে চালাইতেছে, আমি সেই প্রকারেই চলিতেছি। আমি পরবশ, আমি কি করিব?"

বাসনা শব্দে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ জীবগত সংস্কার বুঝিতে হইবে।

বসিষ্ঠঃ—অত এব হি (১) হে রাম শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোষি শাশ্বতম্।
স্বপ্রযত্নোপনীতেন পৌরুষেণৈব নান্যথা॥ ৯।২৪।

বসিষ্ঠ কহিলেন—"হে রাম, এই হেতুই তুমি কেবল স্বপ্রযত্ন-সম্পাদিত পৌরুষ দ্বারা অবিনশ্বর শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে, অন্য উপায় দ্বারা প্রাপ্ত হইবে না।"

"এই হেতুই"—যেহেতু তুমি বাসনার অধীন সেই হেতুই তোমার বাসনার অধীনতা নিবারণ করিবার নিমিত্ত, স্বকীয় উৎসাহের দ্বারা সম্পাদিত কায়মনবাক্য জনিত পুরুষচেষ্টার আবশ্যকতা আছে।

(ক্রমশঃ)

---

(১) পাঠান্তর—"হি রাম ত্বং"।

সমালোচনা।

স্বামী বিবেকানন্দ (জীবন চরিত)—শ্রীযুত প্রমথনাথ বসু, এম, এ, বি, এল প্রণীত ও স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিত বিস্তৃত ভূমিকা সম্বলিত। ইহা মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'Life of Swami Vivekananda' নামক ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। ইংরাজীর ন্যায় এই পুস্তক চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (৩৯৪ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হইয়াছে, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড এখনও যন্ত্রস্থ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, মূল্য প্রতি খণ্ড ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকট, ১৯নং শাঁখারীপাড়া রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ও উদ্বোধন কার্য্যালয়।

স্বামিজীর বিস্তৃত জীবনী বঙ্গভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকখানি আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। ইহা ইংরাজী গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ নহে—ফলে, অনুবাদসুলভ ভাষার জড়তা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইহাতে ইংরাজী গ্রন্থ অপেক্ষা কতকগুলি অধিক ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া স্বামিজীর জীবনের এই সকল ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থের প্রথমভাগে স্বামিজীর বংশপরিচয়, জন্ম, বাল্যকথা হইতে আরম্ভ করিয়া বরাহনগর মঠে তপস্যা পর্য্যন্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে তাঁহার পরিব্রাজক বেশে ভারতভ্রমণ ও আমেরিকা যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর সঙ্কলন করা হইয়াছে। যে মহান্ ত্যাগী ও প্রেমিক পুরুষের জীবনাবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, পাঠক গ্রন্থপাঠে তাঁহার চরিত্রের সম্পূর্ণ না হউক আংশিক চিত্র যে মনোমধ্যে চিত্রিত করিতে পারিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার কর্ম্মকুশলতা, তাঁহার প্রবল স্বদেশানুরাগ, তাঁহার আচণ্ডালপ্রবাহিত প্রেম, তাঁহার গভীর জ্ঞান, তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি,

তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ, তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য, তাঁহার প্রগাঢ় গুরুভক্তি, তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রভৃতির কথা পাঠ করিতে করিতে পাঠক স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া ভাবিবেন এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ চরিত্র—একাধারে এত অধিক গুণের সমাবেশ—জগতের ইতিহাসে বাস্তবিকই অতি বিরল!

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বামিজীর জীবনালোচনা যেরূপ উপযোগী ও কল্যাণপ্রদ, তাহাতে যত অধিক সংখ্যক লোক ইহার সহিত পরিচিত হয় ততই মঙ্গল। ইহা যেরূপ বিচিত্র ঘটনাবহুল তাহাতে পুস্তকখানি একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। বিশেষতঃ, ইহার ভাষা খুব প্রাঞ্জল হওয়ায় স্ত্রীপুরুষ সকলেই আগ্রহ সহকারে ইহা পাঠ করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থকার স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—ঐ সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। এ কার্য্যের ভার তিনি সুধী পাঠকবর্গের জন্যই রাখিয়া দিয়াছেন। মহাপুরুষের জীবনের ঘটনাবলী সমালোচনা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করা বড়ই কঠিন কার্য্য। দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলে লেখক হয়ত তাঁহার কার্য্যের গৌরববৃদ্ধি করিতে গিয়া জগতের সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, অথবা নিজের মনগড়া কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়া তাঁহাকে 'খাট', সাম্প্রদায়িক, বা নিজের ভাবে ভাবিত করিয়া ফেলিয়াছেন! শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার মহাশয় বোধ হয় এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন। ইহাতে আর যাহা হউক, একটী সুবিধা এই হইয়াছে যে, প্রত্যেকেই স্বামিজীসম্বন্ধে স্বাধীন মত গঠন করিতে সমর্থ হইবেন এবং যাঁহার যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পুস্তকখানির বহুলপ্রচার কামনা করি।

উপনিষদ্‌—ঈশ কেন (পকেট সংস্করণ)—শ্রীযুত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত লক্ষ্মণ শাস্ত্রি দ্রবিড় কর্ত্তৃক সংশোধিত। ইহাতে মূল, অন্বয়, অক্ষরার্থ, শঙ্করভাষ্য-সংক্ষেপরূপা শঙ্করার্চ্চনা নাম্নী টীকা ও তাৎপর্য্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। লোটাস লাইব্রেরী, উদ্বোধন কার্য্যালয় ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুত রাজেন বাবুর নাম শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই পরিচিত। হিন্দুর বেদ, বেদান্ত, দর্শন যাহাতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালী মাত্রেরই আয়ত্ত করা সুলভ হয় তাহার চেষ্টাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া মনে হয়। এতদুদ্দেশ্যে তিনি গত কয়েক বর্ষ হইতে লোটাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত বেদান্ত দর্শন ও বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থাদির সম্পাদকতা করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি উপনিষদ্ শাস্ত্রের বহুল প্রচার কামনা করিয়া উহা যাহাতে গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় বাঙ্গালীর গৃহে নিত্য পঠিত হয় তজ্জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়া ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি দ্বাদশখানি প্রধান উপনিষদের এক অভিনব ক্ষুদ্রাকার সংস্করণ বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রন্থকার যেরূপ পরিশ্রম করিয়া পুস্তকখানি সাধারণ পাঠকবর্গের উপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। পুস্তকপরিচয়প্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন—

"আচার্য্য শঙ্কর ইহার যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়া এই 'শঙ্করার্চ্চনা' টীকা রচিত হইয়াছে। ইহাতে আচার্য্যের ভাষ্যই কেবল অন্বয়মুখে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ভাষ্য পড়িয়া মূল বুঝিতে হইলে ভাষ্যের যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। আর সেই জন্য বিচারাংশগুলি ইহাতে গৃহীত হয় নাই। 'অন্বয়' মধ্যে প্রতিশব্দ দেওয়া হয় নাই; কারণ, তাহাতে অন্বয়ার্থীর অসুবিধাই। 'অক্ষরার্থকে' অন্বয়ের সম্পূর্ণ অনুগামী করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য, উহাতে মূলের ভাষা বুঝিতে সুবিধা হইবে। 'তাৎপর্য্য'মধ্যে গৃহীত ভাষ্যাংশেরই অনুবাদ আছে, এবং মধ্যে মধ্যে মন্তব্যও আছে।

পাঠের সুবিধার জন্য মূলাংশ পুনরায় পৃথগ্‌ভাবে শেষে সংযোজিত করা হইল।"

আলোচ্য পুস্তিকায় ঈশ ও কেন উপনিষদ্‌ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ইহাতে অক্ষরার্থ সন্নিবেশিত হওয়ায় উপনিষদের মূল বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। অনেকে মূলের দিকে তত লক্ষ্য করেন না—মোটামুটি একটা অর্থ দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চান। কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ, এই উপায়ে শাস্ত্রার্থ মনে থাকে না, দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে অনুবাদকের যেখানে ভুল থাকিয়া যায়, পাঠক অজ্ঞাতসারে তাহা গলাধঃকরণ করিতে বাধ্য হন। এ পুস্তিকা উক্ত দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। অক্ষরার্থে যাহা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে তাহা তাৎপর্য্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাৎপর্য্যটী বেশ সুচিন্তিত হইয়াছে, তবে ইহার ভাষা আর একটু প্রাঞ্জল হইলে আরও ভাল হইত। পুস্তিকার ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অতি চমৎকার। আকার ক্রাউন ৩২ পেজি, ৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য ॥০ আট আনা।

আমরা আশা করি, ইহা গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় বাঙ্গালার ঘরে ঘরে উপনিষদের বলপ্রদ, প্রাণপ্রদ সত্যসমূহ প্রচারিত করিয়া দেশে ধর্ম্মস্রোত প্রবাহের বিশেষ সহায়তা করিবে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

উড়িষ্যা প্রদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ বা মিশনের কোন আশ্রম ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামিজী ঐ অঞ্চলে একটী মঠস্থাপনা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ৺ভুবনেশ্বর ধামই ঐ কার্য্যের জন্য মনোনীত করেন এবং ঐ স্থানে একখণ্ড জমী ক্রয় করিয়া গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ কার্য্য শেষ হওয়ায় তিনি মঠপ্রতিষ্ঠার জন্য শুদ্ধানন্দ, শঙ্করানন্দ, অম্বিকানন্দ প্রভৃতি মঠের

কতিপয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণের সহিত তথায় গমন করেন। বিগত ১৪ই কার্ত্তিক তারিখে বিধিমত পূজা, হোম, পাঠ ইত্যাদির সহিত উক্ত প্রতিষ্ঠা কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবাও হইয়াছিল।

মঠের সীমানার মধ্যে একটী দাতব্য ঔষধালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। তথা হইতে প্রত্যহ বহু রোগীকে ঔষধ প্রদান করিয়া চিকিৎসা করা হইতেছে।

অজন্মা, দৌর্ম্মূল্য প্রভৃতি কারণে স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসিগণকে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে দেখিয়া উক্ত মঠের তত্ত্বাবধানে একটী সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে চাউল বিতরণ করা হইতেছে।

সংবাদপত্র-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, ব্রহ্মদেশের আমহার্ষ্ট জেলা জলপ্লাবনে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ফলে তথাকার ধান্য-ক্ষেত্রগুলি এরূপ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে যে এবৎসর উহা হইতে /১ সেরও ধান্য পাইবার আশা নাই! ইতিপূর্ব্বে উপর্য্যুপরি দুই তিন বৎসর ধরিয়া অজন্মা প্রভৃতি কারণে উক্ত স্থানের দরিদ্র অধিবাসীরা অতি কষ্টেই দিনযাপন করিতেছিল। তাহার উপর এবৎসর বন্যায় সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহারা সকলেই প্রায় নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ, উক্ত স্থান সমূহে এত অধিক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে যে গভর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত স্থান দুর্ভিক্ষপীড়িত বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বন্যার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের জনৈক সন্ন্যাসী স্বামী শ্যামানন্দ কার্য্যব্যপদেশে রেঙ্গুনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অধিবাসিগণের দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সাহায্যকল্পে রেঙ্গুন হইতে তথায় গমন করেন এবং উক্ত স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া চৌঙ্গাকোয়াতে (পোঃ কায়িকমারো) একটী সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত কেন্দ্র হইতে ৪৫ খানি গ্রামের দুঃস্থ অধিবাসিগণকে এ পর্য্যন্ত নুন, লঙ্কা ও ২৫০/০ মণ চাউল সাহায্য করা হইয়াছে। ঐ কার্য্য এখনও কয়েক

মাস ধরিয়া চলিবে। বন্যার জন্য উক্ত স্থান সমূহে নানাবিধ উৎকট ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ঔষধ পথ্য বিতরণেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে প্রায় দুই হাজার রোগীকে ঔষধ পথ্য দেওয়া হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত স্থানীয় কৃষকগণকে উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে চাষ আবাদ শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কৃষি বিভাগের ডেপুটী ডাইরেক্টরের পরামর্শে ও অনুমোদনে একটী 'আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কৃষকগণ যাহাতে আগামী বৎসরের চাষের সময় উত্তম বীজাদি পায়, তাহারও চেষ্টা করা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য।

দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সমূহে শস্যের অবস্থা ভাল হওয়ায় আমরা আমাদের সাহায্যকেন্দ্রগুলি অক্টোবর মাসের শেষভাগে বন্ধ করিয়া দিয়াছি। নিম্নে ২১ সে সেপ্টেম্বর হইতে ২৬ সে অক্টোবর পর্য্যন্ত চাউলবিতরণ কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল—

কেন্দ্রের নাম	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ।
বাগদা	৯৭০	৪৯৴
ইঁদপুর	১২০	৬।০
দন্তখোলা	৪৩৯	১৪৩॥৫
বিটঘর	২৬৯	৯৬॥২
মিহিজাম	৫১৩	৮৫॥৫
ভুবনেশ্বর	২৫৯	৮৫৵১

যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি এই মহৎ কার্য্যে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ঝটিকাপ্রপীড়িত স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্য।

গতবারের কার্য্যবিবরণীতে আমরা অর্থাভাব প্রভৃতি নানা অসুবিধার কথা প্রকাশ করিয়াছি। ইহা সত্ত্বেও আমরা অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। বর্ত্তমানে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ সবডিভিসনে কলমা, কামারখাড়া, বজ্রযোগিনী, সোনারঙ্গ এবং লতপদী এই পাঁচটী স্থানে সাহায্য কেন্দ্র খুলিয়াছি। প্রথম চারিটী কেন্দ্র টাঙ্গিবাড়ী থানার অন্তর্গত এবং উহাদের অধীনে আরও পাঁচটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্র আছে। লতপদী কেন্দ্র সিরাজদিঘা থানার অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত সিরাজগঞ্জ থানায় সোনার গাঁ নামক স্থানে আর একটী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। নিম্নে ১০ই অক্টোবর হইতে ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ঐ সকল কেন্দ্রের চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল—

ঢাকা।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
কলমা	৪৫	৮৯৫	১১৯৲৯
লতপদী	১০	৩৫৫	৪৩/১
বজ্রযোগিনী	২২	২৬০	২৯/৭
কামারখাড়া	৩০	৫৪৮	৪৩৲২
সোনারঙ্গ	৭৫	৩৬৮	১৮।৬
সোনারগাঁ	২৬	৪০৯	২১।৮

উল্লিখিত কেন্দ্রগুলি হইতে যথোপযুক্ত সাহায্য দান করিতে হইলে প্রতি সপ্তাহে ২৫০/০ মণ চাউলের প্রয়োজন। সুতরাং যদি সস্তা রেঙ্গুন চাউলও বিতরণ করা যায় তাহা হইলে ন্যূন পক্ষে সাপ্তাহিক ১৬০০৲ টাকার প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক

স্থান আছে যেখানে সাহায্যকেন্দ্র খোলা আবশ্যক। বর্ত্তমানে অর্থাভাববশতঃ আমরা তথায় কেন্দ্র খুলিতে পারিতেছি না। আমরা এই বিষয়ে সহৃদয় দেশবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছি।

বরিশাল জেলার ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত ভারুকাঠি গ্রামে এবং গৌরনদী থানার অন্তর্গত বাগধা গ্রামে দুইটী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। নিয়ে ১৫ই অক্টোবর হইতে উক্ত কেন্দ্রদ্বয়ের চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে—

বরিশাল।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
ভারুকাঠি	১২	১৩৭	১১৸৭
বাগধা	১০	২৭০	১৪৴০

আমরা পুনরায় খুলনা জেলার বাগেরহাট সবডিভিসনে সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের সেবকগণ উপস্থিত মোল্লাহাট থানায় অবস্থান করিতেছেন। কারণ, উক্ত গ্রামে এমন একখানি ঘরও নাই যেখানে মানুষ বাস করিতে পারে। ঝড়ের সময় বন্যায় কয়েক খানি ক্ষুদ্র গ্রামও মধুমতী নদীর গর্ভে বিলীন হইয়াছে। ঘরবাড়ী ও গাছপালা ভাঙ্গিয়া রাস্তাঘাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। লোকের কষ্টের অবধি নাই।

২৫সে অক্টোবর মোল্লাহাট কেন্দ্র হইতে ৬খানি গ্রামের ১১৮ জন লোককে ৬৴২॥০ সের চাউল বিতরণ করা হইয়াছে।

অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে ফরিদপুর জেলার পালং থানার অন্তর্গত কুমোরপুর গ্রামে একটী সাহায্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। তথাকার কার্য্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইলেই প্রকাশিত করিব।

আমরা বিনামূল্যে চাউল বিতরণ এবং দোকান খুলিয়া ক্রয়-মূল্যে বা তদপেক্ষা অল্পমূল্যে চাউল বিক্রয় করিতেছি বটে কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ গৃহ নির্ম্মাণ বা বস্ত্র বিতরণ সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারিতেছি না। অথচ ঐ দুইটী বিষয়ে সাহায্য করা বিশেষ প্রয়োজন। যদিও ঐ কার্য্যে বহুল অর্থের প্রয়োজন তথাপি আমরা

আশা করি, সহৃদয় জনসাধারণের সহায়তায় আমাদের সে অভাব দূর হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

(১) প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণ মিশন মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া।

(২) সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন, উদ্বোধন আফিস, ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

৩০-১১-১৯ (স্বাঃ) সারদানন্দ,

কলিকাতা। সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

(৫ই জুন হইতে ৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত উদ্বোধনে প্রাপ্ত)

শ্রীনৃত্যলাল মুখার্জ্জি,	কলিকাতা	৪৪৮।০
জনৈক ভদ্রলোক,	কুচবেহার,	৫৲
শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র দে,	কলিকাতা,	১০৲
শ্রীঅঘোর নাথ ঘোষ,	,,	৬০৲
,, হরিদাস কুণ্ডু,	,,	৪৲
গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টীং,	দিল্লী,	২০৲
শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা,	তানতাবিন,	২।৶০
শ্রীজানকী নাথ সাহা,	কলিকাতা,	১৲
সেবক মণ্ডলী, জেটি পাওয়ার হাউস,	গোঁসাইডাঙ্গা,	৪।৶০
শ্রীমতী সুনীতিবালা,	কলিকাতা,	১৲
সেক্রেটারী-দরিদ্র-ভাণ্ডার,	জিয়াগঞ্জ,	৫৲
শ্রীভগবান দাস,	পোর্টব্লেয়ার	১০৲
শ্রীমতী মনীবালা,	কলিকাতা,	৪৲
শ্রীনাথুমল পাঞ্জাবী,	,,	৫৲
,, ননীগোপাল বসু,	,,	৭৲
,, হৃষীকেশ ঘোষ,	শুকচর,	৫৲
,, অমূল্য চন্দ্র বসু,		৫৲
জনৈক বন্ধু,	বম্বে	২৫৲
শ্রীভক্তকান্ত সরকার,	রাজারামপুর,	১৲
দরিদ্রভাণ্ডার,	বোয়ালমারী	১৲
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু,	কলিকাতা,	৪।০
,, ভুপেন্দ্র কুমার বসু,	,,	৫৲
মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার,	কলিকাতা,	২০০৲
শ্রীরাজেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ	,,	৫৲
,, শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়,	,,	৫৲
সেক্রেটারী বার লাইব্রেরী,	হাওড়া,	৭০৲
শ্রীবিমান বিহারী বসু,	রাঁচি,	৫৲
,, দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী,	কলিকাতা,	৮৲
,, সুশীল চন্দ্র বসাক,	,,	১৲
,, উপেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত,	বাখরগঞ্জ,	৪৲
,, রমেশ চন্দ্র সরকার,	ভাঙ্গা,	২৲
জনৈক বন্ধু,	আঁটপুর	২৫৲
শ্রী বি, সি, গুহ,	মিনগা,	৫০৲
,, নরেন্দ্রমোহন সেন,	ঝিনেদা,	২৲

ই, বি, রেলের কর্ম্মচারিগণ, চিৎপুর রোড ৪৸/০
মাঃ ম্যানেজার হিতবাদী, ২৫৲
শ্রীমতী সুরুচি বালা ঘোষ, কুমিল্লা, ১০৲
শ্রীরাম, বাঙ্গালোর, ১০৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা, ৩০৲
,, বম্বে, ১১৫৲
হারমনি, নিউজিল্যাণ্ড, ১২৲
শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দাসী, কলিকাতা, ১৫৲
মিঃ জগৎপ্রসাদ, লাহোর, ১০৲
জনৈক বন্ধু, ৫০৲
শ্রীরোহিণী কান্ত রায়, কলিকাতা, ।০
জনৈক বন্ধু, ৫৲
মিঃ এন, কে, রায়, বাগদাদ, ২৲
শ্রীঅনুরূপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফাইজাবাদ ৫৲
,, রামকৃষ্ণ সেন, কলিকাতা, ৫৲
,, অতুলকৃষ্ণ দে, ,, ৪৲
,, দুর্গাচরণ রক্ষিত, গোবোরডাঙ্গা, ৫৲
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী, কলিকাতা, ১৲
,, মায়া ,, ১৲
,, সরলা বালা দাসী, ,, ১৲
জনৈক বন্ধু, ,, ১৲
মাঃ শ্রীগঙ্গারাম, পোর্টব্লেয়ার ১০৲
শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র সেন, সিঙ্গঝানি, ৩৲
মিঃ ডি, দিনরাজ, কোয়ালালামপুর, ৬০৲
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ৩৲
,, বিজয়কৃষ্ণ বসু, কালীঘাট, ১০৲
,, শুধাংশু শেখর ঘোষ, কলিকাতা, ৫৲
,, ব্রজলাল পাল, ,, ১০৲
মেট্রোপলিটান ইনৃষ্টিটিউট, বড়বাজার, ৩০৲
মিঃ আর, সি, দত্ত, মাইরেঙ্গলা, ১৲
মাঃ জে, বি, ঘটক, করাচি ৬৲
জনৈক বন্ধু, ১০৲
,, মহিলা, মাঃ ডাক্তার কাঞ্জিলাল ১০৲
শ্রীরবীন্দ্রনাথ আশ, কলিকাতা ১৲
,, এককড়ি ঘোষ, ,, ৩৲
,, হীরালাল নিওগী ভদ্রেশ্বর, ৫৲
,, উপেন্দ্র নাথ দে, গোঁসাইডাঙ্গা, ৪৲
সুবেদার শ্রী এ, পি, ঘোষ, বাগদাদ, ১০৲
শ্রীবরেন্দ্র নাথ ঘোষ, ,, ৫৲
শ্রী— কলিকাতা, ১৫৲
,, কে শুনাল রাম, হায়দ্রাবাদ, ২৫৲
,, মোহিনীমোহন রায়, ডায়মণ্ডহারবার ১৲
,, গঙ্গাদাস সরকার, কৃষ্ণনগর, ৫৲
শ্রীকানাইলাল পাল, কলিকাতা, ৫০৲
,, ব্রজলাল পাল, ,, ১০৲
,, উপেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, বাখরগঞ্জ, ৩৲
,, কুমুদিনী বসু, কলিকাতা, ১৲
,, মহেন্দ্রলাল সরকার, যেসিন, ৫৲
শ্রীমতী চারুলতা চৌধুরী, কলিকাতা, ১০৲
,, লক্ষ্মীমণি দাসী, ,, ৮০৲
,, শুভাষিণী গুহ, গোবিন্দপুর, ২৲
শন্দালি স্কুলের ছাত্রগণ, ১০৲
শ্রী কে, এন, ঘোষ, আমুথাল, ৫৲
শ্রীমতী সরোজবাসিনী দাসী, কলিকাতা, ১৲
শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র নন্দী, ,, ৫৲
,, অচ্যুত কুমার নন্দী, ,, ১৲
জনৈক বন্ধু, ,, ১০৲
শ্রীযুত সুরেন্দ্র লাল সেন, আরারিয়া, ৫৲
,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, গাবতলী, ৫৲
,, বিহারী লাল, কলিকাতা ৫৲

শ্রীরামকৃষ্ণ নরসিংহ তিরুমালি, বাঙ্গালোর, ৫০৲
,, পাঠি কারদা ভেঙ্গন, কোটার ৫৲
,, ডি, কে. দত্ত, সেভক, ১৲
,, সি, কৃষ্ণস্বামী পিলাই, বেলারী, ১০৲
,, জে, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়পুর, ২৷০
ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ে প্রাপ্ত
মাঃ শ্রীপরাণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সাহা, কলিকাতা, ৫১৲
শ্রীমতী শৈলবালা দেবী, কাশী, ২৷০
ফ্রেণ্ড সানরাইজ লিটারারী ক্লব, কলিকাতা, ১০১৲
সুধীরের পিতামহী, ,, ৬৷০
জনৈক বন্ধু ২৲
দরিদ্র বান্ধব সমিতি, সম্বলপুর ৪০৲
ডি ।১৩ কোম্পানী, ৪৯নং বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট ৪৲
শ্রীবিধুভূষণ পাল, বহরমপুর, ১৲
,, হরিপদ দত্ত, পেটা, ৫৲
৺রায় শ্রীশ চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী স্মরণার্থ
মাঃ তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী, ১০০৲
৺রাজা যাদবেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের
কন্যা রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণরমণী, শোভাবাজার রাজবাটী, ৬৭৲
শ্রীযুত যোগানন্দ সিংহ, ভবানীপুর, ৪৲
,, সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটনা, ৩০৲
ফেমিন রিলিফ ফণ্ড, ২৲
কুমুদ সেনের স্মৃতিরক্ষার্থ ৪১৷৶৫
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা, ৪৲
শ্রীনলিনী রঞ্জন বসু, বর্দ্ধমান, ২৲
জনৈক বন্ধু, হাজারীবাগ, ৩০৷০

শ্রীমতী জীবনবালা, তাম্বাবীন ৫৲
শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, বরিশাল, ২৲
শ্রীমতী কৈলাসকামিনী দাসী, বর্দ্ধমান, ১০৲
জি, জি, বার্ণীকর, ৪৫৲
জে, আর, ব্যানার্জ্জী, বিদ্যাসাগর কলেজ ২০০৲
শ্রীসন্তোষ কুমার দে, কলিকাতা, ১৲
মাঃ পি, সি, মজুমদার, যশোর, ৫৲
খুচরা আদায়, কলিকাতা, ৫৲
সমদুঃখী, কলিকাতা, ৫৲
মাঃ কিরণবাবু, জনৈক বন্ধুর মাতা ১৫৲
শ্রীদিবাকর দে, কলিকাতা ৫৲
শ্রীকৃষ্ণগোপাল সাহা মোদক, কলিকাতা ১০৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা, ১০৲
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দে, ,, ৬৲
জনৈক বন্ধু, ১৷৵০
ঐ ৷০
শ্রীরাজকুমার ব্যানার্জ্জী, চন্দননগর ৫৲
,, পি, বসু, কলিকাতা, ১২৲
,, শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র, ,, ১০৲
,, ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র ,, ১০৲
ভ্রাতৃবৃন্দ, ,, ৩৷৶০
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ রায়, ,, ২৫৲
সেপাই, এ, এন, সুর, খানিকিন, ১০৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা, ১৲
শ্রীসন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায় ,, ৫৲
শ্রীমতী সরলাবালা দাসী, ২৲
খুচরা আদায় ২৲
পৌটনের স্ত্রী, ১০৲
শ্রীমতী ময়না দাসী, দেরা, ২৲
বেঙ্গল রিলিফ ফণ্ড, কলিকাতা, ৬০০০৲
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পাল, ,, ৫০৲

মাঃ রায় সাহেব শ্রী এস, এন, ঘোষ,
পুণা, ৩৫৲
শ্রীকেদার নাথ ঝা, নিজকুণি, ১।/০
„ দেবী প্রসাদ শীল, কলিকাতা ৫৲
„ জে, কে, সরকার, „ ৫০৲
„ হরিচরণ দে, „ ৪৲
শ্রীমতী বিদ্যুৎপ্রভা বসু, „ ৫৲
শ্রী এস গণেশন্ টি্ পলিকেন, ১০৲
মিসেস্ পালিত, সীতাপুর ১০৲
ডাঃ শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় ৪৲
শ্রীতারাকান্ত বিশ্বাস, কালারবেধয়া, ১৲
„ অমূল্য কুমার ভড়, কলিকাতা, ২৲
জনৈক সেবক, কাশী ১৲
শ্রীকৃষ্ণ চরণ সরকার, কালীগাঁ, ২২৷৵০
„ ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু, কলিকাতা, ১০৲
ইয়ংমেনস্ ইউনিয়নের সভ্যগণ, „ ৩৮৲
বেঙ্গলী এসোসিয়েসান,
মাঃ শ্রী জে, সি, বিশ্বাস, পুনা, ১০০৲
বি, এন, রেলের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারের
আফিসের কর্ম্মচারিগণ, কলিকাতা, ২০৸/০
শ্রীমতী মালিনী দাসী, „ ১০৲
উত্তর ইটালী, কমলা লাইব্রেরী, „ ৩৫৲
শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ, মসাট, ৫৲
প্রফুল্লকুমার সরকার, ধেনকানল, ১০৲
বি, আর, ও অফিসের কর্ম্মচারিগণ
মাঃ শ্রীআর, কে, ঘোষ, ইরাক, ২১।০
মাঃ সেক্রেটারী বিবেকানন্দ সোসাইটী,
কলিকাতা, ২২৫৲
জনৈক বন্ধু,
মাঃ শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, „ ১৫০৲

শ্রী এন, এন, ঘোষ, „ ১২৲
„ ভি, কে, এস, আয়ার, সেন্দকন, ।০
„ এ, বি, সামন্ত, কলিকাতা ১০৲
৺হেমচন্দ্র সেটের স্মরণার্থ, „ ১০৲
"তমপূ" „ ৫৲
শ্রী শ্রীশচন্দ্র মতিলাল, „ ২৲
„ সুধীন্দ্র বসু, „ ৫০৲
„ তারাপ্রসন্ন দত্ত, „ ৫০৲
শ্রীমতী সরস্বতী দেবী „ ২৲
„ ব্রজমোহিনী, ভাগলপুর, ৫৲
শ্রীযজ্ঞানন্দ সিংহ, ভবানীপুর, ৩।/০
„ অরুণ দাস সরকার, দমারপুর, ৸০
সাইক্লোন রিলিফ ফণ্ড, কোন্নগর, ২৫৲
"লক্ষ্মীনিবাস" বাগবাজার, ৫৲
৺গঙ্গানারায়ণ গুপ্তের স্মরণার্থ
মাঃ সেক্রেটারী বিবেকানন্দ সোসাইটী, ২৫৲
শ্রীকালীদাস দাস, কলিকাতা, ২
জে, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং „ ৮৲
শ্রীনিরঞ্জন রায়, ধুলিয়ন, ৫৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা, ২৲
„ „ ১৲
„ পুনা ১৲
কতিপয় বন্ধু, মাঃ শ্রী এইচ এম
রায় চৌধুরী, বি, কোম্পানী
৪৯নং রেজিমেণ্ট, করাচি, ৭৲
শ্রীবিশ্বম্ভর চক্রবর্ত্তী, মীরগঞ্জ, ২৲
„ পশুপতি আঢ্য, কলিকাতা, ৩
„ যতীন্দ্র মোহন বসু, গৌরীপুর, ২৲
যজ্ঞবজ্ঞ সরুর ভাণ্ডার,
মাঃ শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী, ১০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

সোমবার।

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কহিতেন, "যারা দাবাবড়ে খেলে তাদের মাথা ধরে যায়, আর যারা বসে বসে কেবল উপর চাল দেয় তাদেরই মনে হয় এইবার এই বড়েকে ধরেচে, এইবার এই গজকে ধরেচে ইত্যাদি।" তুমি এখন খেল্‌তে বসেচ তাতেই মাঝে মাঝে মাথা ধরে। তোমাদের অবস্থা দেখেই খুব শিক্ষা হচ্চে। প্রার্থনা যেন শীঘ্র শীঘ্র মুক্ত হয়ে যাই।

"দেখে শুনে ভয় করে প্রাণ কেঁদে উঠে ডরে,
রেখো আমায় কোলে করে স্নেহের অঞ্চলে ঘিরে।
তাইতে তোমারে ডাকি মা।"

আশীর্ব্বাদ কর যেন মায়ামুগ্ধ না হই। সত্যপথে খুব এগিয়ে যাই। সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি মানুষে দিতে পারে কি? আমার মনে হয়, ভগবান্ কোন মহৎ উদ্দেশ্যে এইরূপ করেন। মানুষের দৃষ্টি অতি কম। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব একটী গল্প বল্‌তেন—

এক রাজা মন্ত্রীর সহিত মৃগয়ায় গিয়াছিল। হঠাৎ রাজার আঙ্গুল কাটিয়া গেলে রাজা মন্ত্রীকে কহিল, 'ইহার কারণ কি?' মন্ত্রী উত্তর দিল, "অবশ্য ইহার মধ্যে কোন গভীর অর্থ আছে।" রাজার মনোমত উত্তর না হওয়ায় চটিয়া মন্ত্রীকে এক কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইহারও কি গূঢ় কারণ আছে?" মন্ত্রী কহিল, "অবশ্য।" এই সময় বনপথ দিয়া একদল ডাকাত যাইতেছিল। তাহারা রাজাকে পাইয়া মা কালীর কাছে বলি দিবার নিমিত্ত লইয়া গেল। পূজাদি

শেষ করিয়া বলি দিবে এমন সময়ে দেখিল রাজার হাতের আঙ্গুল কাটা। তখন গালি দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। রাজা জীবনদান পাইয়া মন্ত্রীর কথা স্মরণ করিয়া ভগবান্‌কে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিল এবং মন্ত্রীকে কূপ হইতে তুলিয়া তাহার নিকট সকল বিবরণ কহিল।

কোন কাজই বৃথা যায় না। তবে আমরা মানুষ, মানুষের বুদ্ধির মত অল্পে হতাশ ও অল্পে সন্তুষ্ট হই। ইহাই মানুষের ধর্ম্ম।

* * * *

ইতি—দাস

বাবুরাম।

———

মঠ, বেলুড়।

১৮।৮।১৬

স্নেহভাজনেষু—

তুমি আমার ভালবাসা জানিবে। সুস্থ আছ জানিয়া সুখী হইলাম। ওরে বাবা, দেহধারণ কল্লেই ভালমন্দ আছে, সুখদুঃখ আছে, স্তুতি নিন্দা আছে। আমরা যাদের ভালবাসি তাদের দোষগুণ দেখে নয়, সৎ অসৎ বলে নয়—আমাদের স্বভাবই ঐ এক রকম, তাই তাদের আপনার মনে করি।

৺কাশী যাবে উত্তম। সৎসঙ্গও পাবে তথায়। প্রাণভরে আত্মা-রামকে ডেকে যাও, যেমন অবস্থায় রাখ্‌বার তিনি রাখ্‌বেন। কর কেবল 'নাহং' 'নাহং', জপ 'নাহং' 'নাহং', ভাব 'নাহং' 'নাহং'। আমি যাই হই না কেন নাথ, তোমাকে এই রকম আমাকেই নিতে যে হবে হে। আমার আর কেবা আছে প্রভু! তুমি আমার আমি তোমার। জান্‌বে নিত্যসম্বন্ধ তাঁর সহিত আমাদের।

এখানকার সকলে ভাল আছে। তোমরা সকলে আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। মহারাজ বাঙ্গালোরে ভাল আছেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

প্রেমানন্দ।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিশিষ্টতা।*

(শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার)

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাঁহার ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"ঈশ্বরে বিশ্বাস, পাপস্বীকার, প্রার্থনার অভ্যাস, বলিদানে প্রবৃত্তি এবং পরকালের আশা—এই ভূমা ভিত্তির উপর সকল ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। পাপস্বীকার প্রভৃতি গৌণ বিষয়ে সকল ধর্ম্ম একমত না হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোক এই তিনটী সনাতন সত্যই যে ধর্ম্মের প্রাণ, পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্ম ইহাতে একমত। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সংস্কারও ঈশ্বর, আত্মা ও পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ম্যাক্সমূলার আমরণ ধর্ম্মের ইতিহাস অনুশীলন করিয়াও ধর্ম্মের উপর্যুক্ত লক্ষণগুলি নির্দ্দেশ করিবার সময় মানবজাতির এই সাধারণ সংস্কার দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের যে অন্য কোন লক্ষণ থাকিতে পারে তাহা একেবারেই তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তাঁহার সংজ্ঞা অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্ম "ধর্ম্ম" বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মে উল্লিখিত পাঁচটী লক্ষণের একটীও বর্ত্তমান নাই। অথচ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্মসমূহের মধ্যে এক অতি প্রাচীন ও প্রধান ধর্ম্ম এবং এখনও প্রায় অর্দ্ধ পৃথিবী জুড়িয়া স্বীয় মহিমায় বিরাজমান রহিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরের স্থান নাই। পাপস্বীকার, বলি, প্রার্থনা নাই। পরলোকের আশা নাই। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসও ভ্রান্তদৃষ্টিজনিত অভিমান ও উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মজীবন লাভের অন্তরায় বলিয়া নির্দ্দয়রূপে নিরাকৃত হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মের যাহা ভিত্তি, বৌদ্ধধর্ম্মে তাহা অনাদৃত, অস্বীকৃত ও নিরাকৃত। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশিষ্টতা। অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের পার্থক্য ও বিরোধও এইখানে। গতানুগতিক

---

* বিবেকানন্দ সোসাইটীর সাপ্তাহিক ধর্ম্মাধিবেশনে পঠিত।

পথ ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ নূতন পথের অনুসরণ করিয়াছে এবং মানবজাতির সাধারণ সংস্কারের পথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের এক নূতন ভিত্তি আবিষ্কার করিয়াছে। কাজেই পুরাতনের সঙ্গে, সাধারণের সঙ্গে তাহার স্বরূপের সাদৃশ্য নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম একটা বিশিষ্ট সৃষ্টি—প্রজ্ঞার একটা নূতন সৃষ্টি এবং সেইজন্যই মানব ইতিহাসেরও একটী বিশিষ্ট কথা। যাহা বিশিষ্ট, তাহার বৈশিষ্ট্যই প্রণিধানযোগ্য—সেইখানেই তাহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে।

সাধারণই হউক, আর বিশিষ্টই হউক, ধর্ম্মমাত্রই মানবজীবনের কোন না কোন সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা সাময়িক, যাহার অস্তিত্ব আজ আছে কাল নাই, এমন সত্য লইয়া কোন ধর্ম্ম গঠিত হইতে পারে না। ধর্ম্ম মানুষের জীবনের নিত্যসহচর। অন্তরাত্মার সঙ্গে তাহার নিগূঢ় সম্বন্ধ। সেখানে প্রবঞ্চনা বা প্রতারণার অবসর নাই। জীবনের সকল সত্য সকল ধর্ম্মে না থাকিতে পারে, জীবনের পূর্ণাভিব্যক্তি হয়ত অদ্যাপি নাও হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার কোন না কোন অংশ বা অংশবিশেষ অবলম্বন করিয়াই বিভিন্ন ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম জীবনের কোন্ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে, কোন্ সনাতন সত্যের উপর ইহার মহান্ সৌধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার আলোচনা ও অনুসন্ধানই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মানবজীবনের একদিক্ গতির, আর একদিক্ স্থিতি ও পরিণতির। গতির দিক্ তাহার স্পষ্ট অনুভূতির বিষয়—ধ্রুব জ্ঞানের বিষয়--কর্ম্মের বিষয়। পরিণামের দিক্ তাহার অস্পষ্ট অনুভূতির বিষয়—আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার বিষয়। গতির দিকে বর্ত্তমান ও ইহকাল। পরিণামের দিকে ভবিষ্যৎ ও পরকাল। অন্যান্য ধর্ম্ম ইহকালকে পশ্চাতে ফেলিয়া পরকালকে ধর্ম্মজীবনের কেন্দ্র স্থির করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম পরকালকে পশ্চাতে ফেলিয়া ইহকালকে অবলম্বন করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিয়াছে গতির দিক্, কর্ম্মের দিক্। পরিণামের দিক্—কল্পনার দিক্ বাড়াইয়া তুলিয়া গতির দিক্, বাস্তব জীবনের দিক্ খর্ব্ব করে নাই।

পরকালের প্রত্যাশায় ইহকালকে অবজ্ঞা না করিয়া উন্নত ধর্ম্মজীবন গঠনে যত্নবান্ হইয়াছে। ইহাতে অতীন্দ্রিয়ের অনিশ্চয়তা নাই—বৃথা মতবাদের দৌরাত্ম্য নাই—অনাবশ্যকের আড়ম্বর নাই—বিশ্বাসের নির্ভরতা নাই। আশা ও আকাঙ্ক্ষা কঠোর বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিমিত। কল্পনার দ্বার সঙ্কীর্ণ। ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ। বর্ত্তমান জীবনে—প্রত্যক্ষ জগতের বাস্তবজীবনে—আদর্শ-জীবন লাভ, ইহার চরম লক্ষ্য।

মানবের রাজ্যে দুইটী বিভিন্ন সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। একটী প্রকৃতির সৃষ্টি আর একটী মানবের প্রজ্ঞার সৃষ্টি। জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে প্রাকৃতিক সৃষ্টির স্বতঃস্ফুরণ হইয়াছে। প্রজ্ঞার সৃষ্টি মরণশীল মানবের সচেষ্ট সাধনার ফল। প্রকৃতির সৃষ্টি মানবের সহজাত। প্রজ্ঞার সৃষ্টি তাহার সাধনা। প্রকৃতি ও প্রজ্ঞার চিরন্তন বিরোধ। মানবজীবন এই বিরোধের সমরক্ষেত্র। ইহার এক প্রান্তে অদৃষ্ট দৈব—অপর প্রান্তে পুরুষকার ও প্রযত্ন। একটীর আবির্ভাব হৃদয়ে, অপরের জন্ম সবল মস্তিষ্কে। জীবনের এই সনাতন দ্বন্দ্ব মানবজাতির চিন্তাস্রোতকে দুই পৃথক্ ধারায় প্রবাহিত করিয়াছে। প্রকৃতি মানব-হৃদয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে লইয়া অজ্ঞাত পরিণামের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। প্রজ্ঞা প্রকৃতির উপর তাহার তীক্ষ্ণরশ্মি ফেলিয়া প্রকৃতির যতটুকু আলোকিত—প্রত্যক্ষজ্ঞানের আয়ত্ত ও অনুমোদিত—সেইটুকু গ্রহণ করিয়া বিশিষ্ট পরিণামের সৃষ্টি করিতেছে। প্রকৃতি টানিতেছে মানুষকে অনন্তের দিকে, অতীন্দ্রিয়ের দিকে, অজ্ঞেয় পরিণামের দিকে—প্রজ্ঞা টানিতেছে তাহাকে সান্তের দিকে, প্রত্যক্ষের দিকে, ইহকালের পরীক্ষিত ও সুনিশ্চিত পরিণামের দিকে। দুই দিকের ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। অন্যান্য ধর্ম্ম প্রকৃতির সৃষ্টি, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রজ্ঞার সৃষ্টি।

অব্যক্ত প্রকৃতির প্রেরণায় সৃষ্টি ছুটিয়াছে স্রষ্টার অন্বেষণে। স্বপ্নাবিষ্ট মানব ছুটিয়াছে সেই মহান্ অজ্ঞেয়ের অন্বেষণে, বিশ্বাতীতের পথে।

তাহার স্বপ্নের দেশ, আশার দেশ, তাহার অজ্ঞাত পরিণামের দেশ—সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অন্বেষণে। অনন্তের পথে এই মহাপ্রস্থানে তাহাকে কেহ বাধা দেয় নাই, কেহ তাহার গতিরোধ করে নাই। প্রজ্ঞা তখনও জাগরিত হয় নাই। তখনও তাহার স্বাতন্ত্র্য বোধ হয় নাই। একটা দুর্নিরীক্ষ্য আলেয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ইহকাল ও ইহলোককে পশ্চাতে ফেলিয়া, অতিদূর বহুদূর পথিক চলিয়া গিয়াছে। বিরাম নাই, শান্তিবোধ নাই, কাতরতা নাই। সম্মুখেই বৈতরণী, জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়ের মাঝখান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পরপারে সেই চির-বাঞ্ছিতের দেশ—বিশ্ববিধাতার রহস্য-মন্দির—জীবন-যানের শেষ গন্তব্য স্থান। কিন্তু পথ চলিতে চলিতে প্রজ্ঞার জন্ম হইয়াছে, পুষ্টি হইয়াছে, স্বাতন্ত্র্য বোধ হইয়াছে। প্রজ্ঞা আর প্রকৃতিকে অনুসরণ করিতে পারিতেছে না। জ্ঞেয়ের সীমারেখা অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। প্রকৃতি যে শ্রুতির বিদ্যুৎরেখা দেখিয়া অগ্রসর হইতেছিল, প্রজ্ঞা সেই ক্ষীণ রশ্মি দেখিতে পায় নাই। প্রজ্ঞা অন্ধ-প্রকৃতির অনুসরণে অসম্মত। কিন্তু প্রজ্ঞা প্রকৃতিরই কনিষ্ঠা কন্যা। প্রজ্ঞাকে ছাড়িয়া প্রকৃতির চলিবার শক্তি নাই। তাই প্রজ্ঞার শাসনে প্রকৃতির গতি রুদ্ধ হইল। অনন্তের যাত্রিকের আশার আলোকে নিবিয়া গেল! মানুষের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল! নৈরাশ্যে মানবাত্মা গতিহীন হইয়া পড়িয়া রহিল!

নৈরাশ্যের অন্ধকারে আধ্যাত্মিক জগৎ সমাচ্ছন্ন। বাস্তব-জগতের দুঃখের হাহাকার সেই অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করিয়া দিয়াছে। আশার আলোক নাই। প্রজ্ঞার দীপ্তি নাই। জীবন-তরণী গভীর অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গতিহীন হইয়াছে। নির্গমনের পথ নাই। মুক্তির উপায় নাই। কিন্তু মুক্তি চাই, গতি চাই, জীবন-স্রোত চাই। মানুষের ধর্ম্ম চাই। মুক্তির উপায় আবিষ্কারের জন্য প্রজ্ঞা ধ্যানমগ্ন হইল। প্রজ্ঞার সাধনা সার্থক হইল। ধ্যানলোক হইতে মুক্তির বাণী প্রতিধ্বনিত হইল—"দুঃখসন্তপ্ত মানব অজ্ঞেয়কে জানিবার চেষ্টা করিও না। বিশ্বের অন্তরালে কি আছে, সৃষ্টির নেপথ্যে কি রহস্য রহিয়াছে,

জানিবার প্রয়াস পাইও না। তোমার স্বপ্নাবিষ্ট মস্তিষ্ক হইতে ঐ চিরন্তন অজ্ঞেয়ের গুরুভার দূরে নিক্ষেপ কর। বৈতরণীর তটস্থ মহাসমাধি হইতে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। বিশ্বাতীতের পথ ছাড়িয়া একবার বিশ্বের পথে ফিরে এস। বিশ্বাতীত কোন অসীম কারুণিক নিয়ন্তার দর্শন প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতেছ—বৃথা তোমার আশা! স্বর্গে অনন্ত সুখের প্রত্যাশায় মর্ত্তে দুঃখের দিন গণিতেছ—নিস্ফল তোমার উদ্যম! সুদূর আকাশে নক্ষত্র উদয়ের আশায় গৃহের আলোক তোমার দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। বিশ্বাতীতের পথে দাঁড়াইয়া বিশ্বের পথ দেখিতে পাও নাই। অজ্ঞেয়ের অন্বেষণে যাইয়া জ্ঞেয়ের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়াছ। এইবার প্রত্যাবর্ত্তন কর। জ্ঞেয়ের প্রতি—বিশ্বের প্রতি—জীবনের গতির প্রতি প্রবুদ্ধ হও। পুরুষকার ও প্রযত্নের দ্বারা জীবনের দুঃখ ধ্বংস কর। ইহলোকেই প্রেম ও নীতির আদর্শ জগৎ সৃষ্টি কর।" বৌদ্ধধর্ম্ম মানবজাতির প্রতি এই প্রত্যাবর্ত্তনের আহ্বান, ইহকালের আশা, উদ্যম ও কর্ম্মের আহ্বান।

প্রজ্ঞা স্বাধিকারের সীমারেখা অতিক্রম করিতে অসম্মত। বিশ্বের নিয়ন্তা সম্বন্ধে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সম্বন্ধে, বিশ্বের আদি কারণ ও শেষ পরিণাম সম্বন্ধে প্রজ্ঞা নির্দ্দয়রূপে নিস্তব্ধ। তাহার মর্ম্মভেদী মৌন নীরবতার ভাষায় শুধু এইটুকু মাত্র বলিয়া দেয়—"হতভাগ্য মানব, আদির কথা, চরমের কথা জিজ্ঞাসা করিও না। মানবের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিও না। অপ্রাপ্যকে পাইবার আশা করিও না। ভাষা যাহার সন্ধান না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আসে, বুদ্ধি যাহার ধারণা করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইয়া ঢলিয়া পড়ে, প্রজ্ঞার প্রখর আলোক যেখানে স্তিমিত হইয়া যায়, বিশ্বের সেই আদি কারণের অন্বেষণ করিও না। জীবনের প্রয়োজনের পক্ষে তাহার আবশ্যকতা নাই। অনাবশ্যকের আবশ্যকতাকে বাড়াইয়া তুলিয়া লীলার জগতের মর্য্যাদা নষ্ট করিও না।" ব্যষ্টি আত্মার অস্তিত্বে প্রজ্ঞার আস্থা নাই। প্রজ্ঞা দেখিয়াছে বিশ্বে ধর্ম্মচক্র, নীতির রাজত্ব, কার্য্যকারণের নিত্য প্রবাহ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের বিচিত্র গতি ও

পরিণতি। তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানবের জগতে ব্যক্তিত্ব আছে, বিশিষ্টতা আছে। ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্টতার আপেক্ষিক সত্তা আছে কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই। ঈশ্বর ও আত্মা কেহই যদি না থাকিল, তবে মানুষের জগতে আর রহিল কি? কেন, "আর্য্যসত্য"ই রহিয়াছে—মানুষের দুঃখময় জীবন রহিয়াছে। দুঃখের যেমন উৎপত্তি আছে তেমন তার বিনাশও আছে, বিনাশ করিবার পথও আছে। প্রজ্ঞা সেই পথ আবিষ্কার করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম মানবজাতির দুঃখবিমুক্তির পথ-নির্দ্দেশ মাত্র। দুঃখবিমুক্তির চরম ফল আদর্শজীবন লাভ—নির্ব্বাণ লাভ। নির্ব্বাণের পরপারে কিছু আছে? জিজ্ঞাসা করিও না। প্রজ্ঞাকে ব্যথিত করিও না। যে ধর্ম্ম হেতুপ্রভব, প্রজ্ঞা তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছে। যাহা হেতুতত্ত্বের বহির্ভূত প্রজ্ঞা সেখানে নীরব।

ব্যক্তির জীবনে সময় সময় এমন অবস্থা আসিয়া পড়ে, যখন মানুষ মতবাদ বা বিচার বিতর্ক দূরে ফেলিয়া যাহা সে ধ্রুব জানে তাহাই লইয়া জীবনকে সাধনার পথে, সাফল্যের পথে পরিচালিত করিয়া দেয়। মানুষ তখন তত্ত্ব চায় না—সে চায় সাধনা ও সাফল্য। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবনেও এইরূপ একটা সময় উপস্থিত হইয়াছিল। ঈশ্বর ও আত্মা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব, কাব্য ও কল্পনার কুজ্ঝটিকা দ্বারা সতত সমাচ্ছন্ন। প্রজ্ঞার তীক্ষ্ণ রশ্মিও সেই ধূম্র-আবরণ ভেদ করিয়া তাহার স্বরূপনির্ণয়ে অসমর্থ। শ্রুতির ক্ষীণ আলোক প্রজ্ঞা উপেক্ষার নয়নে দেখিয়াছে। ধর্ম্মের সনাতন ভিত্তি প্রজ্ঞার নিকট যথেষ্ট বাস্তব বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। বিচার বিতর্কে সমাজ-মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অন্যদিকে জাতি-হৃদয়ে জ্ঞান, প্রেম, নীতি ও কর্ম্মের যে গভীর অনুভূতি সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার মুক্তি চাই মর্ত্ত্যজগতে সেই সনাতন আদর্শজীবনের বিকাশ চাই, স্পর্শযোগ্য জীবনে তাহার অনুভূতি চাই। নিবিড় মেঘরাশি যেমন তড়িৎ আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া বর্ষণ করে, জাতিহৃদয়ও সেইরূপ প্রজ্ঞার আঘাতে গতিশক্তি পাইয়া কর্ম্ম ও নীতির আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম জাতিহৃদয়ের প্রতি প্রজ্ঞার তড়িৎ আঘাতজনিত শান্তিজল।

মহাভারতের মহা বিপ্লবের ফলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। বৈদিক ধর্ম্ম, বৈদিক সমাজ ও সভ্যতার কেন্দ্র ও প্রাণস্বরূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রভাবহীন হইয়া পড়ে। শাস্ত্রনিবদ্ধ ধর্ম্ম কায়ক্লেশে আশ্রমের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে জীবনধারণ করিয়া থাকে। শিক্ষা ও প্রচারের অভাবে জনসাধারণের সঙ্গে বৈদিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সমাজে নূতন চিন্তা ও নূতন যুক্তিপ্রণালীর উন্মেষ হয়। স্বাধীন চিন্তা শ্রুতির অধিকার, শ্রুতির প্রমাণ গ্রহণ করে না। জ্ঞানের দিক্ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। ধর্ম্ম মানুষের সহজাত। জ্ঞানের দিক্‌পরিবর্ত্তন হইলেও তাহার ধর্ম্মের আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য জ্ঞানের যখন যে অবস্থা সেই অবস্থার উপরই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপে যুগে যুগে যুগ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়।

ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ মানবের দেবজীবন লাভ। যুগ-যুগান্তরের ধ্যানলব্ধ আদর্শকে কর্ম্মজগতে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিতে গিয়া তাহাকে অতীন্দ্রিয় শ্রুতিগম্য তত্ত্ব ছাড়িয়া প্রত্যক্ষ প্রজ্ঞার অধিকারে নামিয়া আসিতে হইয়াছিল। অনন্ত-অজ্ঞেয়ের বন্ধন-মুক্ত করিয়া তাহাকে জ্ঞেয়ের উপর, প্রজ্ঞার অধিগম্য তত্ত্বের উপর, প্রতিষ্ঠিত করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। ভারতবর্ষের জাগ্রত আত্মা একদিন চাহিয়াছিল—বিশ্ব-মানবের দুঃখ দৈন্য মুছিয়া ফেলিতে, হিংসার দাবানল নির্ব্বাপিত করিয়া ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে, জ্ঞান ও প্রেমের আদর্শজগৎকে ইহলোকে প্রত্যক্ষীভূত করিতে। সেইজন্যই বৌদ্ধধর্ম্মরূপ মহান্ আয়োজন। ভারতের সনাতন আদর্শকে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানগম্য করিতে হইলে তাহাকে শাস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সহজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।

মানুষ যখন অজ্ঞেয়ের অন্বেষণ ছাড়িয়া জ্ঞেয়কে বরণ করিয়া লয়, দর্শন ছাড়িয়া বিজ্ঞান গ্রহণ করে, ধর্ম্মও তখন জ্ঞেয়ের অধিকারে আসে। বৌদ্ধধর্ম্ম এইরূপ জ্ঞেয়ের উপর, বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোম্‌তে

(August Compte) যেমন বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যের উপর 'ধ্রুববাদ' দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, গৌতম বুদ্ধও তেমন ধর্ম্মজীবনের পরীক্ষিত ও স্পর্শযোগ্য সত্যানুভূতি লইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। দর্শনের ইতিহাসে ধ্রুববাদ দর্শনের যে স্থান, ধর্ম্মের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম্মেরও সেই স্থান। বৌদ্ধধর্ম্ম ধর্ম্মের ধ্রুববাদ।

কর্ম্মবিমুখ-বৈরাগ্যপ্রবণ বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি কেহ কুটীল কটাক্ষপাত করিও না। বৌদ্ধধর্ম্মের গতি বিশ্বাতীতের পথে নয়, বিশ্বের পথে—কর্ম্মের পথে। ইহাতে স্বর্গের প্রলোভন নাই। কোনও অসীম কারুণিক অতীন্দ্রিয় পুরুষের অহৈতুক কৃপার প্রতীক্ষায় জীবনের দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ নাই। বিশ্বের যদি কোনও নিয়ন্তা থাকেন, বৌদ্ধধর্ম্ম তৎপ্রতি উদাসীন। জীবনের গতি ও পরিণতির জন্য তাঁহার কৃপাদৃষ্টির আবশ্যক নাই। মানবের পুরুষকার ও প্রযত্নই তৎপক্ষে যথেষ্ট ও একমাত্র অবলম্বন। বৌদ্ধধর্ম্ম জীবনসংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন সমর্থন করে নাই—স্বাবলম্বন ও প্রযত্ন দ্বারা জয়লাভই তাহার অন্তরের কথা। পরলোকের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করে নাই। কিন্তু তাহার প্রধান চেষ্টা ইহলোকের প্রত্যক্ষ জীবনকে মহীয়ান্ গরীয়ান্ করিয়া তুলিতে—ইহজীবনে আদর্শজীবন লাভ করিতে। বৌদ্ধযুগের কর্ম্ম-প্রভাবে ঐতিহাসিক ভারত গৌরবান্বিত। পৃথিবীর ইতিহাসের তাহা বিশিষ্ট অধ্যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম এইরূপ আত্মস্থ, প্রযত্নশীল ও কর্ম্মপ্রাণ।

ধর্ম্মের ইতিহাস অধর্ম্ম, যুদ্ধ, রক্তপাত প্রভৃতি দ্বারা কলঙ্কিত। শান্তির নামে সমর করিতে, প্রেমের নামে রক্তপাত করিতে মানুষ সঙ্কোচ বোধ করে নাই। ইতিহাসের ইহা ভীষণ সত্য। বৌদ্ধধর্ম্ম এই দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে পরিমুক্ত। সাম্প্রদায়িকতার বিষবহ্নি কখনই তাহার গাত্র স্পর্শ করে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের এই নির্ব্বিরোধিতার প্রধান কারণ ইহার বৈজ্ঞানিকতা। কাল্পনিকতায় মানুষের স্বাতন্ত্র্য বেশী, সেখানে মানুষে মানুষে বিরোধের সম্ভাবনীয়তাও বেশী। বৈজ্ঞানিকতায় বিরোধের পথ অতি সঙ্কীর্ণ। সেখানে বিশ্বমানব একই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। কোন ব্যক্তিবিশেষ, জাতিবিশেষ বা সমাজবিশেষের

স্বার্থের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিয়াছে বিশ্বে সাম্য ও নীতির রাজত্ব—জীব জড়, মানব পশু সকলেই বিশ্বনিয়মের অধীন। কোন পার্থক্যের প্রাচীর মাথা উচু করিয়া এই উদার দৃষ্টির গতি রোধ করিতে পারে নাই।

মানবের দুঃখবোধে বৌদ্ধধর্ম্মের জন্ম। এই দুঃখবোধ বৈজ্ঞানিক উদার দৃষ্টির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যে বিশ্বপ্রেমের সৃষ্টি করিয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্মের সাহিত্য ও ইতিহাস তাহাতে আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বপ্রেমের ধর্ম্ম বিশ্বসেবা। বিশ্বের জীবজন্তু কেহই এই সেবার মহোৎসব হইতে বঞ্চিত হয় নাই। সৃষ্টির প্রতি পরমাণু জাগতিক বিধানে নির্দ্দিষ্ট অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। কাহারও গতিরোধ করিও না, কাহারও হিংসা করিও না। মুহূর্ত্তের আঘাতে বিশ্বে দ্রোহ উপস্থিত হইবে, জীবনপথ কণ্টকিত হইবে, বিশ্বের দুঃখ বাড়িয়া যাইবে। দুঃখ ধ্বংস করিতেই গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব। এই সহৃদয়তা বৌদ্ধধর্ম্মকে গভীর করুণরসে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে মানবত্বের ও মানবমহত্বের যে মোহিনীমূর্ত্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা চিরকাল মানবজাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষার আদর্শ হইয়া থাকিবে।

কেহ কেহ "দুঃখবাদ" বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অপবাদ দিয়া থাকেন। স্মরণ রাখিতে হইবে, দুঃখবোধেই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গৌরব ও মহত্ত্ব। মানবত্বের কল্যাণ মূর্ত্তি দুঃখবোধেই মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানের ফল অতৃপ্তি ও দুঃখবোধ। যিনি যত জ্ঞানী তিনি তত দুঃখী। অথবা যাহার দুঃখবোধের শক্তি যত বেশী তিনি তত জ্ঞানী। সক্রেটীস জ্ঞানের উপাসক, সক্রেটীস অতৃপ্ত। কোম্‌তে জ্ঞানী, তিনি মানবদুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ "বুদ্ধ"—মানবের দুঃখ দূর করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত এবং সেই মহাব্রত উদ্‌যাপনেই তাঁহার জীবন পর্য্যবসিত। ভারতবর্ষ একটা বৃথা সুখের প্রলোভন মানবজাতির সমক্ষে উপস্থিত করে নাই। তাহার শ্রেষ্ঠ কাব্য মানব-দুঃখের মহাসঙ্গীত এবং প্রাচীনতম দর্শনের প্রারম্ভ দুঃখনিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় বিশিষ্ট ধর্ম্মের আবির্ভাব যেখানে সেখানে এবং যখন তখন হইতে পারে না। ইহার পশ্চাতে ধর্ম্মজীবনের বিশিষ্ট অভিব্যক্তি থাকা আবশ্যক। এই ধর্ম্ম গৃহীত ও প্রচারিত হইতে বিশিষ্ট দেশ কাল ও পাত্রের আবশ্যক। যে দেশ মানবের সকল ধর্ম্ম, সকল আশা ও সকল কল্পনাকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া মানবজাতির উন্নতির সহায় হইয়াছে, একমাত্র সেই দেশেই ইহার আবির্ভাব ও প্রথম প্রচার সম্ভব হইয়াছে। সেই চিরকল্যাণময় দেশেরই গভীর ধর্ম্মজীবনের স্পর্শ-যোগ্য অংশের উপর ইহার মহান্ সৌধ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিজ জন্ম-ভূমিতে এই ধর্ম্ম স্থায়ী হইতে পারিল না। পিতৃদ্রোহী রাজপুত্রের ন্যায় স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তাহাকে বৈদেশিক উপনিবেশে জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষে তাহার নামগন্ধ লুপ্তপ্রায়! কোটী কোটী ভারতবাসী একদিন যে জীবন্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীতে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল, অতীতের কোন্ অন্ধতম গুহায় তাহা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে!

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অসাধারণ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমান পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। বিজ্ঞানের নূতন আলোকে জ্ঞানের দিক্‌পরিবর্ত্তন হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশের বিদ্বৎসমাজ অজ্ঞেয়বাদ, ধ্রুববাদ, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদের প্রতি অনুরক্ত। সে দেশে একটা প্রত্যক্ষ ধর্ম্মবাদের অভ্যুত্থান অপ্রত্যাশিত নয়। কোম্‌তের "মানবত্বের ধর্ম্মে" তাহারই সূচনা দৃষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহাদের নিকট সমধিক আদরণীয় ও সম্মানিত হইতে পারে। ভারতবর্ষেও বৌদ্ধ আদর্শ শিক্ষিতজনের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের মনীষিগণ সেই আদর্শে অনুপ্রাণিতও হইয়াছেন। ভারতের ইতস্ততঃ যে সেবাব্রতের উন্মেষ পরিলক্ষিত হইতেছে শ্রীগৌতমবুদ্ধের লোকোত্তর চরিত্রের প্রভাব তাহাতে গতিশক্তি প্রদান করিতে পারে।

মানবমহিমার মানদণ্ডস্বরূপ, জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ, বিশ্বপ্রেম ও কর্ম্মময় জীবনের জীবন্ত আদর্শস্বরূপ ভগবান্ বুদ্ধের দেব-জীবন

ভারতবর্ষের চিরউপাস্য আদর্শ। কিন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব। বৌদ্ধধর্ম্মের যতটুকু ভারতের সনাতন আদর্শের সহিত একসূত্রে গ্রথিত, ততটুকু রক্ষিত ও জাতিহৃদয়ে সঞ্চিত রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল বৈশিষ্ট্যই ভারতবর্ষে তাহার বিলুপ্তির মূল কারণ। তাহার বর্ত্তমানপ্রিয়তাই তাহাকে ভারতের অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে দেয় নাই এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনীয়তা হইতেও বঞ্চিত করিয়াছে যাহা বিশিষ্ট তাহা আংশিক—তাহা অসম্পূর্ণ। দেশকাল-পাত্রদ্বারা তাহা সীমাবদ্ধ। মানবত্বের সমগ্রতার, অনন্ত সম্প্রসারণতার স্থান তাহাতে নাই।

ভারতবর্ষ চাহিয়াছে ভূমাকে, পূর্ণতাকে, প্রজ্ঞা ও প্রকৃতির সম্মিলিত মানবত্বকে, সমস্ত বৈশিষ্ট্য গ্রাস করিয়া সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের বিশ্ব-মানবকে। বৈশিষ্ট্যের অধিকার সেখানে স্থায়ী হইতে পারে না। ভারতবর্ষ বেদ-বেদান্তের দেশ, আত্মা-পরমাত্মার দেশ। সে দেশের নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা প্রত্যক্ষ জগতের পশ্চাতে এমন এক বৃহত্তর জগতের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে, যাহার দর্শনে হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়—সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। এই বৃহত্তর জগৎ মানবের প্রত্যক্ষের অতীত—অতীন্দ্রিয় হইলেও তাহা ধ্রুব, নিত্য ও সনাতন। ইহা তাহার কল্পনার আশ্রয়, ধ্যানের বিষয়, আশার চরম লক্ষ্য এবং জীবনযানের শেষ গন্তব্যস্থান। কর্ম্মের জগৎ, নীতির জগৎ, বিজ্ঞানের জগৎ কিংবা লীলার জগৎ তাহার কাছে চরম সত্য নয়—মানব-জীবনের শেষ কথা নয়।

পদ্মের জীবন-নাট্য। *

(শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ)

"ওরে সরোবরে, রসভরে কমল ফুটেছে।
ঐ যে মধু আশে, উড়ে এসে ভ্রমরা সকল জুটেছে।
(রসিক মন)।
রসে করে টলমল হায়, দেখে শুনে রসিকের মন রসে ভুলে যায়;
রসের কুল কিনারা, পায় না তারা, যারা রসে মেতেছে।
(রসিক মন)।
এ কমল যেমন তেমন নয়, ফুট্‌লে পরে দিনে রেতে এক ভাবেতে রয়,,
যে জন যত ঘাঁটে, তত ফোটে, মধু উড়ে তার কাছে।
(রসিক মন)।
ফিকির চাঁদ রসের কথা কয়, এ রস পেয়ে না যায় ভুলে, এমন কেহই নয়;
এ রস রসিক বিনে, ভেবে মনে, বোঝে এমন কে আছে।
(রসিক মন)।"

—৺কাঙ্গাল হরিনাথ।

মাথার উপর অনন্ত নীল আকাশ ধু ধু করিতেছে, শেষ নাই, সীমা নাই, চারিদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কোন্ দেশের পারে গিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। নিম্নে সীমাহীন সবুজ রঙের বিচিত্র বর্ণ-ভঙ্গিমা কাঁচা, তাজা সবুজের সতেজ নবীনতা হইতে গাঢ়তম সবুজের ধুসর গাম্ভীর্য্য পর্য্যন্ত রেখায় রেখায় আপনার সত্তা ফুটাইয়া স্পন্দিত, উচ্ছ্বসিত, আকুলিত হইয়া দূর দূরান্তরে মিলাইয়া গিয়াছে। সবুজ সে আপনাকে বহু করিয়াছে কারণ সে পৃথিবীর; সে বিচিত্র, সে চঞ্চল। সে আপনার আনন্দ-হিল্লোলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আপনাকে সৌন্দর্য্যের বিচিত্র বিকাশে প্রস্ফুটিত করিয়াছে। আকাশ সে আকাশেরই, বিচিত্র-বহুকে আপনার দিকে

---

* শাঁখারিটোলা 'ইয়ংমেনস্ ইউনিয়নে' পঠিত।

টানিয়া এক করিতেছে কারণ উপরে সকলেই চাহিয়া থাকে, মাথা তুলে। সে শান্ত, নিত্য, শাশ্বত, সনাতন; সে উদার, গম্ভীর কারণ সে অদ্বৈত—সবুজের বর্ণহিল্লোল স্তব্ধনেত্রে ধ্যান করিতেছে। সবুজ বিচিত্র, চঞ্চল, উচ্ছ্বসিত, প্রবাহিত কারণ সে সুন্দর, তাই সে আকাশের দিকে আপনার চাঞ্চল্য প্রসারিত করিয়া দিতেছে। অদ্বৈত ও সুন্দরের অপূর্ব্ব মিলনের মাঝে বায়ুতরঙ্গ অবাধগতিতে চলিয়াছে, কারণ সে মঙ্গলময়, মুক্ত স্বাধীনতার উদ্দাম উচ্ছ্বাস। আকাশের গায়ে চিত্রিত গাঢ়তম হরিৎবর্ণের চক্রবালরেখায় গিয়া আমাদের কল্পনা থমকিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ঢালু আকাশের ঘেরাটোপের ধারে সবুজ গাছের সারি অনন্ত জিজ্ঞাসার যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছে। বাতাসে বাতাসে, ফুলে ফলে, পাখীর কণ্ঠে, মানুষের হৃৎস্পন্দনে "কেন", "কি" ও "কোথায়" রাগিণী গভীর ও করুণভাবে বেদনায় বাজিয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যাসূর্য্যের বর্ণ বৈচিত্র্য নীল ও হরিৎবর্ণের মাঝে বিদায়ের অশ্রুজল আঁকিয়া দিয়া গেল।

গ্রামপ্রান্তে ঘন গাছের মাঝে সরোবরের চারিধারে বড় বড় গাছের সারি জলের বুকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া শত শত বাহুবেষ্টনে ভালবাসার অন্তঃপুর রচনা করিয়াছে। তাদের ছায়ার মাঝে মায়ায় ঘেরা কত দিনের বিচিত্র গাথা সুপ্ত হইয়া আছে। হাওয়া লাগিলেই তারা হু হু করিয়া উঠে। গাছেদের ফাঁক দিয়া মাথার উপর নীল আকাশ আর চারি পাশে ধূ ধূ করা সবুজ মাঠ দেখা যায়। এখানে আলোছায়ার কোলাকুলি—সুখদুঃখের গালাগালি। সরোবর ছাইয়া পদ্মফুলের গাছ—কেউ ফোটে, কেউ লুটে, কেউ ঝরে, কেউ মরে।

সরোবরের পাশ দিয়া হাটের পথে কত লোক আসা যাওয়া করে—কেউ বা উদাস মনে গাহিতে গাহিতে যায়, কেউ বা কাঁদিয়া চলিয়া যায়, কেউ বা হাসে, কেউ বা চুপ কিন্তু আসা যাওয়া করে সকলেই। হাটের দিনে গরুর গাড়ির সারি যখন ক্যাঁচ্‌ক্যোঁচ্ করিয়া চলিতে থাকে তখন চাষাদের মুখর কোলাহলে চারিদিক ধ্বনিত হইয়া উঠে।

কৃষক বালিকাদের চঞ্চল চরণের আঘাতে ধূলি উড়িয়া ঘাসের রঙ্ ধূসর হইয়া যায়। কাল' কাল' নধর ছেলে মেয়েগুলি ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়; মায়ের সঙ্গে সঙ্গে কেউ বা বকিতে বকিতে যায়, কেউ বা পিছাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যায় কিন্তু আসে যায় সকলেই; ধূলিও উড়ে, কোলাহলও ধ্বনিত হয়।

একদিন চারিদিক ঘনাইয়া ঘোর করিয়া আসিয়াছে। বাদল সন্ধ্যায় বর্ষার ঝরঝর, দম্‌কা বাতাসের আঘাতে পাতায় মরমর। নিঝুম বর্ষাসন্ধ্যায় ঝিল্লি ও ভেকের একটানা তীব্র সুরের মধ্যে একটা অলসতা গভীরভাবে বাজিতেছে। সরোবরে পদ্ম ত ফুটেছে অনেক— হাওয়ার তালে জলের বুকে কাঁপিয়া কাঁপিয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছে আর পদ্মপাতার জল সে ত' অতি তরল, আছে কেবল টুপ্ টুপ্ টুপ্ শব্দ। ধ্বনিতেই পর্য্যবসিত সব। সকল ক্ষুদ্র জীবনের গানের ঝঙ্কার বৃহতের ওঁকারে পরিণত হইতেছে। এক কোণে এক পদ্মকুঁড়ির বুকের ভিতর কিসের কোলাহল লাগিয়া গিয়াছে! রূপ, রস, গন্ধে মিলিয়া আসর বসাইয়াছে। গন্ধ তখন চঞ্চল হইয়া বলিতে লাগিল, "পাপ্‌ড়ি ভাই! খোল' তোমার হৃদয়! ঐ যে আকাশ থেকে জলের ঝারা, আহা! সে কত দূর দেশের, অসীম জীবনের রসধারা বহিয়া আনিতেছে! একবার বুক খোল', অনন্তকে ধর! আমায় মুক্তি দাও, আমি এ বর্ষার মাতামাতির মাঝে আপনাকে ছাড়িয়া দিই! ঐ শোন' গোঁ গোঁ করিয়া বাতাস আমায় ডাকিতেছে! আমি কোথায় কতদূরে মুক্তপ্রাণের উচ্ছ্বাসে মাতিয়া বহিয়া যাইব! খোল' ভাই! খোল', তোমার অবগুণ্ঠন খুলিয়া দাও!" পাপ্‌ড়ি ঘাড় নাড়িয়া দিল। ভোঁ করিয়া ভ্রমর উড়িয়া গেল। রূপ ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "গন্ধ! অত যাই যাই ক'র না, আমার বুকে লাগিয়া থাক'! তুমি চাও মুক্তি নিজের মঙ্গলের জন্য, আমি চাই মুক্তি বিশ্বের জন্য! দেখ', তুমি ত ফুলের বাহুল্য! বাহুল্যই জগতের ঐশ্বর্য্য আর ঐশ্বর্য্য সকলের চেয়ে বড় সম্পদ্ কারণ সে অনাবিল আনন্দের বিকাশ! তাইতে সকলের মায়া! বলে না "নাতির নাতি স্বর্গে বাতি"? তুমি স্বাধীন কারণ মঙ্গলময়, আমি স্বাধীন

কারণ আমি সুন্দর! আমি ফুলের ফোটানোটাই সার্থক করিয়া তুলি! দেখ', তুমি গুণ আর আমি রূপ! রূপ গুণের সমাবেশই কি ভাল নয়? লক্ষ্মী সরস্বতীর মিলন হ'লেই মধুর হয়! দেখ', রূপ না হ'লে শুধু গন্ধে কি বিশ্বকে বশ করা যায়? যেখানে রূপ আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া উঠে, আনন্দের উচ্ছ্বাসে আপনাকে জাগাইয়া তুলে সেইখানেই তুমি আসিয়া জোট'! আমিও রূপ ছাপিয়ে রাখিতে পারিতেছি না! আমিও চাই মুক্তি, পাপ্ড়ির গায়ে আঘাত কর্‌চি যদি খুলে যায় কিন্তু ভয় হয় পাছে উবিয়া যাও!"

গন্ধ—"দেখ' রূপ! আমি ত' তোমার বুকে টল্‌টল্ করিতে থাকি কিন্তু কোথা থেকে পোড়া বাতাস এসেই যে আমায় নিয়ে যায়! তুমি ত' একটা ভাব ফুটিয়ে বিশ্বের আনন্দ-সাগরে ভেসে ওঠ! তোমার ও বিকাশের মাঝে একটা ব্যাপ্তি, একটা জাগরণ, একটা স্পন্দন জাগিয়া ঝরিয়া পড়ে! তুমি বিশ্বের বিয়োগান্ত নাটক! পরিবর্ত্তনের ব্যথাভরা মহাযাত্রার মধ্য দিয়া তুমি অনন্তকাল চলিতেছ' কিন্তু আমারও ত ভাই আমার উপর হাত নেই! আমি মনে করি থাকি কিন্তু বাতাস আসিয়া কার মঙ্গলের জন্য আমায় টানিয়া নেয়! আমি সব ভুলিয়া নাচিয়া চলিয়া যাই!" ভোঁ ভোঁ করিয়া ভ্রমর আসিয়া বলিল, "তা বৈ কি! একবার জোরে নিঃশ্বাস ফেল', পাপ্ড়ি খুলিয়া যাক্, আমি একটু মধু খাই!"

রস গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "চুপ্ কর'! বড় গোলমাল হচ্চে! তুমি গন্ধ, তুমি রূপ, তোমাদের বাইরে তোমরা আপনাদের সত্তা বিকাশ করিতেছ'! কিন্তু সকলের পিছনেই আমি আছি! গন্ধ, তোমার গন্ধের চাঞ্চল্যে আর রূপ, তোমার রূপের প্রস্ফুটনে আমি স্থির, গম্ভীর, নিত্য, অদ্বৈত! তোমরা যে বিচিত্র, বহু সে শুধু আমারি করস্পর্শে! অন্তরের রসে ভরপুর না হ'লে ত' পাপ্ড়ি খুল্‌বে না। অন্ধকারে চুপে চুপে এই কুঁড়ি রসের স্পন্দনে ফুল হ'য়ে ফুটে উঠ্‌বে! কুঁড়ি যখন রসে টল্‌মল্ ক'র্‌বে তখন আপনিই ফুল হ'য়ে ফুট্‌বে, বুক খুল্‌বে! মানুষের বয়সের যে তফাৎ সে শুধু রসের তারতম্যে! হৃদয়

যখন রসে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে তখনই সকল অঙ্গে তাহার পূর্ণ জোয়ার আসে। দেখ', কুঁড়িতে আর ফুলে বিশেষ তফাৎ নেই! কুঁড়ির ভিতর যখন রস গভীর হয় তখনই ফুল ফুটিয়া ওঠে! ফুলের ফোটা তখনই সার্থক হয়! রসের পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা বদ্ধ! ফুল ফুট্‌লেই ত গন্ধ উড়িয়া যাইবে, রূপ ঝরিয়া পড়িবে! ফুল হওয়া পর্য্যন্ত এই যে ফুলের এখনও-যা-হয়নির ধীবগতি ইহাই ত' সৃষ্টিরহস্য! ফুল হওয়াটার পরই পূর্ণচ্ছেদ; রূপ, গন্ধ গিয়া তখন বিশুদ্ধ রস জাগিয়া থাকে, বিশ্বের মনের ভিতর ফুলের বিচিত্র বস সৃষ্টি করিতে থাকে! বস্তু যায়, স্মৃতি থাকে! ফুলের আরম্ভে রস, অন্তে রস, প্রস্ফুটনে রস, রস তার সকল অঙ্গে, হৃদয়ভিতরে, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অনাস্বাদিত ভাবটা ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস করে! ঐ প্রয়াসই বিশ্বের আদি ও একমাত্র লীলা! ঐ ইচ্ছাশক্তিই বিরাট্ ভগবানের বিচিত্র মূর্ত্তির প্রকাশ—সেইজন্যই এত ঠাকুরের পূজা! তাই ফুল তুলিয়া দেবতাব পায়ে দেওয়া হয়! তাই ভক্তিরসে যখন হৃদয় ভিজিয়া যায় তখন হৃদ্‌পদ্মাসনে দেবতা আসিয়া বসেন! রস চায় আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে রূপ, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের বিকাশে; আপনার আনন্দ-হিল্লোলকে বহুধা করিয়া চারিদিকে প্রসারিত করে!"

"টুপ্‌ করিয়া এক ফোঁটা বৃষ্টিজল পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া ভিতরে পড়িল। গন্ধ শিহরিয়া উঠিল, রূপ উদাস হইয়া রহিল। রস চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, "আমার মধ্যে কেবল একটা ফুটিবার আকাঙ্ক্ষা! কোথা হ'তে এ আকাঙ্ক্ষা আসিতেছে তা ত' বুঝিতে পারি না! অনন্তকাল ধরিয়া সকলের পিছনে আমি বাহিরকে বিকশিত করিতেছি! এই যে বাহিরের বিকাশ—আমার মধ্য হইতে, আমার ভিতর দিয়া বাহিরে ফুটিয়া উঠে, না আর কারুর ভাবের ছায়া আমার মধ্য দিয়া প্রস্ফুটিত হয়? এই ত' পদ্ম রূপে, গন্ধে ফুটিয়া উঠিবে, এই পদ্মের ছবি আমার ভিতর ছিল না আর কারুর ভাবের ছায়া? কিন্তু আমি ত' স্থির হইয়া বসিয়া এই ফুলকে ফুটাইতেছি! আমার এ স্থৈর্য্য, এ অটল গাম্ভীর্য্য, এ অসীম ধ্যানস্থভাব কে আনিয়া দিল?"

এক ফোঁটা বৃষ্টির জল অনন্তের বিপুলতা তার বুকের মধ্যে পুরিয়া পদ্মর কুঁড়ির ভিতর আকুল করিয়া তুলিল। রূপ অন্ধকারে ধীরে ধীরে ফুটিতেছিল; ফুটিবার আনন্দে আপনহারা হইয়া কল্পনায় কোথায় চলিয়া যাইতেছে:—"এই বিশ্বের রূপ-বৈচিত্র্য অনন্তকাল ধরিয়া নব নব পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কেবল যে ফুটিয়া চলিয়াছে সে কার প্রভাবে? এই যে রূপ হঠাৎ ফুটিয়া উঠিতেছে, বিকাশের আনন্দে সমস্ত হৃদয় হিল্লোলিত হইতেছে এ রূপ কোথা হইতে আসিল? এই যে নীরবে আপনার সমস্ত কর্ম্মচাঞ্চল্যকে এক কেন্দ্রে আনিয়া একটা ভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সাধনা এর আনন্দটাই কি প্রতিদান? আমি যে ছড়াইয়া গিয়াছি—অসীম, অনন্ত, বহুদূর, বহুদূর, উর্দ্ধে, নিম্নে, চারিদিকে আমার যে বিপুল প্রসার! বাহিরে, অন্তরে, অঙ্গে, মনে, সর্ব্বজীবের সকল রকম বিকাশে আমার উচ্ছ্বাস কি আবেগভরে আমায় নাড়া দিতেছে! আমি এ ফুলের মধ্যে যদিও ক্ষুদ্র কিন্তু বিশাল বিশ্বসৌন্দর্য্যের এক কণা! আমি ফুটিব, ঝরিব, তারপর—"

বাতাসভরে পদ্মকলিকা দুলিয়া উঠিল, চারিদিকে জল ঝরিয়া পড়িল। ভোম্‌রা তখন ভোঁ ভোঁ করিয়া উড়িতে লাগিল। বাহিরে তখন ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বাদল সন্ধ্যার ঝিল্লির একটানা তীব্র সুর তরবারির মত অন্ধকারের বুক চিরিয়া চলিয়া যাইতেছে। সরোবরের চারিপাশে ভেকের মক্‌মকি অলসভাবে বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গন্ধ তখন কুঁড়ির অন্ধকারে বসিয়া বাতাসের কথা ভাবিতেছে, "হায়! যদি একবার খোলা পাইতাম উড়িয়া যাইতাম, বাতাসের বুকের উপর দিয়া কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইতাম! কত প্রান্তর, কত পর্ব্বত, কত গ্রাম, কত নগরের উপর দিয়া চলিয়া যাইব! আমি ত' কোনও রূপবিশিষ্ট নই কিন্তু যার রূপ আছে সেই যে আমায় বুকে করিয়া ধরে! তার দেওয়া নেওয়া শেষ হ'লেই আমি উড়ে যাই! এ সংসারে দেওয়া নেওয়া মিট্‌লেই ব্যস্! আমি ত উড়ি, রূপ ঝরিয়া পড়ে! ভাব চলিয়া যায়, ছাপ থাকে! আমায় ত' কেউ ধরে রাখ্‌তে পার্‌বে না আমি শুধু অসীমে নাচিয়া চলিব! সেই নদীতীরে কত

ফুলের রাশি ফুটিয়া আছে, জলে ভাসিয়া যাইতেছে! মনে পড়ে এক দিন ফুলের গাছের ফুলের গন্ধর সঙ্গে যখন আমার মিল হ'ল তখন কত কথা মনে প'ড়ে গেল'—ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ফুল কুড়ুতে আস্‌ত, তাদের সাজিভরা ফুলের রাশি বাতাসে কাঁপিয়া উঠিত! কে একজন একগাছা ফুলের মালা একটী মেয়ের গলায় পরিয়ে দিলে! দূর হ'ক বাতাস যে আমায় দাঁড়াতে দেয় না, উড়িয়ে নিয়ে চল্ল'! পালতোলা নৌকাখানি শাঁ শাঁ করিয়া চলিয়াছে! সন্ধ্যাকাশ মেঘাচ্ছন্ন! একটী ছোট মেয়ে তাই দেখিতেছে আমি তার চুলের রাশি কাঁপাইয়া পালে গিয়া আঘাত করিলাম, পাল কাঁপিয়া উঠিল! একদিন সাঁঝের বেলায় হু হু করে বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে চ'লে আস্‌চি! ঘাটের পথ বড় পিছল! একজন কিশোরী কলসীকক্ষে চলিয়াছে! চেন' চেন' বলিয়া বোধ হইল! ওহোঃ! একেই একদিন দেখেছিলুম! এর গলাতেই কে একজন মালা পরিয়ে দিয়েছিলো! দেখ্‌তে তখন ফুট্‌ফুটে ছিল! এখন ত মুখ শুকিয়ে গিয়েছে! কোনও অলঙ্কার, আভরণ নেই! ঘাটের উপর বসিয়া হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল! জল লইয়া টলিতে টলিতে আসিতেছে! দেহের ভার আর বইতে পারে না! এমন সময় পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল! কলসী ভাঙ্গিয়া গেল! "মাঃ" বলিয়া একটা বুকফাটা তপ্তশ্বাস বাতাসে মিশিল! উঃ, কি গরম! কি জ্বালা! এমন সময় দূরে কে গেয়ে উঠ্‌ল'—

ওমন! ওপারেতে আঁধার হ'ল
মেঘ রয়েছে জমে!
ওতুই, এপারেতে অবাক্ হ'য়ে
রইলি কেন থেমে!

বোঁও করিয়া এক দমকে বাতাস সরিয়ে নিয়ে গেল! তার কাণের কাছে পারের ডাক হুহু করিয়া শুনাইয়া দিলাম!"

সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে যখন অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। শোঁ শোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে। মাঝে মাঝে এক এক দমকে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিতেছে। ঝমঝম্ করিয়া বৃষ্টি

পড়িতেছে ঝিঁঝিঁদের ঝিল্লিধ্বনি সুরের ছায়াপথ রচনা করিয়া অনন্তধ্বনিতে গিয়া মিশিয়া যাইতেছে। ভেকেরা মক্‌মক্ করিয়া গলা ভাঙ্গাইয়া ফেলিতেছে। সমস্ত প্রকৃতি যেন থম্‌থম্ করিতেছে। একটা কিসের অব্যক্ত বেদনা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। আজি এ ভীষণ অন্ধকারে ভীষণকায় কে যেন কার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। নিঝুমতা আরও গাঢ়, গভীর ও উৎকট হইয়া উঠিল। এমন সময় টোকা মাথায় দিয়া হাটের পথ দিয়া চাষা গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। চারিদিক স্তব্ধ হইয়া আপনাদের ধ্যানে আপনারা মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল।

ওতার বয়ান যখন পড়ে মনে
নয়ান ভাসে জলে!
ঘাটের পথে আনাগোনা
সন্ধ্যে হ'য়ে এলে!
এই সাঁঝের বেলায়,
গাছের তলায়,
কি জানি কোন্ অঘোর খেলায়
থেকে থেকে শিউরে উঠি
মনে পড়ে গেলে!
কেঁদে কেঁদে বইছে হাওয়া,
শেষ হ'ল না নেওয়া দেওয়া
আঁধার পথে আছি ব'সে
জোনাকি পোকা জ্বলে!
হায় রে হায়!
বাদল যখন আসে নেমে
দাঁড়িয়ে থাকি থমকি থেমে!
হু হু হু দমক দিয়ে
কান্না কেবল তোলে!

জ্ঞানলাভের বিভিন্ন উপায়।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি এল)

বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে উপায়ে জ্ঞানলাভ করা হয় তাহাকে প্রধানতঃ পর্য্যবেক্ষণ, যুক্তি ও পরীক্ষা এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। কোন জিনিষ সাধারণভাবে দেখা এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভাবে দেখা উভয়ের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য আছে। এই তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভাবে বিশেষ করিয়া দেখার নাম পর্য্যবেক্ষণ। বিশ্বের আদি যুগ হইতে দুই চারিটি লোক নানাবিধ ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়া আসিতেছেন, ঐ জ্ঞান ক্রমে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী যুগের মানবসন্তান সেই সকল জ্ঞান সহজভাবে লাভ করে—তাহার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া কত ধৈর্য্যের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন হইয়াছিল সে কথা তাহারা ভুলিয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে—বৎসরের পরিমাণ নির্ণয়। শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা এইভাবে একটীর পর একটী ঋতুর আবির্ভাব হয়, আবার শীত ফিরিয়া আসে, মানব ইহা সহজেই লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু ঠিক কত দিন পরে এই পুনরাবর্ত্তন ঘটে তাহা প্রথমে নির্ণয় করা যায় নাই। দুই চারিজন (যাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন) তাঁহারা দেখিলেন, নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যের অবস্থানের সহিত বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাবের একটা সম্বন্ধ আছে। পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রের অবস্থান সূর্য্যের বিপরীত—এক পূর্ণিমার পর দ্বিতীয় পূর্ণিমার সময় নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রের অবস্থান পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, সুতরাং বুঝিতে হইবে এই সময়ের মধ্যে সূর্য্যের অবস্থানও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ভাবে সূর্য্য রাশিচক্রে ভ্রমণ করেন। বহু পর্য্যবেক্ষণ ও গণনা দ্বারা নির্ণয় করা হইল যে সূর্য্য নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে অদ্য যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন ৩৬৫ দিন পরে পুনরায় সেই স্থান ফিরিয়া আসেন।

অতএব ঋতুর পুনরাবর্ত্তন বা বৎসরের পরিমাণকাল ৩৬৫ দিন। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, গ্রহদের গতি এই সকলের জ্ঞানও বহু পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা লাভ করা হইয়াছিল। পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তির সাহায্যে নিউটন মাধ্যাকর্ষণশক্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তি ব্যতীত পরীক্ষাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে।

পর্য্যবেক্ষণ, যুক্তি ও পরীক্ষায় সাহায্যে পাশ্চাত্যজগতে অতি দ্রুতভাবে মানবের জ্ঞান ও শক্তি বাড়িয়া যাইতেছে। যে সকল অতি ক্ষুদ্র প্রাণী লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া মানবশরীরে নানারূপ রোগের উৎপত্তি করিতেছিল, অণুবীক্ষণের সাহায্যে তাহারা আজ ধরা পড়িয়াছে এবং ঔষধের দ্বারা বিনষ্ট হইতেছে। লক্ষ কোটি ক্রোশ দূরে যে সকল জ্যোতিষ্ক স্বয়ং প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কৌতূহলীনেত্রে আমাদের সূর্য্যমণ্ডলীর ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিল আজ তাহাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎ মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সংবাদ লইয়া যাইতেছে। রেলগাড়ী মোটরকার প্রত্যহ ৫'৬ শত ক্রোশ ছুটিয়া লোকজন জিনিষপত্র এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাইতেছে। "এয়ারোপ্লেনের" সাহায্যে লোকে আকাশে উড়িতে শিখিয়াছে এবং আরও দ্রুতভাবে যাইতে পারিতেছে। বৃহৎ জাহাজ অসীম সমুদ্রের মধ্যে পাড়ি দিতেছে। সমুদ্রে ডুবিয়া জাহাজ চলিতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় রহস্য উদ্ঘাটন করিবেন এবং জল স্থল অন্তরীক্ষ সর্ব্বত্র প্রভুত্ব করিয়া বেড়াইবেন, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এইরূপ স্পর্দ্ধা করিতেছেন।

পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে পাশ্চাত্যজগতে জ্ঞানের রাজ্য আশ্চর্য্যভাবে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু ইহারা জ্ঞানলাভ করিবার একমাত্র উপায় নহে। যোগশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিবার আর এক উপায়ের উল্লেখ আছে। তদ্গতচিত্তে কোন বস্তুর ধ্যান করিতে করিতে আমাদের হৃদয়, ঐ বস্তুতে সমাহিত হয়—ঐ বস্তুর সহিত এক

হইয়া যায়। ঐ বস্তুটি কি তখন আমরা তাহা জানিতে পারি। এই ভাবে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা বস্তুর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধরই জ্ঞান লাভ করিতে পারি। কিন্তু এই শব্দ স্পর্শ ব্যতীত বস্তুর একটা স্বরূপ আছে। আমাদের চক্ষু যদি না থাকিত তাহা হইলে বস্তুটির রূপ বলিয়া কিছু থাকিত না, কারণ, চক্ষুর সহায্যে আমাদের মন বস্তু সম্বন্ধে যাহা ধারণা করে তাহাই রূপ। আমাদের ত্বগিন্দ্রিয় যদি না থাকিত তাহা হইলে বস্তুটির স্পর্শ বলিয়া কিছু থাকিত না। এইরূপে আমাদের সকল ইন্দ্রিয়গুলি যদি না থাকিত তাহা হইলে বস্তুটির শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কিছুই থাকিত না, কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয় না থাকিলে বস্তুটির ধ্বংস হইত না, বস্তুটি থাকিত। এই যে শব্দ স্পর্শাদি ব্যতীত বস্তুর স্বতন্ত্র অবস্থান ইহাই বস্তুর স্বরূপ। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না, কারণ, যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকি সেই ইন্দ্রিয়গুলি বস্তুর শব্দ স্পর্শ প্রভৃতিরই জ্ঞান জন্মাইতে পারে, শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি হইতে বিভিন্ন বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। অথচ মানুষের ভিতরের জিনিষ যেমন তাহার পোষাক পরিচ্ছদ হইতে ভিন্ন এবং বড় সেইরূপ বস্তুর স্বরূপ বস্তুর শব্দ স্পর্শাদি অভিব্যক্তি হইতে ভিন্ন এবং বড়।

পর্য্যবেক্ষণ, প্রভৃতির দ্বারা আমরা যে জ্ঞানলাভ করি তাহা সর্ব্বদা নির্ভুল হয় না। কারণ, পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা বস্তুটি কিরূপ দেখায়, অর্থাৎ তাহার শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কি তৎসম্বন্ধেই আমরা অব্যবহিত ভাবে (directly) জ্ঞান লাভ করি, তাহার পর অনুমানের দ্বারা স্থির করি বস্তুটি কি। মরীচিকাতে যেমন অনেক সময় জলভ্রম হইয়া থাকে আমাদের পর্য্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানে সেইরূপ অনেক সময় ভ্রম প্রমাদ হয়। মরীচিকাতে জলভ্রম হইবার কারণ এই যে দূর হইতে মরীচিকার রূপ এবং জলের রূপ এক। জিনিষটার

স্পর্শ রস প্রভৃতি দূর হইতে গ্রহণ করা যায় না; শুধু রূপই গ্রহণ করা যায় এবং সেই রূপ জলের রূপ হইতে ভিন্ন নহে। ইহা হইতে মন স্বতঃই অনুমান করিল—ইহা জল। অবশ্য যিনি বিজ্ঞ হইবেন তিনি বিবেচনা করিবেন শুধু রূপ দেখিয়াই জল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। রূপ এক হইলেও স্পর্শ রস প্রভৃতি ভিন্ন হইতে পারে। এজন্য তাঁহারা স্পর্শ রস প্রভৃতি না দেখিয়া বস্তুটা কি তাহা সিদ্ধান্ত করিবেন না। ঠিক এই রকম যুক্তির সাহায্যে কল্পনা করা যায় যে দুইটি বস্তুর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এক হইলেও তাহারা যথার্থ এক বস্তু না হইতেও পারে। এই পাঁচটি গুণ এক হইলেও বস্তু দুইটির মধ্যে এক ষষ্ঠ গুণ সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিতে পারে, যে ষষ্ঠগুণটি ধরিবার মত ইন্দ্রিয় আমাদের নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে অনুমান মাত্র করিতে পারি—সে অনুমান যে অভ্রান্ত হইবে তাহা বলিতে পারি না। ব্যবহারিক জগতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অভ্রান্ত জ্ঞান বলিয়াই মনে করা হয় কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান সব সময় অভ্রান্ত হয় না। বাস্তবিক পক্ষে, ব্যবহারিক জগতে বস্তুর অভিব্যক্তি হইতে স্বতন্ত্রভাবে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে যে সব সময় আমাদের কোন সঠিক ধারণা থাকে তাহা নহে। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের সমষ্টিকেই আমরা বস্তুর স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করি। কিন্তু বস্তুর স্বরূপ এই সকল শব্দ স্পর্শাদি হইতে বিভিন্ন। শব্দস্পর্শাদি আমাদের মনের ধারণামাত্র,--অর্থাৎ আমাদের মনের নির্দ্দিষ্ট আকারে আকারিত হওয়া—আমাদের মনের অংশ। কিন্তু বস্তুর স্বরূপ আমাদের মনের বাহিরে অবস্থিত।

দেখা গেল যে পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা বস্তুর স্বরূপ অব্যবহিত ভাবে (directly) উপলব্ধি করা যায় না, অনুমানের সাহায্যে বস্তুর স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা যোগশাস্ত্রোক্ত জ্ঞান-লাভের যে উপায়ের উল্লেখ করিয়াছি তাহার সাহায্যে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে অব্যবহিত (direct) জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহার জন্য বস্তুটি দেখিবার প্রয়োজন নাই, স্পর্শ করিতে হয় না—শুদ্ধ বস্তুটি চিন্তা করিতে হয়।

তাহাতে মন ঐ বস্তুটির সহিত এক হইয়া যায় এবং বস্তুর স্বরূপ কি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য এরূপ শক্তি লাভ করিবার জন্য উপযুক্ত সাধনার প্রয়োজন। পণ্ডিচারীর উত্তরযোগী প্রণীত Yogic Sadhan নামক ইংরাজীপুস্তকে একস্থলে এই দুই প্রকার জ্ঞানলাভের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বোঝান হইয়াছে। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইতেছে:—

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাউক তুমি একটি লোককে দেখিতেছ। তুমি জানিতে চাও সে কিরূপ লোক, তাহার চিন্তা কিরূপ, তাহার কার্য্য কিরূপ প্রভৃতি। এখন একজন বৈজ্ঞানিক অথবা ইন্দ্রিয়াপেক্ষ ব্যক্তি কিরূপভাবে তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করে দেখা যাউক। সে যে লোকটীকে পর্য্যবেক্ষণ করে, সে কি বলে তাহা মনোযোগ দিয়া শোনে, তাহার কথন ও বদনভঙ্গী ভাল করিয়া দেখে, তাহার কার্য্যাবলী এবং সে কিরূপ লোকের সহিত মিশে এই সকল বিষয়ের খবর রাখে। এ সকলই বস্তুটির বাহ্যিক সত্তা সম্বন্ধীয়। তৎপরে সেই জ্ঞানান্বেষী তাহার পূর্ব্বলব্ধ বাহ্যিকজ্ঞানের অভিজ্ঞতা হইতে যুক্তি বিচার করে। সে বলে "এই লোকটা এই সব কথা বলে অতএব এর চিন্তাপ্রণালী নিশ্চয়ই এই রকমের অথবা এর চরিত্র এইরূপ ধরণের হইবেই হইবে। এর কাজকর্ম্মতো এই কথাই বলে, এর মুখভঙ্গীতেও তো ইহাই সূচিত হয়।"—এইরূপেই তাহার যুক্তিপরম্পরা চলিতে থাকে। ইহাতেও যদি সে সকল রকম প্রয়োজনীয় খবর পায় নাই বলিয়া মনে করে তাহা হইলে সে বাকীটুকু তাহার কল্পনা অথবা পূর্ব্ব লব্ধ জ্ঞানের স্মৃতির সাহায্যে পূরণ করিয়া দেয় অর্থাৎ অপর সকল লোকের সম্বন্ধে, তাহার নিজের সম্বন্ধে, অথবা মানবজীবন সম্বন্ধে তাহার পুস্তকলব্ধ কিম্বা অপরের নিকট হইতে শ্রুত জ্ঞানের যে অভিজ্ঞতা, তাহার সাহায্যেই সে এইরূপ করে। সে অনুভব, পর্য্যবেক্ষণ, বৈপরীত্যসন্ধান, তুলনাকরণ, সিদ্ধান্তানুমান, যুক্তি সাহায্যে তথ্য নির্দ্ধারণ, অনুকল্পন, স্মৃতি সাহায্যে নির্ণয় প্রভৃতি প্রথায় কার্য্য করিয়া থাকে—এবং এই সকলের একত্র সংহত ফলকেই সে

যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান অথবা শুধু জ্ঞান, প্রকৃত সত্য এই সকল আখ্যা দিয়া থাকে। ঠিক ঠিক বলিতে গেলে সে এইরূপ একটা সম্ভাব্য সত্যের নির্দ্ধারণ করিয়াছে এই কথাই বলিতে হয়। কারণ তাহার সিদ্ধান্তগুলি যে সত্য সত্যই কোনও বস্তু সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য এবং তাহার পর্য্যবেক্ষণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বকের সাহায্যলব্ধ জ্ঞানের চিন্তন ব্যতীত যে আরও কিছু, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব।

এখন যিনি যোগী তিনি কিরূপে বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করেন দেখা যাউক। তিনি একেবারে আপনাকে জ্ঞেয় বস্তুটির যথার্থ স্বরূপের সহিত সম্বদ্ধ করেন। তিনি হয়তো তাহার আকার কখনও চোখে দেখেন নাই, নামও শোনেন নাই অথবা তদ্বস্তুগত কোনও বিশিষ্ট গুণের অভিজ্ঞতাও হয়তো তাঁহার নাই কিন্তু তবুও জিনিষটি কি বুঝিতে পারা তাঁহার পক্ষে সম্ভব। কারণ, তাঁহার স্বরূপ সত্তা যাহা তাহার সহিত উহাও যে (অখণ্ড) একরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। * * * আমি (যোগী) যে লোকটিকে অথবা যে বস্তুটিকে বুঝিতে চাই তাহার সহিত আমাকে, আমার আত্মাকে বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করি। আমার যে প্রজ্ঞা তাহা অপর লোকটির অথবা বস্তুটিরও প্রজ্ঞা হইয়া উঠে। আচ্ছা, কি উপায়েই বা আমি এইরূপ করিয়া থাকি? উত্তরে বলা যায় যে কেবল স্থির হইয়া সেই ব্যক্তি বা বস্তুটিকে স্বীয় বুদ্ধিতে প্রণিধান দ্বারা। যদি আমার বুদ্ধি একেবারে সম্পূর্ণ পবিত্র অথবা বেশ কতকটাও—পবিত্র হইয়া থাকে, যদি আমার মন শান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি জ্ঞেয় বস্তুটির সম্বন্ধে সত্য কি তাহা বুঝিতে হইব সমর্থ।

(২১ হইতে ২৩ পৃঃ)

এই রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা গঠিত স্থূল শরীর হইতে স্বতন্ত্র যে একটা সূক্ষ্ম শরীর আছে তাহা দার্শনিকগণ বহুদিন হইতে স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এই সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ করা অতি দুরূহ। কারণ, এই সূক্ষ্ম শরীর আমাদের চক্ষু ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এজন্য

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পরিচিত পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি উপায় ইহার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হয় না। কোন্ চিন্তার পর কোন্ চিন্তা আসিয়া পড়ে, কোন্ অবস্থায় কি স্বপ্ন দেখা যায়—এই সকল লক্ষ্য করিয়া অনুমানের সাহায্যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মানবের অন্তর রাজ্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করেন। কিন্তু এই উপায়ে অন্তর রাজ্যের সমস্ত খবর পাওয়া যায় না, যে সকল খবর পাওয়া যায় তাহার সকলই আবার নির্ভুল নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, আত্মা সম্বন্ধে বহু পাশ্চাত্য দার্শনিকের ধারণা অত্যন্ত অনিশ্চিত ছিল। এই স্থূল দেহ ব্যতীত যাহা কিছু সকলই আত্মা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এই আত্মাকে তাঁহারা কখনও mind বলিয়াছেন, কখনও soul বলিয়াছেন; ইচ্ছা করা, অনুভব করা, জ্ঞান লাভ করা সকলই আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। হিন্দু দার্শনিক এই অন্তর রাজ্য বিশ্লেষণ করিয়া ইহার মধ্যে নানা বিভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব নির্ণয় করিয়াছেন—যথা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার। ইহারা সকলেই আত্মা হইতে বিভিন্ন এবং জড় পদার্থমাত্র। হিন্দু দার্শনিক যোগপ্রভাবে এই সকল তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন—অনুমানের সাহায্যে নহে, এজন্য তাঁহার সিদ্ধান্ত বিশদ ও নির্ভুল। জন্ম, মৃত্যু, পরলোক, জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকের জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ। কারণ, এই সকল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার উপাদান পাশ্চাত্য দার্শনিকের পক্ষে অতি সামান্য। শুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে।

মানবের অন্তর রাজ্যের জ্ঞানলাভে পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও যুক্তি যদি অনুপযোগী হয় তাহা হইলে যে অবাঙ্‌মনসোগোচর পরম পুরুষ অচিন্ত্যনীয় কৌশলে এই বিশাল জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয়ে এই পর্য্যবেক্ষণ-পরীক্ষা-যুক্তি পদ্ধতি যে একান্ত অসমর্থ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় না হইলে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা চলে না। কিন্তু ভগবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন,—অথবা দিব্যদৃষ্টি না পাইলে তাঁহাকে দেখা যায় না—"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি

ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ", "যন্মনসা ন মনুতে", "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যই তাহার প্রমাণ। ভগবান্ যুক্তিরও একান্ত বাহিরে, তর্ক ও যুক্তির দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না—"নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া।"

যেমন পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা ভগবান্‌কে জানা যায় না, সেইরূপ আমাদের মন বুদ্ধি দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কারণ, মনের শক্তি যতই বাড়ুক না কেন, তাহার একটা সীমা থাকিবে, কিন্তু ভগবান্ অসীম। সসীম মনের দ্বারা অসীম ভগবান্‌কে কিছুতেই আয়ত্ত করা যায় না। ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে মনেরও পারে যাইতে হইবে—সসীমের রাজ্য ছাড়াইয়া অসীমের রাজ্যে যাইতে হইবে। এই অবস্থা একমাত্র মনের নিরোধ দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে এবং মনের নিরোধের নামই যোগ। "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ।" কিন্তু ভগবান্‌কে লাভ করিবার যথার্থ উপায় তাঁহার অনুগ্রহ। ভগবানের অনুগ্রহ হইলে যোগ অভ্যাস না করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া যায়, কিন্তু অনুগ্রহ না হইলে শুদ্ধ যোগাভ্যাস দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। শ্রুতি বলিতেছেন—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" তবে দেখা যায়, যাহারা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয় তিনি তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া দেখা দেন।

অতএব আমরা জ্ঞানলাভ করিবার তিনটি উপায় দেখিতে পাই-লাম। (১) পর্য্যবেক্ষণ-পরীক্ষা-যুক্তি। স্থূলজগতের পক্ষে ইহা উপযোগী। যদিও এই পদ্ধতিতে অভ্রান্তরূপে পদার্থের তত্ত্বনির্ণয় করা যায় না, তথাপি ব্যবহারিক জগতে ইহার খুব উপযোগিতা আছে। যে জ্ঞানের উদ্দেশ্য মানুষের নানারূপ সুবিধা সৃষ্টি, ও প্রকৃতির উপর মানবের অধিকার বিস্তার সে জ্ঞানলাভে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম জগৎ ও ভগবৎতত্ত্ব নির্ণয়ে ইহা একান্ত অসমর্থ। (২) যোগাভ্যাস। স্থূল জগতের তত্ত্ব নির্ণয়ের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপযোগী; অধিকন্তু সূক্ষ্মজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। (৩) ভগবানের অনুগ্রহ। ইহাই ভগবান্ লাভ করিবার

একমাত্র উপায়। শুদ্ধ তাহাই নহে, ইহার দ্বারা কি স্থূল জগৎ কি সূক্ষ্মজগৎ সর্ব্ববিষয়ে চরম জ্ঞান লাভ করা যায়। কারণ, ভগবান্‌কে জানিলে আর কিছুই জানিতে বাকি থাকে না।

যস্মিন্ "বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"

গুরুগৃহে শঙ্কর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীমতী—)

উপহার লইয়া গুরু সন্নিকটে যাইতে হয়, একথা বিশিষ্টাদেবীর অবিদিত ছিল না। তিনি পরিচারিকা হস্তে সমিধ, কুশ অজিন, বস্ত্র এবং গুরু পূজার উপকরণাদি সমস্তই দিয়াছিলেন। মুণ্ডিতমস্তক সদ্যউপনয়নসংস্কৃত, কৌপীনধারী বালক শঙ্কর বিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুগৃহে যাইতেছেন। জ্ঞানালোক লাভের আনন্দে তাঁহার চিত্ত পরম প্রফুল্ল। স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কোন্ অপরিচিত স্থানে শিক্ষকের কঠোর শাসনাধীনে থাকিতে হইবে এ চিন্তা বালকের হৃদয়ে একবারও স্থান পাইতেছে না। তিনি ইহতে তিলমাত্র চিন্তিত বা ভীত নহেন, মায়ের অদর্শন দুঃখও তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিতেছে না। তিনি সানন্দে সোৎসাহে দ্রুতপদসঞ্চারে পথ চলিতেছেন। পরিচারিকা দ্রব্যসম্ভার মস্তকে লইয়া দ্রুতগমনে অক্ষম হইয়া মধ্যে মধ্যে শঙ্করকে ধীরগমনে অনুরোধ করিতেছে।

শঙ্কর প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি সমাপন করিয়া গুরুগৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার কোনপ্রকার উদ্বেগের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু ক্রমে দিনমণির দ্বিপ্রহর লক্ষণ প্রকাশ হইল। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখর প্রতাপ ক্রমে অনুভূত হইতে লাগিল। পথও বড় অল্প ছিল না এবং পঞ্চমবর্ষীয় বালকের পক্ষে সে পথ অতিক্রম করা

সহজসাধ্য নহে। কিন্তু শঙ্কর তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইলেও, প্রভাকরপ্রভায় তাঁহার উজ্জ্বল গৌর বদনকান্তি অরুণবর্ণ ধারণ করিল, সর্ব্বাঙ্গে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। যেন জ্ঞানরাজ্যে প্রভাতকাল সমাগত, এবং তথাকার নবদূর্ব্বাদল সমাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে নিশাশেষের শিশিরবিন্দু নিচয় উদীয়মান জ্ঞানসূর্য্যের অরুণ কিরণে ঝলমল করিতেছে!

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইতে না হইতেই পরিচারিকা দূর হইতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শঙ্করকে গুরুধাম প্রদর্শন করাইল। তখন সহসা শঙ্করের গতি মন্থর হইল, তিনি পরিচারিকার নিকট মাতৃপ্রদত্ত দ্রব্যগুলি যথাযথভাবে রক্ষিত কিনা একবার দেখিয়া লইলেন, এবং পরিচারিকাকে অন্য কথা না বলিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে জননীর বিশেষরূপ সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন। পরিচারিকাও তাঁহাকে সমুচিত আশ্বাস দিয়া বলিল, বাছা, সেজন্য কোন চিন্তা করিও না। তুমি মন দিয়া বিদ্যাভ্যাস কর এবং তোমাদের কুল উজ্জ্বল কর।

এইরূপে কথায় কথায় শঙ্কর আশ্রমের নিকটে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমপ্রান্তে একটী সরোবর ছিল। শঙ্কর হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক শুচি হইয়া গুরু দর্শন করিবেন ভাবিয়া সরোবর উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। পরিচারিকা ক্লান্তিবশতঃ আশ্রমদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে লাগিল।

এদিকে দ্বিপ্রহর সন্নিকট দেখিয়া আশ্রমস্থ বালকগণ মধ্যাহ্ন স্নান এবং সন্ধ্যাবন্দনার জন্য একে একে সরোবরে সমবেত হইতেছিল। শঙ্কর সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়া বিদ্যার্থী বালকগণের প্রতি কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিদ্যার্থিগণ এই অপরিচিত বালককে দেখিয়া কেহ বা তাঁহার সহিত আলাপের জন্য ইচ্ছা করিল, কেহ বা বিস্মিতভাবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল, কেহ বা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিল না। ইতিমধ্যে একটী বালক সহসা শঙ্করকে চিনিতে পারিল। সে সত্বর শঙ্করের নিকটস্থ হইয়া সানন্দে

বলিয়া উঠিল, "কি ভাই শঙ্কর এখানে কেন? তুমি কি গুরুগৃহে আসিলে?" শঙ্করও পরিচিত বালককে দেখিয়া সহর্ষে তাহার কথায় প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন, "ভাই আমি তোমাকেই খুঁজিতেছিলাম, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমায় গুরুদেবের নিকট লইয়া চল।" বালকটী শঙ্করের কথায় সানন্দে স্বীকৃত হইল। বহুদিন পরে একটী পরিচিত বন্ধুকে পাইয়া তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না, সে তখনই শঙ্করকে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিল। শঙ্করের পরিচারিকাও তাহাদের অনুসরণ করিল।

বালকটী শঙ্করকে লইয়া অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইল। অধ্যাপক মহাশয় তখন অধ্যাপনান্তে ছাত্রগণকে বিদায় দিয়া নিজেও মধ্যাহ্নকৃত্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কয়েকটী বালক গুরুর আদেশ অপেক্ষায় তথায় দণ্ডায়মান, কেহ বা মঠের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। পরিচারিকাসহ শঙ্করকে দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় ইহাদের পরিচয়ার্থ কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। ইতিমধ্যে শঙ্কর সসম্ভ্রমে গুরুচরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণিপাত করিলেন এবং পূজোপকরণাদি চরণপ্রান্তে রক্ষা করিলেন।

অধ্যাপক মহাশয় শঙ্করকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মধুর বচনে তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। শঙ্করকে উত্তরের অবসর না দিয়া পরিচারিকা তখন অধ্যাপক মহাশয়কে প্রণামপূর্ব্বক শঙ্করের পিতা মাতার পরিচয় প্রদান করিয়া শঙ্করের বিদ্যাভ্যাসের জন্য বিশিষ্টাদেবীর আগ্রহাতিশয্য ও বিনীত প্রার্থনা নিবেদন করিল।

অধ্যাপক মহাশয় শঙ্করের পিতা শিবগুরুকে বিশেষভাবেই চিনিতেন। তিনি পরিচারিকার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, হাঁ বাছা, আমি ইহাদিগকে ভালরূপে জানি, আর বলিতে হইবে না। এই বলিয়া অধ্যাপক মহাশয় শঙ্করের মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমিই সেই শিবগুরুর পুত্র শঙ্কর? শিবগুরু আমার পরম মিত্র ছিলেন। তোমার দর্শনে আমি পরম সুখী হইলাম। তুমি যে শীঘ্রই আমার নিকট আসিবে ইহা আমি

পূর্ব্বেই জানিতাম। তোমার অসাধারণ মেধা ও বিদ্যানুরাগের কথা আমি তোমার পিতার নিকট শুনিয়াছিলাম। তিনি তোমায় পঞ্চম বর্ষেই উপনীত করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিবেন এরূপ ইচ্ছাও আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক আশীর্ব্বাদ করি তুমি পিতার ন্যায় পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক হইয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে এবং তোমার পিতার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। এক্ষণে যাও বৎস! স্নানাহার কর, বেলা অধিক হইয়াছে, আহারান্তে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।" অতঃপর অধ্যাপক মহাশয় নিজপত্নীকে আহ্বান করিয়া শঙ্করকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করতঃ শঙ্করের অসাধারণ চরিত্রের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। পরিচারিকা বিশিষ্টাদেবীর শিক্ষামত গুরুপত্নীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, এই বালকটী ইহার পিতামাতার বড় আদরের ধন। এ দেখিতে নিতান্ত বালক না হইলেও ইহার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। আপনি ইহাকে পুত্রজ্ঞানে পালন করিবেন। এ বালক সর্ব্বদা লেখা পড়া লইয়াই পাগল, আহারাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, ইহাকে খাইতে না বলিলে কখন চাহিয়া খায় না।" গুরুপত্নীও সমুচিত বাক্যে তাহাকে আশ্বাস দিলেন।

তিনি শঙ্করের প্রফুল্ল বদন, কমনীয় মূর্ত্তি এবং বিনীত ভাবে বড়ই মুগ্ধ হইলেন, বাৎসল্য স্নেহে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইল। তিনি সযত্নে শঙ্করের স্নানাহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরিচারিকাও সেদিন সেই মঠে প্রসাদ পাইয়া অপরাহ্ণে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

শুভদিনে শুভক্ষণে শঙ্করের শিক্ষা আরম্ভ হইল। কয়েকদিনের মধ্যেই অধ্যাপক মহাশয় বুঝিলেন এ বালক সাধারণ বালক নহেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তিনি শঙ্করের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, অদ্ভুত প্রতিভা, দেবচরিত্র, দেব দ্বিজ ও গুরুভক্তি, এবং শান্ত স্বভাবের পরিচয় পাইতে লাগিলেন। শঙ্করের সহপাঠিগণ তাঁহার বিদ্যানুরাগের জন্য তাঁহাকে খেলার সঙ্গী করিতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইত, কিন্তু তাঁহাকে একবার দেখিলেই সব ভুলিয়া যাইত।

৫

শঙ্করের কোমল স্বভাবে এবং ভদ্র ব্যবহারে কেহই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারিত না।

শঙ্করের গ্রহণ ও ধারণ শক্তিও অসাধারণ ছিল। গুরু একবার যাহা বুঝাইয়া দিতেন তিনি তখনই তাহা বুঝিয়া লইতেন এবং তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। কেবল তাহাই নহে, তিনি অপর ছাত্রের পাঠ-গুলিও একবার শুনিলেই শিখিয়া ফেলিতেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় শঙ্কর ইহা কাহাকেও জানিতে দিতেন না। কেবল আচার্য্য মধ্যে মধ্যে শঙ্করকে নূতন পাঠ দিবার সময় দেখিতেন, যে সে সমুদয় শঙ্করের অবগত ও কণ্ঠস্থ হইয়া রহিয়াছে। একদিন তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া এ বিষয় শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শঙ্করও যেরূপে তাহা অবগত হইয়াছেন বিনীতভাবে গুরুচরণে নিবেদন করিলেন। ইহাতে আচার্য্যের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি শঙ্করকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তক চুম্বন করিয়া অশেষ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এইরূপে দিনে দিনে শঙ্কর বিদ্যালয়ের সকলেরই পরম আদরের পাত্র হইয়া উঠিলেন। বিদ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক বলও অসাধারণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি বয়সে নিতান্ত বালক হইলেও আকৃতি প্রকৃতিতে অচিরে যেন যুবার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। দৃঢ়তা, একাগ্রতা, গাম্ভীর্য্য ও চিন্তা-শীলতায় তাঁহাকে যেন মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হইত।

আচার্য্যদম্পতী শঙ্করের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন কিন্তু ইহাতে অপর ছাত্রগণ কেহই শঙ্করের প্রতি হিংসা করিত না। তাঁহার উদারতা, সরলতা এবং বাধ্যতা প্রভৃতি গুণে ছাত্রগণ তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিত, অনেক সময় তাঁহার গৌরবে তাহারা নিজেদের গৌরবান্বিত জ্ঞান করিত।

গুরুগৃহে বালকগণকে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অনেক কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইত। নিত্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, আহ্নিক, সন্ধ্যা, বন্দনা, অধ্যয়ন, গুরুসেবা, দ্বিপ্রহরে ভিক্ষায় গমন, দিনান্তে একবার মাত্র ভোজন, রাত্রে তৃণশয্যায় শয়ন ইত্যাদি নানা

কঠোর নিয়মের অধীন থাকিতে হয়। শঙ্কর বালক হইলেও এ সকলই যথানিয়মে পালন করিতেন। কেবল তিনি নিতান্ত বালক বলিয়া আচার্য্য ভিক্ষাপর্য্যটনাদি কয়েকটী কর্ম্ম প্রায়ই তাঁহাকে করিতে দিতেন. না। কিন্তু শঙ্কব তাহাতে একটু লজ্জা অনুভব করিতেন, কারণ তাঁহার সঙ্গিগণ এ কার্য্য আনন্দে অনুষ্ঠান করিত।

এইরূপে শঙ্করের গুরুগৃহবাসে প্রায় দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল। এই দুই বৎসরেব ভিতর শঙ্কর গুরুর যাহা কিছু বিদ্যা সমুদয়ই আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। ইতিহাস. পুরাণ, কাব্য অলঙ্কার, দর্শন ও সাঙ্গবেদ সমস্তই দুই বৎসরে তাঁহার শিক্ষা হইল দেখিয়া আচার্য্য শঙ্করকে আর যেন মনুষ্য বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না। শঙ্করের শিক্ষাগুরু হইয়া তিনি নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিতে লাগিলেন। গুরু এবং শিষ্য উভয়েই দেখিলেন এক্ষণে আর শিষ্যের গুরুগৃহবাসের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আচার্য্য শঙ্করকে পুত্রাধিক প্রিয় জ্ঞান করিতেন। তিনি তাঁহার বিদ্যার পূর্ণতার জন্য একদিন বলিলেন, "বৎস! তুমি এইবার এখানেই কিছুদিন অধ্যাপনা কর, তামার যদি কিছু বিদ্যামল থাকে তাহা অধ্যাপনা দ্বারা তিরোহিত হইবে। অনন্তর গৃহে যাইয়া বিদ্যা প্রচার করিও।"

এই বলিয়া আচার্য্য শঙ্করকে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। শঙ্কর নিত্য নিয়মিত অধ্যাপনান্তে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা গুরুসেবায় রত থাকিতেন। অপর বালকের গুরুসেবার ভার তিনি নিজে যাচ্ঞা করিয়া লইতেন। গুরুর নিকটে অবস্থান, গুরুর সহিত শাস্ত্রালোচনা, গুরুর অনুগমন, তাঁহাব বড়ই প্রিয়কার্য্য বলিয়া বোধ হইত। গুরুও শঙ্করকে পাইলে যেন মহান্ আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার যাহা কিছু প্রয়োজন সবই শঙ্করের দ্বারা নিষ্পন্ন করাইতেন।

এইভাবে কিছুদিন গত হইলে, একদিন শঙ্করের ইচ্ছা হইল "অদ্য ভিক্ষা করিয়া গুরুকে ভোজন করাইব"। তিনি সেদিন ভিক্ষার জন্য

গুরুদেবের অনুমতি লইয়া কয়েকটী বিদ্যার্থিসহ ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন।

কয়েক গৃহে ভিক্ষার পর কিছুদূর গমন করিয়া তিনি এক দরিদ্রের কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্যার্থীরা তাহা দেখিয়া কহিল, "মহাশয়! ওখানে যাইবেন না, ওখানে এক দরিদ্রা ব্রাহ্মণী বাস করে, সে ভিক্ষা দিতে পারিবে না।" শঙ্কর কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বিদ্যার্থিসহ ভিক্ষার্থ সেই ব্রাহ্মণীর গৃহেই গমন করিলেন।

শঙ্কর 'নারায়ণ হরি' বলিয়া কুটীরদ্বারে দাঁড়াইলেন। অতিথিসমাগম বুঝিয়া ব্রাহ্মণী দ্বারপথে চাহিয়া দেখিলেন। দ্বারে বিদ্যার্থিগণসহ দেববালকসদৃশ শঙ্করকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ও স্নেহের সঞ্চার হইল। কিন্তু তখনই নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিলেন এবং কুটীরের চারিদিকে চাহিয়া ম্রিয়মাণভাবে অতিথিগণ সমক্ষে আসিলেন।

ব্রাহ্মণী বড় দরিদ্রা, তাঁহার ভিক্ষা দিবার সামর্থ্যই নাই। পরিধানে ছিন্ন বসন। মাসের অর্দ্ধেক দিন তাঁহার উপবাসে যায়। দেহ জীর্ণশীর্ণ মলিন। তাহাতে তিনি আবার পতিহীনা অভাগিনী এবং কতকগুলি অপোগণ্ড শিশুর জননী। নিজের প্রাণপণ পরিশ্রমে এবং পল্লীবাসীর দয়াতে কোনরূপে তাঁহাদের প্রাণধারণ হয়। তাঁহারই দ্বারে আজি দ্বিপ্রহরে ক্ষুধার্ত্ত ব্রহ্মচারী বালকগণ!

কি সর্ব্বনাশ! কি ভিক্ষা দিবেন। গৃহে ত কিছুই নাই। কিরূপে লজ্জা নিবারণ হয়, হরি লজ্জা রক্ষা করুন, অতিথি যে ফিরিয়া যায়। অতিথি বিমুখ হইলে অধর্ম্ম হইবে। ব্রাহ্মণী অত্যন্ত কাতরভাবে দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে কেবলই ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন।

শঙ্কর ব্রাহ্মণীকে নীরব নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পুনরায় 'নারায়ণ হরি' বলিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। ব্রাহ্মণীর হৃদয় তখন ব্যাকুল হইল, কিন্তু তখনই মনে হইল গৃহে সদ্যসংগৃহীত ধাত্রী ফল আছে। তখন তিনি ব্যস্তভাবে কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কতকগুলি আমলকী ফল লইয়া আসিলেন।

ব্রাহ্মণী আমলকী ফলগুলি লইয়া শঙ্করের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "বাবা! আমি বড় দুখিনী, মুষ্টিভিক্ষাদানেও ভগবান্ আমায় বঞ্চিতা করিয়াছেন! আমার গৃহে এক মুষ্টি চাউল নাই যে তোমাদের দিই, যাহা ছিল তাহা আমার বাছাদের জন্য পাক করিতেছি। তোমরা দয়া করিয়া এই আমলকী ফলগুলি লইয়া সন্তুষ্ট হও।

ব্রাহ্মণী এই বলিয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে শঙ্করের ভিক্ষাপাত্রে সেই আমলকী ফলগুলি দিলেন। শঙ্কর দেখিলেন ফলগুলি ব্রাহ্মণীর অশ্রুজলে ধৌত হইয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্রে পতিত হইল।

পরদুঃখকাতর কোমলহৃদয় শঙ্কর সকলই দেখিলেন। ব্রাহ্মণীর কাতরতায় তিনি বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং অধোমুখ হইয়া কোনরূপে অশ্রুজল সম্বরণ করিলেন।

তিনি মধুর সম্বোধনে ব্রাহ্মণীকে কহিলেন, "মা! আপনার স্নেহভক্তি-পুত এই দানই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান হইয়াছে। আমাদের গুরুদেব বড় ধাত্রীফলপ্রিয়। আপনার গৃহ-প্রাঙ্গণে ফলভারাবনত ধাত্রীবৃক্ষ দেখিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আমাদের অভীষ্ট আপনি যেমন অযাচিতভাবে পূর্ণ করিলেন, ভগবান্ তদ্রূপ আপনার অভীষ্ট অচিরে পূর্ণ করিবেন। মা! আপনি দুঃখিতা হইবেন না। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে অচিরে আপনার গৃহে মা লক্ষ্মীর কৃপাবারি বর্ষিত হইবে।"

শঙ্কর এই বলিয়া বিদায় হইলেন।

শঙ্করের অমিয়মাখা আশীর্ব্বচন শুনিয়া ব্রাহ্মণীর আশার সঞ্চার হইল। শঙ্করের দরিদ্রের প্রতি মমতা দেখিয়া ব্রাহ্মণীর নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। তিনি ছিন্নঅঞ্চলে নয়ন মুছিতে মুছিতে কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

জীবন্মুক্তি স্বরূপ।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিবিধো বাসনাব্যূহঃ শুভশ্চৈবাশুভশ্চ তে।
প্রাক্তনো বিদ্যতে রাম দ্বয়োরেকতরোঽথবা ॥ ৯।২৫ ॥

"বাসনা সমূহ দুই প্রকারের হইয়া থাকে, শুভ ও অশুভ। হে রাম, এই উভয় প্রকার বাসনার মধ্যে একপ্রকার মাত্র বাসনা, অথবা উভয় প্রকারেরই বাসনা তোমার পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিতরূপে আছে? (এবং যদি এক প্রকার মাত্র বাসনাই তোমার পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিতরূপে আসিয়া থাকে, তবে তাহা শুভ কিংবা অশুভ বাসনা?)

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুইটির মধ্যে তুমি কি একটি মাত্রের দ্বারা পরিচালিত হইতেছ অথবা উভয়েব দ্বারাই? এইটি (প্রথম) বিকল্প। যদি একটি মাত্রের দ্বারা পরিচালিত হইতেছ মনে কর, তবে সেটি শুভ না অশুভ?—এইটি (দ্বিতীয়) বিকল্প (তাৎপর্য্য হইতে পাওয়া যাইতেছে)।

বাসনৌঘেন শুদ্ধেন তত্র চেদপনীয়সে।*
তৎক্রমেণাশু তেনৈব পদং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৯।২৬॥

তত্র—সেই (প্রথম) পক্ষে। যদি প্রথম পক্ষই ধর অর্থাৎ কেবল শুভ বাসনা দ্বারাই পরিচালিত হইতেছ মনে কর, তবে কেবল সেই আচরণের দ্বারাই সনাতন পদ অচিরে প্রাপ্ত হইবে।

সেই আচরণের দ্বারাই—অর্থাৎ বাসনা-প্রবর্ত্তিত আচরণের দ্বারাই অর্থাৎ অন্য প্রকার প্রযত্ন ব্যতিরেকেও। সনাতন পদ অর্থাৎ মোক্ষ।

---

* পাঠান্তর—"চেদন্যনীয়সে।" "তৎক্রমেণ শুভেনৈব।"

অথ চেদশুভো ভাবস্ত্বাং যোজয়তি সংকটে।
প্রাক্তনস্তদসৌ যত্নাজ্জেতব্যো ভবতা স্বয়ং (১) ॥ ৯।৫ ॥

ভাবঃ—বাসনা। আর যদি মনে কর অশুভ বাসনাই তোমাকে বিপদে নিপাতিত করিতেছে, তাহা হইলে তোমাকে নিজেই যত্নের দ্বারা সেই পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলকে পরাভূত করিতে হইবে।

তাহা হইলে · যত্নের দ্বারা—অর্থাৎ অশুভের বিরোধী শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা।

নিজেই পরাভূত করিতে হইবে--অর্থাৎ যুদ্ধে যেমন অধীনস্থ সৈনিকাদি অন্যপুরুষের দ্বারা শত্রুকে পরাভূত করা যাইতে পারে এখানে সেইরূপ অন্য পুরুষ দ্বারা পরাভব করা চলিবে না।

শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনাসরিৎ।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি ॥ ৯।৩৭ ॥

বাসনারূপ নদী শুভ ও অশুভ এই উভয় প্রকারের মার্গ দ্বারাই প্রবাহিত হয়। তাহাকে পুরুষের স্বকীয় চেষ্টার দ্বারা শুভ পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

যদি শুভ ও অশুভ এই উভয় প্রকারেরই বাসনা থাকে, তবে (বাসনার) শুভ অংশ সম্বন্ধে কোন প্রকার চেষ্টার অপেক্ষা না থাকিলেও অশুভ অংশের বাসনাকে শাস্ত্রবিহিত চেষ্টার দ্বারা নিবারণ করিয়া তাহার স্থানে শুভ বাসনানুযায়ী আচরণ করিতে হইবে।

অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষ্বেবাবতারয়।
স্বং মনঃ পুরুষার্থেন বলেন বলিনাং বর ॥ ৯।৩১ ॥

বলেন—প্রবল (পুরুষার্থের দ্বারা)। হে বীরশ্রেষ্ঠ, তোমার মন যদি অশুভ বিষয়ে রত হয়, তবে প্রবল পৌরুষ সহকারে তাহাকে শুভ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত কর।

অশুভ বিষয়ে—পরস্ত্রী, পরদ্রব্য প্রভৃতিতে।

শুভ বিষয়ে—শাস্ত্রার্থ চিন্তা, দেবতা ধ্যান প্রভৃতিতে।

পৌরুষ—অর্থাৎ পুরুষপ্রযত্ন।

---

(১) পাঠান্তর—'ভবতা বলাৎ'।

অশুভাচ্চালিতং যাতি শুভং তস্মাদপীতরৎ।

জন্তোশ্চিত্তং তু শিশুবত্তস্মাত্তচ্চালয়েদ্বলাৎ ॥ ৯।৩২ ॥

জীবের চিত্ত অশুভ বিষয় হইতে চালিত হইলে, তাহা হইতে পরিশেষে শুভ বিষয়ে গমন করিয়া থাকে। সেইহেতু (লোকে) যেমন শিশুকে চালিত করিয়া থাকে সেইরূপ চিত্তকেও বলপূর্ব্বক চালিত করিবে।

যেমন লোকে শিশুকে মৃত্তিকা ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ফল ভক্ষণে প্রবৃত্ত করে, মণিমুক্তার আকর্ষণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া খেলার বস্তু বর্ত্তুলাদি ধরিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত করে, সেইরূপ সৎসঙ্গের দ্বারা চিত্তকেও অসৎসঙ্গ হইতে এবং (সৎসঙ্গের) বিরোধী বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে।

সমতাসান্ত্বনেনাশু ন দ্রাগিতি শনৈঃ শনৈঃ।

পৌরুষেণ (১) প্রযত্নেন লালয়েচ্চিত্তবালকম্ ॥৯।৩৩॥

(রাগাদি বৈষম্য পরিত্যাগ করাইয়া চিত্তের স্বাভাবিক) সমতা সম্পাদন দ্বারা, চিত্তকে নির্দ্দোষ করিলে শীঘ্র বশে আনিতে পারিবে। যেমন সান্ত্বনা দ্বারা বালককে শীঘ্র বশে আনিতে পারা যায় সেইরূপ। কিন্তু পৌরুষপ্রযত্নসাধ্য হঠযোগ দ্বারা তাহাকে শীঘ্র বশে আনিতে পারিবে না, কিন্তু সেই উপায়ে চিত্ত অল্পে অল্পে বশে আইসে।

কোন চপল পশুকে বন্ধন স্থানে প্রবেশ করাইবার দুইটী উপায় আছে। তাহাকে হরিদ্বর্ণ তৃণাদি দেখান, গাত্র চুলকাইয়া দেওয়া প্রভৃতি এক প্রকার উপায়, আর কঠোর বাক্য প্রয়োগ, দণ্ডাদির দ্বারা তাড়না প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রকারের উপায়। তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত উপায় দ্বারা একেবারেই প্রবেশ করান যায়, শেষোক্ত উপায় প্রয়োগ করিলে পশুটি ইতস্ততঃ দৌড়িতে থাকে, পরিশেষে তাহাকে প্রবেশ করান যায়। সেইরূপ চিত্তকে শান্ত করিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথম উপায় তাহাকে শত্রুমিত্রাদিকে সমান জ্ঞান করিতে শিখান—তদ্দ্বারা বিনা ক্লেশে চিত্তকে বুঝান যায়। দ্বিতীয় উপায়—প্রাণায়াম, প্রত্যাহার

(১) পাঠান্তর—"পৌরুষেণৈব যত্নেন পালয়েৎ"।

ইত্যাদির অভ্যাস, তাহা পুরুষ-প্রযত্ন-সাধ্য। তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত অক্লেশকর যোগ দ্বারা চিত্তকে শীঘ্র আয়ত্তাধীন করিতে পারা যায়। শেষোক্ত হঠযোগের দ্বারা চিত্তকে শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারিবে না, কিন্তু তদ্দ্বারা অল্পে অল্পে (বিলম্বে) বশে আসিবে।

দ্রাগভ্যাসবশাদ্যাতি (১) যদা তে বাসনোদয়ম্।
তদাভ্যাসস্য সাফল্যং বিদ্ধি ত্বমরিমর্দ্দন ॥৯৩৫॥

হে শত্রুদমন, যখন অভ্যাসবশতঃ অনতিবিলম্বে শুভবাসনার উদয় হইবে, তখন বুঝিবে তোমার অভ্যাস সফল হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত সহজসাধ্য যোগাভ্যাসবশতঃ যখন তোমার অনতি-বিলম্বে শুভবাসনা উদিত হইবে তখন তোমার অভ্যাস সফলতা লাভ করিয়াছে বলিতে হইবে। এত অল্পকালে ফলোদয় হওয়া অসম্ভব, এরূপ আশঙ্কা করিও না।

সন্দিগ্ধায়ামপি ভৃশং শুভামেব সমাচর।
শুভায়াং বাসনাবৃদ্ধৌ তাত দোষো ন কশ্চন ॥(২)৯।৩৮॥

শুভ বাসনার অভ্যাস পূর্ণ হইয়াছে কিনা সন্দেহ উপস্থিত হইলে শুভবাসনাই অধিকতর সংগ্রহ করিবে। হে তাত, শুভবাসনার বৃদ্ধি হইলে কোনও দোষ নাই। শুভ বাসনা অভ্যাস করিতে করিতে তাহা সম্পূর্ণ হইল কিনা, সন্দেহ উপস্থিত হইলে তখনও শুভবাসনা অভ্যাস করিতে থাকিবে। যেমন কোন ব্যক্তি সহস্র সংখ্যক জপে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার শেষ শত সংখ্যক জপ সম্বন্ধে যদি (করিয়াছি কিনা) বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে সে ব্যক্তি আবার একশত জপ করিবে। যদি তাহার জপ বাস্তবিকই অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ফলে সম্পূর্ণতা লাভ হইবে, আর যদি (পূর্ব্বেই) সম্পূর্ণতা লাভ হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই অধিক জপ বশতঃ সহস্রজপে কোন দোষ ঘটিবে না সেইরূপ।

অব্যুৎপন্নমনা যাবদ্ভবানজ্ঞাততৎপদঃ।
গুরুশাস্ত্রপ্রমাণৈস্তু নির্ণীতং তাবদাচর ॥

(১) পাঠান্তর—"প্রাগভ্যাসবশাদ্যাতা"।
(২) পাঠান্তর—"অভ্যাত্তবাসনাবৃদ্ধৌ শুভাদ্দোষো ন কশ্চন"।

ততঃ পক্ককষায়েণ নূনং বিজ্ঞাতবস্তুনা।
শুভোঽপ্যসৌ ত্বয়া ত্যাজ্যো বাসনৌঘো নিরোধিনা ॥*

যতদিন পর্য্যন্ত না তোমার মন ব্রহ্মাত্মৈক্য বিচারে প্রবীণতা লাভ করে এবং তুমি সেই (পরম) অবস্থা—অদ্বৈতাত্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পার, ততদিন তুমি গুরু, শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা যাহা কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান কর। তাহার পর তোমার রাগদ্বেষাদি বাসনাকষায় পরিপক্ক হইয়া বিনাশোন্মুখ হইলে এবং তুমি অদ্বৈততত্ত্ব অপরোক্ষভাবে অনুভব করিতে পারিলে, চিত্তনিরোধাভ্যাসী হইয়া এই শুভবাসনা সমূহও পরিত্যাগ করিবে।

যদাতস্নুভগমার্য্যসেবিতং তচ্ছুভমনুসৃত্য মনোজ্ঞভাববুদ্ধ্যা।
অধিগময় পদং যদদ্বিতীয়ং† তদনু তদপ্যবমুচ্য সাধুতিষ্ঠ ইতি ॥৯।৪৩

তুমি শুভবাসনাসম্পন্ন বুদ্ধি দ্বারা সেই আর্য্যগণসেবিত অতিসুন্দর কল্যাণকর পথের অনুসরণ করিয়া, সেই অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ কর, তদনন্তর তাহাও পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থান কর।

শ্লোকত্রয়ের অর্থ সুগম। টীকা নিষ্প্রয়োজন। সেইহেতু যোগাভ্যাস দ্বারা কামাদির দমন সম্ভবপর বলিয়া জীবন্মুক্তি বিষয়ে আর বিবাদ করা চলে না।

ইতি জীবন্মুক্তি-স্বরূপ।

---

* পাঠান্তর—নিরাধিনা—"কর্ত্তব্যতারূপমানসীব্যথাহীনেন"

† পাঠান্তর—পদং সদাবিশোকং।

আত্মসমর্পণ।

(স্বামী পরমানন্দ)

প্রকৃত ভক্ত অন্তরে সর্ব্বদাই ভগবৎ শক্তির প্রেরণা অনুভব করে থাকেন। নতুবা তিনি ভক্তই নন। ঐশীশক্তিকে ত্যাগ করে প্রকৃত ভক্ত নিজে স্বাধীন হ'তে চান না। তিনি জানেন মাই তাঁর নিজের কাজ কর্‌ছেন, উহাতে তাঁর নিজের কোন নিন্দা বা স্তুতির অধিকার নাই। যতক্ষণ আমরা তাঁকে না ভুলি ততক্ষণ সব ঠিক থাকে। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে আমরা তাঁকে ভুলে যাই। অহঙ্কারই আমাদের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। সুতরাং যুদ্ধ করে ওটাকে বিনাশ কর্‌তে হবে। এস আমরা তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ হ'য়ে যাতে তাঁর সন্তানদের একটু আধটু সেবা কর্‌তে পারি তজ্জন্য একান্তমনে প্রার্থনা করি। নচেৎ এজীবনের আর মূল্য কি? পবিত্রভাবে জীবন যাপন করে তাঁর সন্তানদের যতদূর সম্ভব সেবা কত্তে চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য—উহাতেই আমাদের অধিকার।

সময়ে সময়ে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা এতই কঠোর হয়ে ওঠে যে মনে হয় যেন উহা হইতে মুক্ত হবার বুঝি গত্যন্তর নাই। কিন্তু এ জগতে কিছুই স্থায়ী নয়। মেঘ অপসারিত হয় আবার জীবনে আশার সঞ্চার হয়। সুতরাং আমাদিগকে সর্ব্বাবস্থাতেই হিমাদ্রিবৎ অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান থাক্‌তে হবে। জগৎ যাক্ আর থাক্ তাতে কি? আমাদিগকে অচল অটল থাক্‌তে হবে। সাহস অবলম্বন কর, সত্যের সম্মুখীন হও।

যদি তোমার কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শ থাকে তবে তাই লাভ কর্‌তে জীবন অতিবাহিত কর। সত্যের জন্য—আদর্শের জন্য আমাদিগকে জীবন উৎসর্গ কর্‌তে হবে। ইহাই ঈশ্বর সেবার একমাত্র উপায়। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। দুর্ব্বলতা, কপটতা দ্বারা তাঁর সেবা করা যায় না। একমাত্র অকপট ভালবাসা ও বীর্য্যের দ্বারাই তাঁর সেবা করা যায়।

এগিয়ে পড়। কার কি হচ্চে দেখ্‌বার জন্য পেছু ফিরো না। আমার মত শত সহস্র এই মুহূর্তে মরতে পারে কিন্তু তদ্দ্বারা জগতের কোনই ক্ষতি হবে না। সত্যের বিনাশ নাই; ইহা চিরদিনই তাহার প্রভা বিকাশ করতে থাক্‌বে। সত্যের সেবা কর—সত্যের জন্য মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন কর। মনে রেখো বর্ত্তমান জীবন প্রাক্তন চিন্তা ও কর্ম্মের ফলস্বরূপ এবং এইরূপে ভবিষ্যৎ জীবন ও বর্ত্তমানের চিন্তা ও কর্ম্মরাশির উপর নির্ভর কর্‌ছে। অতএব বেশ বুঝা গেল, আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই উপর নির্ভর কর্‌ছে। প্রাক্তন বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্ম দ্বারা ধৌত হয়ে নাশ পাবে।

যা একবার ভগবৎচরণে নিবেদন করা হয়েছে তা আবার নিজসুখের জন্য ব্যবহার কর্‌বার অধিকার আমাদের নাই। যিনি ঈশ্বরের সেবায় নিজ দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করেছেন, তিনি নিজ ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয় ভাব্‌বেন না, বরং ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন কর্‌তে নিজ ইচ্ছাকেও বলি দিবেন। ইহাই প্রকৃত আত্মত্যাগ।

সকামভাবে ঈশ্বর উপাসনাকে কখন আত্মসমর্পণ বলা যায় না, কারণ, যদি কোনরূপে বাসনা চরিতার্থ না হয় তবেই আমরা উপাসনা ত্যাগ করে দিই। বরং এ অতি ঘৃণিত স্বার্থপরতা। এই অনার্য্যজুষ্ট দুর্ব্বলতাকে ত্যাগ কর্‌বার জন্য মানবের সাহস ও দৃঢ়তা অবলম্বন করা আবশ্যক।

ত্যাগমার্গ বড়ই দুর্গম। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বড়ই শক্ত কিন্তু ইহা ব্যতীত আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব। শিষ্যের গুরুর আজ্ঞায় বিনা প্রশ্নে কামানের বা বাঘের মুখে যেতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। ইহাই প্রকৃত ভক্তি।

আর এক বস্তু চাই—সাংসারিক সমস্ত বস্তুতে আসক্তিশূন্যতা। মন থেকে কাম কাঞ্চন মুছে ফেলে দিতে হবে।

"শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥"

এইটী প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে চেষ্টা কর, তাহলেই তুমি মুক্তিলাভ করবে। অহঙ্কারকে ধ্বংস কর আর বল "তৃণাদপি সুনীচেন"। তা হলেই সমস্ত অপবিত্রতা বিগত হবে, আর তুমি ঐশীভাবাপন্ন হবে। তখনই তুমি ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করবার অধিকারী হবে। অহঙ্কার আমাদের ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রাচীর স্বরূপ অবস্থান করছে সুতরাং ইহাকে ধ্বংস কর ও দৃঢ়স্বরে বল "নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ"। প্রকৃত শক্তি বিকাশ করে দুর্ব্বলতাকে নাশ কর। মনে রেখো—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

তবে এস, আমরা আমাদের দুর্ব্বলতাকে জয় করি। আমাদের দুর্ব্বলতা দেখলে লোকে সুবিধা পেয়ে বসে। কেমন করে নিজেদের মর্য্যাদা রাখতে হয়, বিশেষতঃ যখন আমরা এই জগতের লোকের মাঝে থাকি, আমাদিগকে তাই শিখতে হবে। দুষ্টলোকদের নিকট হতে নিজেদের রক্ষা করতে ফোঁস করতে হবে কিন্তু কখনও প্রকৃত কোন অনিষ্ট করা হবে না। যে মুহূর্ত্তে আমরা অপরের ক্ষতি করতে চেষ্টা করি সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পতন হয়। আমরা অনিষ্টকারীদের দলভুক্ত হয়ে পড়ি এবং এইরূপে আমরা নিজেদেরই ক্ষতি করে বসি। আমাদের আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করতে আমাদের সময়ে সময়ে ফোঁস্ করতে হবে। তা বলে অপরের যাতে প্রকৃত ক্ষতি হয়, এমন প্রবৃত্তি যাতে না জাগে তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে, বিশেষভাবে তারই দিকে।

গিরিসদৃশ অটল বিশ্বাসসম্পন্ন হও। বিশ্বজননী তোমার হাত ধরুন। আমরা তাঁর হাত ধরলে হাতছেড়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু তিনি ধরলে আর তার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মার ঐশীইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে আমাদিগকে সমস্ত বিষয় থেকে মুক্ত হতে হবে। মা ছাড়া অন্য কাকেও তোমার পবিত্র হৃদয় অধিকার কর্ত্তে দিও না, বোকার মত চিন্তা, ভয় বা উদ্বেগ দ্বারা বিষণ্ণ হয়ো না। মনে রেখো তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁর উপর একান্ত বিশ্বাস রেখে মুক্ত হয়ে যাও।

সবেতে তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হউক সবই ঠিক থাকবে। কেন বা কি

জন্য এ প্রশ্ন না করে ধীর ও শান্তভাবে তাঁকেই মেনে যেতে হবে। দুঃখ আসে, মার দান ব'লে তাকে আলিঙ্গন কর। কে জানে কেমন করে তিনি আমাদের চরিত্র গঠন কর্‌বেন? সাংসারিকতা ও পবিত্রতা দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, এই কথাটী মনে রাখা চাই। একটী যদি উত্তরে যায়, অপরটী নিশ্চয়ই দক্ষিণে যাবে।

আমাদের প্রতিকার্য্যেই সাহসী, বীর্য্যবান্ ও নির্ভীক হ'তে হবে। দুঃখ আস্‌লে বল্‌তে হবে "বেশ, এস" ও বীরের ন্যায় প্রশান্তভাবে দাঁড়াতে হবে। তৎক্ষণাৎ তারা নিশ্চয়ই তোমার কাছ থেকে ভয়ে পালাবে। তাদিগকে জয় কর্‌বার এই হচ্চে প্রকৃত উপায়। সাহসী ও নির্ভীক হও। একটা সাহসের কথায় অনন্ত শক্তি এনে দেয় সুতরাং মনকে সদাই সাহসী ও উৎফুল্ল রাখ।

ভগবানের জন্য সর্ব্বদা সুখী, সবল ও সানন্দচিত্তে অবস্থান করা, প্রকৃতই মহান্ নিঃস্বার্থ কর্ম্ম। এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে কাজ কর্‌তে কর্‌তে প্রতিদিন তোমার পবিত্রতা ও শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হবে। কিন্তু এইরূপ কর্ম্ম সর্ব্বদা তাঁকে স্মরণ ও তাঁর নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা ব্যতীত হয় না। মা স্বার্থশূন্য অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা কখনও অপূর্ণ রাখেন না। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর্‌বেন ও শক্তি প্রদানে কৃপণতা কর্‌বেন না। তিনি নিশ্চয়ই তোমায় ঠিক পথে পরিচালিত কর্‌বেন। তুমি মনপ্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা কর্‌ছ আর তিনি কি তোমায় অসুখী কর্‌তে পারেন? কখনই তাহা করেন না। করুণাসিন্ধু তিনি—তিনি কি তাঁর ছেলেকে অসুখী কর্‌তে পারেন? দুঃখ আসে ভয় করো না, নিশ্চয়ই তিনি তোমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কর্‌বেন ও তোমার দুঃখের অংশ গ্রহণ কর্‌বেন।

তুমি বল্‌বে, তবে কেন প্রায়ই আমাদের প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে? আমরা তার কিছুই জানি না। জানি মাত্র, আমরা তাঁর সন্তান। এর বেশী জান্‌বার ইচ্ছা করা আমাদের উচিত নয়। জগজ্জননী মা সবই জানেন। জগৎ তাঁর, তিনি তাঁর সন্তানদের যত্ন

কর্‌বেন। আমাদের কেবল ভাবা উচিত—"আমরা তাঁর নির্ব্বোধ সন্তান, তাঁর সন্তানদের ভৃত্য মাত্র।" নিঃস্বার্থভাবে তাঁর সন্তানদের সেবা করাতেও একটা আনন্দ আছে। সুতরাং এস আমরা তাঁদের সেবায় নিযুক্ত থাকি। কিন্তু এতেও বিশেষ গোল আছে, কারণ, আমরা প্রকৃত সেবা কিসে হয় সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মূর্খতাবশতঃ আমরা যাদের সেবা কর্‌তে চাই তাদেরই অনিষ্ট করে বসি। ঠিক ধারণাশক্তি না থাক্‌লে জীবনধারণ বড় কষ্টকর হয়ে ওঠে। তবু তাঁরই উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তে হবে। যদিও সময়ে সময়ে আমাদের হৃদয়াকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবু আমাদিগকে ধীর ও শান্তভাবে অবস্থান কর্‌তে হবে। ভয়শূন্য মনে দৃঢ়তার সহিত আমাদিগকে অগ্রসর হতে হবে। ফলের জন্য চিন্তা কি? মনে রেখো সৎকর্ম্মের দ্বারা মঙ্গলই হয়। বাহ্যতঃ অন্যরূপ দেখালেও উহাতে মঙ্গল ভিন্ন অন্য কিছুই হতে পারে না এবং সৎপথই একমাত্র অবলম্বনীয়।

আমরা সকলেই তাঁর ঐশীশক্তিতে পরিচালিত। এস, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁরই উপর নির্ভর করি ও প্রাণ খুলে বলি "মা তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক্"। এসব মনে রেখেও সময়ে সময়ে আমাদের মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় বটে কিন্তু ওকে দূর কর্‌তেই হবে। নির্ভীক ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন কর্‌তে হবে। চরিত্র-বল মহৎ বস্তু। সুতরাং নির্ভীকভাবে সমস্ত বাধা বিপত্তিরই সম্মুখীন হতে হবে। ভয় কাকে? বিশ্বজননীর সন্তান আমরা! জগৎই মার, তবে ভয় কাকে? এইরূপ প্রাণপ্রদ বিশ্বাস চাই।

জীবন, শক্তি, পবিত্রতা নিঃস্বার্থ ভালবাসা যা কিছু আছে সবগুলিরই বিকাশ কর। এ সকলে তোমার জন্মগত সত্ব আছে। এগিয়ে পড়। সাহসে ভর ক'রে এগিয়ে পড়। মৃত্যু তোমার নাই। অমৃতের পুত্র তুমি। সমস্ত অপবিত্রতা, সমস্ত কুসংস্কার ত্যাগ কর। তুমি কি জাননা যে তুমি মুক্ত, তোমার কোন বন্ধনই নাই, তুমি সব পাশ থেকে মুক্ত, তুমি শুদ্ধ, তুমি বুদ্ধ।

হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, নাম, যশ এসব ত কেবল কুসংস্কার মাত্র। তাদের সহিত তোমার সম্বন্ধ কি? ওগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে জ্ঞান-সমুদ্রে ডুবিয়ে দাও। এটা খুব তাড়াতাড়ি করে ফেল। প্রাণে প্রাণে বোঝ তুমি মুক্ত। তুমি মুক্ত। যেখানেই যাও তুমি মুক্ত। ভয় কি? মূর্খ লোকগুলো যা বকে বকুক, তাদিকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখ, তারা কূপমণ্ডূকই থাকুক্। এগিয়ে পড় পিছন ফির না। তারা যা বলে বলুক, যা করে করুক্, কিছুই বল—দরকার নাই। ধীর দৃঢ়ভাবে এগিয়ে পড়, আর মুক্তকণ্ঠে বল্‌বার

"সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
(আবার) কারে দাও মা ব্রহ্মপদ কারে কর অধোগামী।
আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী আমরা তোমার তন্ত্রে চলি।
যেমন বলাও তেমনি বলি মা যেমন করাও তেমনি করি॥"

"মা তোমারই ইচ্ছায় সব হয়। আমি কিছু নই মা, আমি কিছু নই।"

ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান দৃঢ় হলেই মানব মুক্ত হয়ে যায়। অহঙ্কারই ধ্বংসের বীজ। ইহার মত শত্রু মানুষের আর নাই। ওটাকে দলে দাও, দলে দাও, চিরতরে মেরে ফেল। তবে জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হবে। একবার ভাব তুমি কে? তুমি কেন ঝগড়া করে মর। তুমি যে সেই বিশ্বপতির সন্তান। তুমি নাম, যশ, নিন্দাস্তুতি সুখদুঃখের বাইরে। তুমি ওসব থেকে মুক্ত। মূর্খেরাই কেবল বড় হতে চায়; অপরের নিকট হতে নাম যশ চায় ও তা না পেলেই অসুখী হয়। কি মূর্খ! এই ক্ষণিক বস্তু নিয়ে কি হবে? এ জগতে আবার সত্য কি আছে? আমাদের সদসৎ বিচার কর্‌তেই হইবে। দাসভাবে জীবন যাপন করে সুখ কি? কেন প্রবৃত্তির দাস হব? তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে তাদিগকে বরং দাস কর্‌বো। তাদিগকে জয় কর্ত্তেই হবে। আমাদের যথেষ্ট

কাজ কর্‌বার্‌ রয়েছে। এ কাজটা কঠিন কিন্তু সর্ব্বাগ্রে এটা কর্ত্তেই হবে। যদি মুক্ত হতে চাও তবে এটা কর্ত্তেই হবে। যদি ভয় করে এ কাজ না কর বা কর্‌তে চেষ্টা না কর তবে অনন্তকালেও জন্মমৃত্যু ও কষ্টের হাত হ'তে এড়াতে পার্‌বে না। ঈশ্বরের কৃপায় রাস্তা খোলা আছে। দৃঢ়তার সহিত নির্ভীকভাবে সানন্দচিত্তে এগিয়ে যাও। একটা ভার বহন করা শক্ত বটে কিন্তু যিনি ভারটী সরিয়ে দেন তাঁর পক্ষে উহা আরও কঠিন। সুতরাং কেমন করে তাঁর ঋণ মানুষ শুধ্‌বে? পবিত্র, অপ্রাকৃতভাবে তাঁর কথামত জীবন যাপন কর্‌লেই কেবল সে ঋণ কতক শোধ করা যায়। আর অন্য কোন রাস্তা নেই। শারীরিক সাহায্য বা সেবায় কি হয়?

সকল রকম কুড়েমি ত্যাগ কর, করে এগিয়ে পড়। মনে রেখ, তুমি দেহ নও, জড় নও। তুমি চৈতন্যস্বরূপ—নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, আত্মা। এই আদর্শ সর্ব্বদা সম্মুখে রাখ, তাহ'লে কোন কিছুতেই তোমার শান্তিভঙ্গ কর্‌তে সমর্থ হবে না।

মা তোমায় রক্ষা কর্‌বেন। তাঁর কৃপা ব্যতীত কেহই কোন সৎকর্ম্ম কর্‌তে সমর্থ হয় না। এ কথাটা যেন আমরা না ভুলি। তাহ'লেই আমরা নিরাপদ্‌। যাকে ভুলেই মানুষ বিপদে পড়ে এবং জাগতিক বস্তুবিশেষকে সত্য ও প্রকৃত মনে করে তৎপ্রতি ধাবিত হয়। তাঁরই কৃপায় হাজার বছরের অন্ধকার এক মুহূর্ত্তে ঘুচে যায় ও জাগতিক সুখ তুচ্ছ বলে বোধ হয়। তবে এস আমরা যাবজ্জীবন কি সুখে কি দুঃখে সব সময়ে তাঁরই গৌরব গাথা গাইতে থাকি। এস তবে তাঁরই চিন্তায় নিমগ্ন হই। তাঁরই স্বর্গীয় প্রেমে পাগল হই। সংসার এখনই মন থেকে স্বভাবতঃই খসে পড়্‌বে। মানবীয় হিংসা, দ্বেষ, ভালবাসা, ঘৃণা, নাম, যশ, নিন্দা, স্তুতি এসবে কি এসে যায়? এস আমরা এ সব ভুলে গিয়ে একান্তমনে আমাদের সমস্ত ভক্তি ও ভালবাসা দিয়ে মা'র সেবা করি।

আমরা মা'র প্রিয় পুত্র। তিনি কখন তাঁর মাতৃ-ভালবাসা দানে কৃপণতা কর্‌তে পার্‌বেন না। নিশ্চয়ই তিনি আমাদিগকে

সুখ ও শান্তি দান করবেন। সুখদুঃখরূপ তরঙ্গ আসবে ও যাবে। তারা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের প্রকৃষ্ট উপাদান। দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হও। জগৎ থাক্ আর যাক্ তাতে তোমার আমার কি? হিমাদ্রিবৎ অটলভাবে দাঁড়াও। নিজের আদর্শের উপর স্থির বিশ্বাস রাখ। বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ দ্বারাই কেবল মানব সত্যের অনুভূতিলাভ করতে সমর্থ হয়। বৃথা তর্কে বা বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনায় সত্যলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মানুষের শত্রুতা মিত্রতায় কি হয়? তারা কি করতে পারে? মা'ই সব করেন। তিনি সব। তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। প্রতিমুহূর্ত মায়ের সেবায় নিযুক্ত কর। আর যা কিছু কর—ভালই হউক আর মন্দই হউক—সব মিথ্যা, সব মায়া, সব অজ্ঞানতা, সব ভস্মে ঘৃতাহুতিমাত্র! সত্য এক এবং মাই সেই একমাত্র সত্য। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এ সমস্তের তিনিই একমাত্র কারণ। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত জগতে কোন কিছুই সম্ভবে না। তিনি আমাদের মা। তিনিই জগতের মা। মার নিকট থাকলে কোন কিছুতেই আমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না। বিশ্বাস চাই, শক্তি চাই, সাহস চাই। মনে রেখ, মার ইচ্ছা হলে সব সম্ভব হতে পারে। মূকও বাচাল হতে পারে, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে। মার শ্রীচরণে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন ত্রিজগতে কেহই তাঁর অনিষ্ট করতে পারে না। তিনিই একমাত্র ভয়শূন্য।

সরলভাবে, একান্ত মনে মার চরণে আশ্রয় লও। ভয়, ভাবনা কিছুই তিষ্ঠুতে পারবে না। তবে বল, প্রাণভরে বল, "জয় মা আনন্দময়ী।" আবার বল, জোর ক'রে বল "জয় মা আনন্দময়ী।" সব অমঙ্গল সত্বই নাশ পাবে। তিনিই কেবল একমাত্র অমঙ্গল নাশ করতে সক্ষম। তিনিই একমাত্র তাঁর নিরীহ তদ্গতপ্রাণ সন্তানদের রক্ষক। আর বলবার রইল কি? মার গৌরবগাথা ছাড়া সবই মিছে। মাই আমাদের উৎপত্তি ও স্থিতির একমাত্র কারণ। তিনিই শাশ্বত সুখ ও শান্তির আধারস্বরূপ।

তবে এস আমরা শান্তিতে মার ক্রোড়ে ঘুমাই। ছেলেদের কেমন করে আদর যত্ন কর্ত্তে হয় মাই সব চেয়ে ভাল জানেন। ঠাকুর বলতেন—'মা যখন ছেলের হাত ধরে থাকেন বা যতক্ষণ ছেলে মার কোলে থাকে ততক্ষণ তার পতন সম্ভাবনা কোথায়?' তিনিই সব। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং। মায়ের শ্রীচরণ পূজা যদি না করব তবে আর কার পূজা করবো? যাক্! অন্য সব চিন্তাই আমাদের মন থেকে দূর হয়ে যাক্। তবে আর অমঙ্গল কোথা থাকবে? হৃদয়ের সব স্তবগুলি মাতৃভাবে পূর্ণ হলে চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়, ভ্রান্তি আর কোথায় থাকবে?

তোমরা সকলেই সেই মধুর গানটী জান—"ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।" এইরূপ ব্যক্তির নিকট ধর্ম্মকর্ম্ম তুচ্ছ। তিনি পাপনাশ করিবার জন্য তীর্থে গমন করেন না—মা'র নাম ছাড়া অন্য কোন কিছু শুনিতে চান না। চান কেবল সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা মার নাম গান শুনিতে, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই বিশ্বাস করেন না। করেন কেবল যাতে মঙ্গলময়ীর ইচ্ছার অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে যিনি সংসার ভুলে গিয়ে কেবল মার চরণকেই সার করেছেন, তিনিই কেবল মৃত্যুসংসারসাগর উত্তীর্ণ হতে সমর্থ। তাঁর কোন ভয় থাকে না। তিনি কারো নিন্দাস্তুতি গ্রাহ্য করেন না, সর্ব্বদা মাতৃনামরূপ অমৃতাসব পানে মত্ত থাকেন।

মাই একমাত্র গতি। মাই একমাত্র শান্তি বিশ্রামের নিলয়। তাঁরই নিকট প্রার্থনা কর এবং তাঁরই চিন্তায় নিমগ্ন হও। তিনিই একমাত্র প্রকৃত আশ্রয়। তিনিই সকল সুখ ও শান্তির মূলীভূত কারণ। তবে এস আমরা মার প্রেমসমুদ্রে ডুবে যাই! এস আমরা তাঁরই ভালবাসায় মত্ত হই। সংসার মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হবে। যা কিছু তাঁর উপযুক্ত নয় সব অপসৃত হবে। তবে বল প্রাণ ভরে বল—"জয় মা আনন্দময়ী।" তাঁর আগমনে সকল ভয় ভ্রান্তি দূর হবে—সমস্তই শান্তিময় হয়ে যাবে।

বালকের ন্যায় সরলভাবে প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি তোমায় রক্ষা করবেন। আমরা সকলে তাঁরই ছেলে। কেন কাউকে আমরা ভয় করবো? মা আমাদের রক্ষা করবেন। জগতের শত গোলমালে মাকে বিস্মৃত না হওয়াই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় "মার পূজা কর," একথা ছাড়া তোমাদিগকে আর কি বল্‌ব! ইহাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহা অপেক্ষা উচ্চ ও মহত্তর কর্ম্ম কিছুই নাই।

বল,—"মা আমায় তোমার চরণে প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত ভক্তি দাও। আমি আর কিছুই চাই না মা। ধন চাই না—মান, যশ কিছুই চাই না—ধর্ম্ম চাই না—অধর্ম্ম চাই না। তুমি সব নাও। আমায় তোমার চরণে শুদ্ধা ভক্তি দাও। আমার জ্ঞান নাও, অজ্ঞান নাও, কেবল শুদ্ধাভক্তি দাও। আমার সুখ নাও, দুঃখ নাও, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।"

দিনরাত এইরূপে প্রার্থনা কর—প্রকৃত প্রেম ভক্তির জন্য কাঁদ। ইহাই ঠিক ঠিক পূজা বা সাধনা। এই সাধনে নিমগ্ন হও; সংসার আপনা হতে পালাবে, আর তুমি আনন্দ ও শান্তিসাগরে ভাসতে থাকবে।

ভুলোনা, জগতের যত কিছু সবই তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। তাঁর মহিমা কে বুঝে? কে তাঁর মহিমা বর্ণন করতে সমর্থ? [চণ্ডীতে কি আছে দেখ,—

"যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্‌বস্তু সদসদ্‌বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিংস্তূয়সে তদা॥
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥
বিষ্ণুঃশরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥"]

তবে আর কেন, অহংকার ত্যাগ কর, দীনকণ্ঠে বল—

"নাহং নাহং, তুঁহু, তুঁহু।" মা আমি নই মা! তুমিই সব। মা, তোমার রাতুল চরণে শুদ্ধাভক্তি দাও। যেন কখনও তোমায় ভুলে না যাই। মা, তোমার অমৃতময়ী নামে আমার প্রগাঢ় অনুরাগ ও বিশ্বাস দাও মা। আমি এখানে থাকতে চাই না। আমায় কোলে তুলে নে মা। মা, ঘর বাড়ী আশ্রয় সবই আমার তুমি। তোমার কাছে আমায় যেতে দাও। তোমার কাজ হবেই। তবে এইমাত্র কর, যেন আমি নিঃস্বার্থ পবিত্রভাবে তোমার কাজ করতে পারি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। বল দাও মা, জ্ঞান দাও মা, যেন আমরা মনমুখ এক করে বলতে পারি, "তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"*

বিষ্ণু-তত্ত্ব

(অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ)

বিষ্ণু বৈদিক দেবতা। সামান্য কয়েকটীমাত্র বচনে ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া বিষ্ণুকে যে ছোট দেবতা বলিয়া বুঝিতে হইবে তাহা নয়। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৭ সূক্তে কথিত আছে যে বিষ্ণু তাঁহার সুদীর্ঘ বিচক্রমণে ত্রিপদ দ্বারা সমগ্র জগৎকে পরিমাণ করিয়াছিলেন।

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।
সমূলহমস্য পাংসুরে ॥১৭॥

তাহার প্রথম দুইপদ মনুষ্য লাভ করিতে পারে ও জানিতে পারে—কিন্তু তাঁহার তৃতীয় পদ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। পক্ষিগণও ততদূর গমন করিতে পারে না। এই কথাই ঋগ্বেদ এইরূপভাবে উপদেশ করিয়াছেন—

---

* বোষ্টন বেদান্ত কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত স্বামী পরমানন্দের 'Path of Devotion' নামক পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।

যে ইদস্য ক্রমণেস্বর্দৃশোঽভিখ্যায় মর্ত্যোভুরণ্যতি।

তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চ ন পতয়ংতঃ পতত্রিণঃ।৫॥১।১৫৫।৫

যাঁহারা সূরী অর্থাৎ জ্ঞানী তাঁহারাই স্বর্গে সন্নিবিষ্ট চক্ষুর ন্যায় বিষ্ণুর "পরমপদ" দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।

দিবীব চক্ষুরাততম্।১।২২।২০

এই বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস বিদ্যমান, ইহাতে দেবগণ আনন্দ উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।

উরুক্রমস্য সহি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ।

১।১৫৪।৫

এই বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা ও সহায়ক।

বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।

ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা।১।২২।১৯

ঋগ্বেদের সংহিতাভাগে বিষ্ণুর স্থান বিশেষ সমুচ্চ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে ব্রাহ্মণভাগে বিষ্ণুর সমাদরের উপক্রম হইতে আরম্ভ হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগে বিষ্ণু পরম পুরুষের স্থান অধিকার করেন বিষ্ণু কেন এই শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হইলেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, জনগণ তাহার তৃতীয় পদ অর্থাৎ মানব জ্ঞানের অতীত পরমপদের প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে পরিশেষে বিষ্ণুকে এই শ্রেষ্ঠতম পদ প্রদান করেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন—

"অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্ব্বা অন্যা দেবাঃ।" ১।১

ঐ যে অগ্নি তিনি দেবগণের অবম (প্রথম), আর বিষ্ণু দেবগণের পরম (অন্তিম); অন্যদেব ইঁহাদের মধ্যে অবস্থিত।

শ্রুতিতে অগ্নিকে দেবতাগণের মুখস্বরূপ ও প্রথম এবং বিষ্ণুকে উত্তম অর্থাৎ অন্তিম বলা হইয়াছে।

"অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাং সঙ্গতানামুত্তমো বিষ্ণুরাসীৎ।"

অন্য দেবগণ অর্থে অগ্নিষ্টোমের অঙ্গীভূত শস্ত্র-প্রতিপাদ্য (শস্ত্র=গীতিরহিত ঋক্‌স্তুতি বিশেষ - আনন্দগিরি, তৈত্তি উপ, ১।৮) ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি প্রধান দেবতা কয়েকজনকে বুঝাইতেছে। অগ্নি ও বিষ্ণু তাঁহাদের আদিতে ও অন্তে রক্ষকবৎ বর্ত্তমান।

শতপথব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে একটী কাহিনীর উল্লেখ আছে। দেবতাগণ শ্রী, শৌর্য্য ও অন্নলাভের জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবগণ প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি তাঁহার নিজ ক্রিয়া দ্বারা অন্যান্য দেবের পূর্ব্বে যজ্ঞের চরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন তিনিই দেবগণের মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্থান লাভ করিবেন। বিষ্ণু অন্য সকলের পূর্ব্বেই তাহা লাভ করেন; সুতরাং তিনি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত হন এবং এইজন্যই বিষ্ণুকে দেবগণের শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে।

এই কাহিনীটী লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু বিষ্ণু "পরমপদ" লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার পরমপদ প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্যই এই কাহিনীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

আবার এই একই ব্রাহ্মণে বামনরূপী বিষ্ণুর কাহিনী আছে। এই কাহিনী উপদেশ করে যে, এক সময়ে সুর ও অসুরগণের মধ্যে যজ্ঞের স্থান লইয়া বিবাদ হয়। অসুরগণ বলেন যে, তাঁহারা সুরদিগকে বামন দেহের পরিমিত স্থান প্রদান করিতে স্বীকৃত আছেন। কাজেই বিষ্ণুকে শয়ন করিতে হইল। কিন্তু তিনি এরূপভাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলেন যে, তিনি সমস্ত পৃথিবী নিজ শরীর দ্বারা ব্যাপিয়া ফেলিলেন; সুতরাং দেবতারা সমস্ত পৃথিবীই প্রাপ্ত হইলেন। সুরগণের যজ্ঞানুষ্ঠানও সুসিদ্ধ হইল।

এই কাহিনীতে বিষ্ণুর প্রতি অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে যে তাঁহাকে পরম পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ বুঝায় না।

মৈত্রেয়ানী উপনিষদে ৬ষ্ঠ প্রপাঠকে (১৩) বিশ্বভৃৎ অন্নকে ভগবদ্ বিষ্ণুর তনু বলা হইয়াছে।

"বিশ্বভৃদ্ বৈ নামৈষা তনূর্ভগবতো বিষ্ণো যদিদমন্নম্।"

কঠোপনিষদে কিন্তু বিষ্ণুকে পরম পুরুষ বা ব্রহ্ম বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানসারথি ও মনঃগ্রহবান্ তিনিই পন্থার অপর পারে গমন করেন সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

"বিজ্ঞানসারথির্যস্ত মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।

সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৩য় বল্লী।৯।

ইহাতে মানবাত্মার গতি পর্য্যটনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মানব এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে পথের শেষে উপনীত হইলে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এই পরমপদই জীবের চরম লক্ষ্য—ইহাই তাহার অনন্ত সুখ-নিকেতন।

অতঃপর বিষ্ণুকে গৃহদেবতারূপেও পূজিত হইতে দেখা যায়। বিবাহের সপ্তপদী রীতিতে আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী ও পারস্করের গৃহ্য-সূত্রমতে কন্যা যখন চতুর্থপদ প্রক্ষেপ করে তখন বরকে বলিতে হয়, "বিষ্ণু তোমাকে নয়ন করুক", "বিষ্ণু তোমার সহিত অবস্থান করুক।"

রামায়ণ ও মহাভারত যুগে বিষ্ণু সর্ব্বথা ব্রহ্মপদবাচী হইয়াছিলেন। আর বাসুদেব ও বিষ্ণু অভিন্ন। ভীষ্মপর্ব্বের ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে ব্রহ্মকে নারায়ণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু ও বাসুদেব যে এক তাহাও বলা হইয়াছে।

আশ্বমেধ পর্ব্বের (অধ্যায় ৫৩-৫৫) অনুগীতাভাগে উল্লিখিত আছে যে, দ্বারকা প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভৃগুবংশীয় উতঙ্ক ঋষির সাক্ষাৎ হয়। শ্রীকৃষ্ণকে ঋষি জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কুরু পাণ্ডবের মধ্যে সখ্যস্থাপন করিয়াছেন কি না। শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে বলেন যে, পাণ্ডুগণ রাজ্যলাভ করিয়াছেন এবং কুরুগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া ঋষি ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন যে, যদি তিনি তাঁহার নিকট অধ্যাত্ম বা আত্মদর্শন ব্যাখ্যা করেন তবেই তিনি অভিশাপ দিতে বিরত হইবেন, নতুবা তাঁহার অভিসম্পাত হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিস্তার নাই। উতঙ্কের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ অধ্যাত্মব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বিরাট্ স্বরূপ দর্শন করাইলেন। ভগবত গীতানুসারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন,

ইহা তাহাই বা তাহার অনুরূপ স্বরূপ ; কিন্তু এখানে এই স্বরূপের নাম "বৈষ্ণবরূপ"। ভগবদ্গীতায় কিন্তু ইহার এ নাম নয়। যাহাই হউক দেখা যাইতেছে, ভগবদ্গীতা ও অনুগীতা এই উভয় যুগের মধ্যে বাসুদেব কৃষ্ণ ও বিষ্ণু যে অভিন্ন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শান্তিপর্ব্বের ৪৩ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া স্তুতি করেন। এই স্তবে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু অভিন্ন বলিয়া নির্নীত হইয়াছে। মহাকাব্যযুগে বিষ্ণু পরম পুরুষ বলিয়া পূজিত হইলেও নারায়ণ ও বাসুদেব কৃষ্ণের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ইহুদী ধর্ম্ম—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস কর্তৃক বিবিধ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। পাণিনি কার্য্যালয়, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত। ক্রাউন ১১৬পৃঃ, মূল্য বার আনা।

আজ আমরা খ্রীষ্টিয়ান রাজার প্রজা। আমাদের রাজা ধর্ম্মসম্বন্ধে খুব উদার নীতি অবলম্বন করিলেও খ্রীষ্টিয় প্রচারকগণ কর্তৃক ভারতের অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের জ্ঞান কিয়ৎ পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে। আমরা মিশনরিগণের কৃপায় খ্রীষ্টধর্ম্মসম্বন্ধীয় মূলগ্রন্থ সমূহের কিছু কিছু অংশের বঙ্গানুবাদও পাইয়াছি।

আমাদের বেদমূলক সনাতনধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ও অতি উদার ভিত্তির উপর স্থাপিত। প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত কত নূতন নূতন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের এখানে অভ্যুদয় হইয়াছে—কিন্তু সকলেই সেই সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়ে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারে আমাদের আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই, বরং আনন্দেরই কারণ আছে। কারণ, উহা দ্বারা দেশবিদেশে একটী জনসঙ্ঘ কি ভাবে ও কি প্রণালীর ভিতর দিয়া ভগবানের তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং পরিণামে উহার সাক্ষাৎও পাইয়াছিল, আমরা তাহারই পরিচয় পাইব মাত্র।

কিন্তু ইহার জন্য কর্ত্তব্য—আমাদের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বিদ্বদ্গণ উক্ত গ্রন্থ ভাষান্তরিত করিয়া ও তৎসম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লিখিয়া উহার জ্ঞান চারিদিকে বিস্তার করিয়া দেন।

খ্রীষ্টিয়গণের প্রামাণ্য ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের দুইটী বিভাগ—ওল্ড টেষ্টামেণ্ট বা প্রাচীন সংহিতা ও নিউ টেষ্টামেণ্ট বা নব সংহিতা। এই শেষ ভাগেই যীশুখ্রীষ্টের ও তৎশিষ্যগণের ধর্ম্মপ্রচারের বিবরণ আছে—এই ভাগটী এদেশে কতকটা প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু যে ভিত্তির উপর নিউ টেষ্টামেণ্ট স্থাপিত—সেই ওল্ড টেষ্টামেণ্টই ইহার ভিতর অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর অংশ, কিন্তু ইহার তেমন প্রচার নাই। কিন্তু উহা ইহুদী, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান—এই তিন ধর্ম্মাবলম্বী লোকই স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, ইহুদী বা হিব্রু বা ইব্রীয়গণের উহাই একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ওল্ড টেষ্টামেণ্ট হইতে সংক্ষেপে ইহুদীজাতির ইতিহাস ও ধর্ম্মের সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন এবং প্রমাণস্বরূপ অনেক পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে আরও বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য কৌতূহল হয়, ইহাই এই পুস্তকখানির উপযোগিতার যথেষ্ট প্রমাণ। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের পরবর্ত্তী অন্যান্য ইহুদী গ্রন্থ হইতেও বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই জাতির ধর্ম্মেতিহাস যেরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহাও এই গ্রন্থে সংক্ষেপে সংকলিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার জ্ঞানেন্দ্রবাবু বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' গ্রন্থের প্রথম ভাগটী বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিয়াছে। সুতরাং তাঁহার হস্তলিখিত বলিয়া এই গ্রন্থের ভাষা, বিষয়-বিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছু আবশ্যক নাই। তবে এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ সারিতে হইয়াছে বলিয়া স্থানে স্থানে একটু কট মট বোধ হয় মাত্র।

আশাকরি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সকল বাঙ্গালীই অধ্যয়ন করিয়া নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধি এবং উদার হৃদয়কে উদারতর করিবেন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ৪ঠা মাঘ, ইংরাজী ১৮ই জানুয়ারী ১৯২০ খীঃ, রবিবার বেলুড়মঠে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের অষ্টপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব হইবে। সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

ঝটিকাপ্রপীড়িত স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্য।

আমাদের পূর্ব্ব বিবরণীতে জানাইয়াছি যে আমরা ঝটিকাগ্রস্ত স্থানে ১০টি সাহায্য কেন্দ্র খুলিয়াছি। তন্মধ্যে ৫টী ঢাকার মুন্সিগঞ্জ সাবডিভিসনের অন্তর্গত টাঙ্গিবাড়ি এবং সেরাজদিঘা থানায় এবং ১টী নারায়ণগঞ্জ সাবডিভিসনের অন্তর্গত বৈদ্যবাটী থানায়। বর্ত্তমানে আমরা ঐ সমস্ত জিলায় আরও ৩টী কেন্দ্র খুলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের জনৈক সেবক আরিয়াল বিলের নিকটস্থ গ্রাম সকলের ভীষণ দুরবস্থার কথা বর্ণনা করায় আমরা শ্রীনগর থানার অন্তর্গত শ্যামসিদ্ধি এবং রাড়িখাল নামক গ্রামদ্বয়ে ২টী এবং টাঙ্গিবাড়ি থানার অন্তর্গত আরিয়াল নামক গ্রামে আরও একটী কেন্দ্র খুলিয়াছি। সরকার বাহাদুর ঐ সকল স্থানে প্রতি ইউনিয়নে ৫।৬মণ করিয়া চাউল বিতরণ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু উহা আমরা পর্য্যাপ্ত বোধ না করায় সাপ্তাহিক আরও ৭০৲০ মণ করিয়া চাউল ঐ সকল স্থানে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর সাবডিভিসনের অন্তঃপাতী পালং থানায় কুয়ারপুর গ্রামে একটি কেন্দ্র পূর্ব্বে খোলা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে কাগদি নামক স্থানে আরও একটী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

বরিশালে ভারুকাঠি ও বাগধা এবং খুলনায় মোল্লাহাট কেন্দ্র ছাড়া অপর কেন্দ্র খুলা হয় নাই। তবে উদয়পুর ইউনিয়নের অন্তর্গত মোল্লাহাট থানায় প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের কমিশনার বাহাদুরের অনুরোধে আমরা চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছি।

এই সকল স্থান ব্যতীত ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জ সাবডিভিসনের নানাস্থান হইতে অত্যন্ত কষ্টের কথা আমাদের সেবকেরা লিখিয়া পাঠাইতেছেন কিন্তু অর্থের অপ্রতুল হেতু আমরা সাহায্য কেন্দ্র আর বাড়াইতে পারিতেছি না। এ দিকে দারুণ

শীতকাল উপস্থিত—দেশবাসীরা গৃহহীন এবং বস্ত্রহীন হওয়ায় হিম সহ্য করিতে না পারিয়া নানা রোগে পীড়িত হইয়া পড়িতেছে। ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি নানাস্থানে ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি নানা রোগ দেখা দিয়াছে। আমরা আমাদের সকল কেন্দ্র হইতেই হোমিওপ্যাথিক এবং এ্যালোপ্যাথিক উভয় প্রকার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছি কিন্তু যদি আমরা যথোপযুক্ত ভাবে গৃহ নির্ম্মাণ এবং বস্ত্রদান করিতে না পারি তাহা হইলে দেশবাসীর মৃত্যু সংখ্যা ভীষণ ভাবে বর্দ্ধিত হইবে।

আশা করি, সহৃদয় দেশবাসিগণ এই কার্য্যে যথোপযুক্ত সাহায্য করিয়া আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবেন।

নিম্নে আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্র সমূহ হইতে সাপ্তাহিক চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল।

জিলা - ঢাকা

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
কলমা	৪৮	৯৩৮	৬৭৸৪
,,	৪৩	৯৮৩	৫০৸১
,,	২৮	৮৩২	৪২৸০
,,	৩২	৯৪০	৪৮।২
লতপদী	১০	৩৫৩	১৮৸৪
,,	১০	২৯৪	১৬/৮
,,	১৩	৩৭৬	১৯॥২
,,	১৩	৫৬৬	২৪/৪
,,	১৩	৪৬২	২৪/
বজ্রযোগিনী	২১	৩২৬	১৭/৯
,,	২২	৩০১	১৭॥৩
,,	২২	৩৩৬	২০/৪
,,	২৮	৫৬০	৩০/৯
,,	২৪	৫৩১	৩১/৫
কামারখাড়া	৪৬	৭৭৭	৪০॥৬
,,	৪৩	৭১৮	৩৮॥২
,,	৪৩	৯৮১	৫০/৬

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
কামারখাডা	৪৩	১০৫৯	৫২৸৵
,,	৪৩	১০১০	৫০৷৹
সোণারঙ্গ	২৬	৬০১	৩১।৪
,,	২৮	৫০১	২৬/৮
,,	২৯	৫৪৪	২৮৸৩
,	৩১	৭৮২	৪০৸৪
,,	৩৭	[illegible]	৪২/৭
সোণাবর্গা	৯৫	৫১৪	২৭/৪
,	৯০	৫৫৭	৩০/৩
,,	১০৩	৬৩৮	৩৩৸২
শ্যামসিদ্ধি	৭	১৭৫	১০/০
,	১১	২১০	১১/০
,	১০	২১১	১২।২
বাড়িখাল	৮	২৬২	১'৮০
,	৮	৪০৫	২৩/০
আবিয়াল	২৪	৩৯১	২০/০
,	২৩	৩৬৬	১৮৷৪

জিলা—ববিশাল

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
ভারুকাঠী	১৮	১৩৩	৬৸৮
,,	২০	৩২৩	১৬৷৭
,,	২১	৩৫৩	১৯/৩
,,	২৩	৩৯৮	২১৸০
,,	২৭	৫৩০	২৭৷৪
বাগধা	১০	২৯৯	১৬/২

জিলা—ফরিদপুর

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
কুমারপুর	১৭	৩৭২	১৮৸৮
,	২১	৬২৬	৩.৸৪
,	২১	৫৪৬	৩৩।২
,,	২১	৬৫৩	৩৩/৮
,,	২১	৬২৭	৩১৸০
কাগদী	১১	৩৪৬	১৮/২

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
কাগর্দা	১১	৩৭২	১৯/৯
,,	১১	৪৬৪	২৪/৮
,,	১০	৪৫৭	২৩৷৷৪
জিলা—খুলনা			
উদয়পুর	১৩	২৯১	১৫/০
,,	১৭	৪০১	২০।০
,,	১৬	৩৯৯	২১৷৷১
,,	১৭	৩৭৮	৩৪/০
,,	১৬	৩১১	২৪।৬

যাঁহারা এই কার্য্যে অর্থ ও বস্ত্রাদি সাহায্য করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা উহা নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত ও হইবে।

(১) প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়, হাওড়া।

(২) সেক্রেটারী রামকৃষ্ণমিশন, উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার, কলিকাতা।

(স্বাঃ) সারদানন্দ।

প্রাপ্তি স্বীকার।

১লা জুন হইতে ৩০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বেলুড় মঠে প্রাপ্ত।

রায় বি, এম্, বসু বাহাদুর, শাঁখারী, ৫০৲
টি, দাস, রামপুর, ১০৲
শ্রীযুত বীরেন্দ্র নাথ মিত্র, নৈহাটী, ১৲
,, এম্,এ, নারায়ণ আয়াঙ্গার,বাঙ্গালোর, ৫৲
নারিকেল-ডাঙ্গা ইনিষ্টিটিউট, ৫০৲
৺ শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী বিদ্যান্ত, লক্ষ্ণৌ, ২০০৲
জামসেদপুর ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্ট, ২৫৲
,, এম্, এল্, গোসাক্রি, পেগু ২০৲
,, মাঃ রাম, রেহারী, ৩৸৴০
নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মেসোপোটেমিয়া. ২৲
ডিব্রুগড় গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ, ১১৴০
শ্রীযুত এস্, পি, নিয়োগী, পাউবী, ৪০৲
শ্রীমতী সরযূবালা নিয়োগী, ,, ৫৲
শ্রীযুত নিশিকান্ত পাল, ঢাকা, ২৲
দরিদ্র হিতকারিণী সভা, কলিকাতা, ১০৲
শ্রীমতী সরোজিনীবালা দেব্যা, রাজসাহী ১৲
মির্জ্জাফর লেনের কতিপয় ভদ্রলোক, ৮৵০
ব্রাহ্মণবেড়ীয়া রামমূর্ত্তির বেনিফিট, ৪০৲
শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র দাস, ময়না, ৪৲
,, কে, মুখার্জ্জি, পোর্টব্লেয়ার, ৫৲
,, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, ,, ৫৫৲
,, এন্, কে, দাস, মবিন, ১০৲
,, তারক নাথ বিশ্বাস, খুলনা, ১৲

লেফ্‌টেনেণ্ট জয়চাঁদ ব্যানার্জ্জি, মেসোপোটেমিয়া, ৬৲
মাঃ ডি, সি, মিত্র, ,, ১৫০৲
মিস্‌. জিন্‌ ড, নিউজিল্যাণ্ড, ১২৲
শ্রীযুত ডি, এন্‌, সেন, জয়পুর, ৪৲
,, ভি,কে,এস্‌, আয়ার, ব্রিটিসনর্থবোর্ণিও ১২
,, তারকচন্দ্র নন্দী, কলিকাতা, ৫৲
,, পান্নালাল সিংহ, রঙ্গপুর, ৮৲
,, শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ, কলিকাতা, ১০৲
,, এ, কে, ঘোষ, পেগু ১০৲
,, পালুগণ্ড্‌ আপ্যা, কুর্গ, ৩৲
এস্‌. পাল এণ্ড কোং, কলিকাতা, ৫৲
,, রমেশচন্দ্র বসু, রেঙ্গাবাড়ী ৬৲
,, উমাপতি দে, সবিষা, ৫৲
ডাক্তার এস্‌, পি, রায়,কোয়ালালামপুর ৩৭৲
হাবিলদার মোহিত কুমার মুন্সি, করাচী ৩৲
,, মোতিনীচরণ চক্রবর্ত্তী, কুমিল্লা, ৩৲
,, ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা, ২৲
,, নিবারণচন্দ্র চৌধুরী, পাটনা, ২৲
,, বিশ্বনাথ মুখার্জ্জি, ,, ১৲
,, এস, এন্‌, ব্যানার্জ্জি বাঁকুড়া, ১০৲
,, বেদান্তক্লাস, ক্রাইষ্ট চার্চ্চ, ৬১৲
,, প্রাণধন গোস্বামী, মিরাট, ১৲
,, নন্দলাল চ্যাটার্জ্জি, বাগসায়েরা, ১৲
,, নীরোদচন্দ্র মজুমদার বৰ্দ্ধমান, ২৲
,, সন্তোষ কুমার ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা, ১৲
বেঙ্গলব্যাঙ্কের দরিদ্র কেরাণীবৃন্দ ৭৩৲
মাঃ এন দত্ত এণ্ড, মিরাট, ১৪০৲
মাঃ দীননাথ চক্রবর্ত্তী, জামসেদপুর, ৩০৲
,, ভুবনচন্দ্র দত্ত, বরাহনগর, ৫০৲
এস সি দত্ত, দেরাদুন ৭৲
অজ্ঞাত, জামসেদপুর, ১০৲
,, মনোমোহন বসু, হাওড়া, ১০৲
২নং প্লেটুন এ কোম্পানি, ৪৯ বেঙ্গলী, করাচী, ২২৷৹
,, কাওেস্বামী, কলিকাতা, ৫৲
এ, কে, আয়ার, ব্রিটিসনর্থ বোর্ণিও, ১৩৮৷৹
ডাক্তার জি, ডির্গাঙ্গি, কলিকাতা, ৫৲
,, দেওয়ান দেশ্বল দাস, রোহারী, ১০৲

শ্রীযুত এ, কে, দত্ত, মেদিনীপুর, ১০৲
,, শশীভূষণ বসাক, কলিকাতা, ১০০৲
ক্লাস এসোসিয়েসন কলিকাতা, ভকীলস্‌ লাইব্রেরী, ১০৲
রামকৃষ্ণ সোসাইটী, রেঙ্গুন, ৩৪০০৲
,, জি, কে, আয়ার, সাক্ষীগোপাল, ২৫৲
,, মাধবচন্দ্র বিশ্বাস, কালচুনি, ১৲
বান্ধব সমিতি, জামসেদপুর, ১৫২/৬
মাঃ গর্ডন ক্যাম্পের বেঙ্গলী মেম্বারগণ, বাসরা, ৭৯/৹
,, এম,এউডেস্বামী, ব্রিটিস নর্থবোর্ণিও, ৪১।/৹
শ্রীযুত সেট বিষ্ণুদাস, রোহারী, ৪০৲
,, চারুচন্দ্র দাস, কলিকাতা, ১৲
,, মেমিও পাবলিক, বার্ম্মা, ১০৲
,, মাঃ রাম, বোহারী, সিন্দ, ১১৷৹
,, এস্‌, পি, ব্যানার্জ্জি, খিদিরপুর, ৬৲
,, নির্ম্মলচন্দ্র সরকার, দিল্লী, ৪৲
,, এন, এম, মুখার্জ্জি, ম্যাণ্ডালে, ৫৲
ই,আই, রেলওয়ের ষ্টাফ্‌, ফেয়ারলিপ্লেস ৪৫৲
শ্রীযুত অমলজীবন মুখার্জ্জি, শিমলা, ২৲
,, নিশিকান্ত রায়, কামপুর, ৪৲
,, রামকৃষ্ণ মিশন, বরিশাল, ৭৲
,, অচলনাথ মিত্র, ভবানীপুর, ৫০৲
,, বিজয়কৃষ্ণ পাল, কলিকাতা, ৪০০৲
মাঃ ডাঃ কৃষ্ণ, রোরী, ২০৸/৹
,, রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ময়মনসিংহ, ২৲
,, মেমিও পাবলিক, ১১৫৲
,, অনুপম রায়, ভবানীপুর, ৫৲
,, নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, আলমনগর, ১৲
মাঃ রামময় চক্রবর্ত্তী, জগদ্দল, ১৫৷৴৹
,, এস্‌, পি, নিয়োগী, পাউরী, ২১৲
,, নীরদবিহারী বসু, রাঁচি, ২৲
,, কুমুদবন্ধু দাস, মৌলমিন্সি, ২৲
মাঃ ডাঃ এইচ্‌ সি, সেন, কলিকাতা, ১১০৲
,, শত্রুঘ্ন মুখার্জ্জি, গদখালি, ২৲
,, নন্দলাল ভট্টাচার্য্য, মতিহারী, ২৲
,, দেবেন্দ্রনাথ নন্দী, ক্যাকশেয়ালী, ২৲
,, মনোমোহন বসু, হাওড়া, ৯৲
,, পান্নালাল সিংহ, রংপুর, ১০৲

নাম	স্থান	টাকা
শ্রীযুত এস্, এন, ব্যানার্জ্জি,	বাঁকুড়া,	১০৲
,, এন্, ডি, মহাত্তা,	বম্বে,	৩৲
,, সুশীলচন্দ্র মিত্র,	আরা,	৪৲
,, ভূষণচন্দ্র পাল,	কলিকাতা,	৩০৲
,, তিনকড়ি ব্যানার্জ্জি,	,,	১০৲
ডাওয়েজার মহারাণী,	কুচবেহার,	২০০৲
,, সুশীলচন্দ্র দাস,	কলিকাতা,	২৲
কুমারডুবি চ্যারিটি ফণ্ড,	বরাকর,	৫৲
শ্রীমতী বিমলা দেবী,	গোয়ালিয়র,	৬৶০
শ্রীযুত বিজয় মোহন রায়,	দিনাজপুর	২৲
মালয় উপদ্বীপ,		৮॥০
,, এন্, এন্, রায়,	মালয় উপদ্বীপ,	৮॥০
,, কে, এস, সেন,	,,	৪।০
,, বি, বি, মজুমদার,	,,	৩৷০
,, ননীলাল মাইতি,	ইনানগিরট	২৲
রামকৃষ্ণ এন্ কালবাগ,	বম্বে,	৬২৲
,, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি,	কলিকাতা	১৲
অনাথ ভাণ্ডার	বালী,	১৫৲
,, সতীশচন্দ্র গুহ,	ঢাকা,	১৲
,, এম, এল, গোস্বামী,	পেগু,	১০৲
,, জগন্নাথ মল্লিক,	কলিকাতা,	১৫৲
মাঃ ফণীভূষণ ঘোষ,	ইউজেলি পারস্য,	১৪॥০
,, এস, সি, সেন,	আলনাভার,	৫৲
,, নন্দলাল চ্যাটার্জ্জি,	ব্যাটুর,	০৲
,, পান্নালাল ধর,	,,	০৲
,, জে, সি, চ্যাটার্জ্জি,	বর্ম্মা,	১০৲
বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র,	কলিকাতা,	৪৲
শ্রীমত্যা প্রকাশিনী দত্ত,	,,	১০৲
মাঃ বি, এন, গুপ্ত,	বাসরা,	৫২৲
শ্রীমতী সবিতা ভেন,	আমেদাবাদ,	১০৲
শ্রীযুত কেশবচন্দ্র দাঁ,	নবগ্রাম,	৷৷০
,, মহাদেব চন্দ্র বিশ্বাস,	মেজপাড়া,	১৲
শ্রীযুত রামস্বামী আয়াঙ্গার,	ময়লাপুর,	৫৲
,, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ,	পণ্ডিয়া,	৫৲
অ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার,	রামপুর	৫৲
শ্রীমতী মুক্তকেশী দাসী,	বরিশাল,	২৫৲
শ্রীযুত ডি কামিং,	পেগু,	১০৲
,, ম্যাকটুন জ্যাক,		১৲
শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী,	রেঙ্গুন,	১০৲
শ্রীযুত পুণ্ডরীকাক্ষ বসু,	কাদাই,	১৲
আই বি, চ্যাটার্জ্জি,	গহরওয়লি,	৫৲
,, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	মণ্ডলবগঞ্জ,	১৲
শ্রীমতী হেমনলিনী ঘোষ,	হালিমারা	০৲
শ্রীযুত রামলাল কান্ত,	ধূপধারা,	২৲
,, হরিপদ ঘোষ,	গোয়াল পাড়া,	২॥০
,, অক্ষয়কুমার লাহা,	কলিকাতা,	১০৲
টাটা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কেরাণীবৃন্দ,		১০৲
বেদান্ত ক্লাস ক্রাইষ্ট চার্চ্চ,		১৫৲
সুনীতি সঞ্চারিণী সভা,	ধুবড়ী	৩৲
শ্রীযুত এ, কে ঘোষ,	কাযেকটাগা	১০৲
,, বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী	বক্তবর,	৬৲
,, বীরেন্দ্রনাথ রায়,	কলিকাতা,	১৲
,, ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার,	নৈহাটি,	২৲
,, মনি,	আলমবাজার	৫৲
,, বীরেন্দ্র নাথ মিত্র	কলিকাতা,	১৲
,, এ, কে, আদিত্য,	,,	১৫৲
মাঃ কে, এন মুখার্জ্জি,	বাগদাদ,	৫০৲
শ্রীযুত এ.ডি, জিঙ্গম্ ব্রিটিশনর্থ বোর্ণিও,		১৩।০
,, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,	কলিকাতা,	৫৲
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়,	মহেশতলা,	৩০
,, শরৎচন্দ্র মুখার্জ্জি,	শিবপুর,	১৲
এন, এন, মুখার্জ্জি,	মাণ্ডালে,	৫৲
ডাঃ যোগেন্দ্র নাথ রায়,	ভবানীপুর,	১০২৲
শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি,	কলিকাতা,	২৲
,, পি, সি, রাবিক,	,,	২৫৲
মডেল স্কুল,	নিউপোকারহাট,	১১৷৶০